মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র.)

সুন্নাত ও বিদয়াত

সুন্নাত ও বিদয়াত

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৯২১-০৯২৪৬৭, ০১৭৫-১৯১৪৭৭

প্রসঙ্গ কথা

ইসলামী শরীয়তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে 'সুন্নাত' ও 'বিদয়াত' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়। সুন্নাত— মহানবী (স)-এর অনুসৃত, নির্দেশিত ও অনুমোদিত কথাবার্তা কর্মকাণ্ড— শীরীয়তের অবয়ব নির্মা করে; মানুষের সামনে ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের একটা সুস্পষ্ট নির্দেশন তুলে ধরে। পক্ষান্তরে বিদয়াত সুন্নাতের বিপরীত ও তার সাথে সাংঘর্ষিক রীতি-নীতি ও আচার-প্রথা শরীয়তের বিকৃতি সাধন করে; তার নির্মল স্বরূপকে ভ্রষ্টতার আড়ালে ঢেকে ফেলে। কাজেই ইসলামী শরীয়তে সুন্নাত ও বিদয়াত-এর সহ-অবস্থান কখনো চলতে পারে না। সুন্নাতকে যদি অবলম্বন করতে হয়, তাহলে বিদয়াতকে সমূলে উৎখাত করতেই হবে— এটাই শরীয়তের স্পষ্ট তাগিদ।

দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলিম সমাজে সুন্নাত ও বিদয়াত-এর পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট নয়। এখানে দ্বীনদারী ও ধর্মকর্মের নামে অনেকেই এমন সব রীতিনীতি ও আচার-প্রথা পালন করেন, যা মোটেই সুন্নাত-সমর্থিত নয় বরং সুস্পষ্ট বিদয়াত। আর ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সঠিক চর্চার অভাবে এই বিদয়াতকে এতই উৎসাহ দেয়া হচ্ছে যে, সুন্নাতের সাথে তার পার্থক্য নির্ণয়ই অনেকে ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে পড়েছে। ফলে ইসলামী শরীয়তের জীবনধর্মী ও বাস্তববাদী আবেদন সাধারণভাবে এখানে গৌন হয়ে দাঁড়িয়েছে; তার অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক শিক্ষা মুসলমানদের জীবন ও সমাজে কোনো অর্থবহ পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না।

এ কালের মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে মুসলিম সমাজের এই দৈন্যদশার ওপরই আলোকপাত করেছেন অত্যন্ত সুনিপুনভাবে। এ গ্রন্থে তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে যেমন সুন্নাতের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করেছেন অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে, তেমনি বিদয়াতের নিদর্শনগুলোকেও চিহ্নিত করেছেন অতীব সাহসিকতার সাথে। এ ক্ষেত্রে অকাট্য দলীল প্রমাণের ওপরই তিনি প্রধানতঃ নির্ভর করেছেন, কোনো মহলের খেয়াল-খুশী বা ইচ্ছা-অভিরুচিকে এতটুকু গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এদিক থেকে তিনি নিঃসন্দেহে একজন মুজাদ্দিদের দায়িত্বই পালন করেছেন।

এ সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণ ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এর মূল্য যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিদগ্ধ পাঠক সমাজ এই গ্রন্থ থেকে বিদায়ত নামক প্রচলিত কুসংস্কারের সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ এবং সেই সঙ্গে প্রকৃত সুন্নাতের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক প্রেরণা লাভ করবেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন গ্রন্থকারকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন, এই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
চেয়ারম্যান
আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন

প্রাথমিক কথা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) যে আদর্শ দুনিয়ার মানুষের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, এক কথায় তা-ই হচ্ছে সুন্নাত এবং তার বিপরীত যা কিছু তা বিদয়াতের পর্যায়ে গণ্য। নবী করীম (স) তাঁর তেইশ বছরের অবিশ্রান্ত সাধনা ও সংগ্রামের মাধ্যমে যে সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, তাকে তিনি মুক্ত করেছিলেন সর্বপ্রকারের বিদয়াত ও জাহিলিয়াতের অক্টোপাশ থেকে এবং প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সুন্নাতের আলোকোদ্ভাসিত মহান আদর্শের ওপর। বিশ্ব মানবতার পক্ষে এ ছিল মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

উত্তরকালের নানা কারণে মুসলিম সমাজ সুন্নাতের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, তাদের আকীদা ও আমলে প্রবেশ করে অসংখ্য বিদয়াত। এমন দিনও দেখা দেয়, যখন মুসলমানরা সুন্নাত ও বিদয়াতের এক সংমিশ্রিত জগাখিচুড়ী বিধানকেই ইসলামী আদর্শ বলে মনে করতে এবং অনুসরণ করতে শুরু করে। ফলে তাদের জীবনে আসে সার্বিক ভাঙন ও বিপর্যয়। বর্তমান সময় সেই বিপর্যস্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতিই গ্রাস করে রয়েছে সমগ্র বিশ্বমুসলিমকে।

কিন্তু এ অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয় মুসলমানদের জন্যে। কারো পক্ষেই কাম্য হতে পারে না এ আদর্শ বিচ্যুতি। এ জন্যে আজ নতুন করে লোকদের সামনে ইসলামী আদর্শবাদের ব্যাপক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অপরিহায্য, যেন মুসলমানদের মনে চেতনা জেগে উঠে, উদ্দীপিত হয়ে উঠে তাদের অবস্থার পরিবর্তনের পুনর্জাগরণের এবং নতুন করে আদর্শবাদী হয়ে উঠার এক উদগ্র বাসনা। এ পর্যায়ে আমার ক্ষুদ্র নগণ্য লেখনী-শক্তি যতোটুকু কাজ করেছে, তার মধ্যে বর্তমান গ্রন্থ একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সুন্নাত ও বিদয়াতের মৌলিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং আকীদা-বিশ্বাসে, জীবনে ও সমাজে কোথায় কোথায় সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি আর বিদয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরাই আমার এ গ্রন্থ রচনার মূলে একমাত্র উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছে; কিংবা আদৌ কোনো সাফল্যের দাবি করতে পারি কি-না, পাঠকবর্গ-ই তার বিচার করবেন। আমার বক্তব্য শুধু এতটুকু যে, যা কিছু লিখেছি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝে শুনে লিখেছি, সঠিক কথা সুস্পষ্ট করে পেশ

করার জন্যেই লিখেছি, লিখেছি কুরআন-হাদীস, ফিকাহ ও সর্বজনমান্য মনীষীদের মতামতের ভিত্তিতে। এ বইয়ে আলোচিত মতামতের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে আমি-ই দায়ী এবং যদি কাউকে দায়ী করতে হয় তা হলে সে জন্যে কেবল আমাকেই দায়ী করা যেতে পারে, অন্য কাউকে নয়। এ আলোচনায় আমি কোনো ভুল করে থাকলে, কারো দোহাই দিয়ে নয়, কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতেই আমার ভুল ধরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের যে কোনো ভুলের সংশোধন করে নিতে আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।

এতদসত্ত্বেও আমার এ প্রচেষ্টা যদি আদর্শকে সমুজ্জল করে তোলবার এবং বিদয়াতের অন্ধকার বিদূরণে সামান্য কাজও করতে সক্ষম হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করবো এবং তাকে পরকালে আল্লাহ্‌র নিকট মুক্তি লাভের অসীলারূপে মনে করে তাঁর শোকরিয়া আদায় করবো।

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমার লিখিত 'সুন্নাত ও বিদয়াত' গ্রন্থখানি ১৯৬৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। অতঃপর অল্প দিনের মধ্যেই তার সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। গ্রন্থখানি যে বিদগ্ধ সমাজের নিকট সমাদৃত হয়েছে এবং চিন্তার জগতে তা যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, তা তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারা গিয়েছিল। বস্তুত আমাদের সমাজে যুগ যুগ ব্যাপী সিঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত বিদয়াতের ওপর এ গ্রন্থখানি এক প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল এবং বিদয়াতের পূজারী ও বিদয়াত আশ্রিত গোষ্ঠি এ আঘাতে হতচকিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছিল। চারদিকে 'গেল গেল' রব্ব ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। চলমান বিদয়াতের বিরুদ্ধে এটা ছিল আমার একটা চ্যালেঞ্জ। স্বভাবতই আমি আশা করেছিলাম, বিদয়াত পন্থীদের পক্ষ হতে এর প্রতিবাদ হয়ত আসবে।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল, এ গ্রন্থের অকাট্য শাণিত ও অমোঘ আঘাতের জবাবে বিদয়াত পন্থীদের নিকট বলার মতো কোনো কথা নেই। যদিও তারা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে ত্রুটি করেনি। অতঃপর সংশিষ্ট মহলসমূহ নীরবতা অবলম্বন ছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পায় নি। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছি এ দেখে যে, আমি বিভিন্ন পর্বত-সমান বিদয়াতের বিরুদ্ধে যে কথা বলেছি, কোনো অকাট্য দলীল দিয়ে তা রদ করার সাধ্য কোনো মহলেরই নেই। আমি মহান আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করছি এ জন্যে যে, এ কালের পুঞ্জীভূত বিদয়াতের বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত আদায় করা এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র)-র আদর্শ অনুসরণের কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে তা যত সামান্য এবং যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমি পীর-মুরীদী ব্যবস্থাকে 'সুন্নাত' বিরোধী ও বিদয়াত প্রমাণ করেছি, কিন্তু এদেশে আলিম ও পীরসাহেবান আবহমানকাল ধরে ইসলামের যে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, এ দেশে এখনও দ্বীন-ইসলামমের যে নাম-নিশানা রয়েছে তার পেছনে তাঁদের যে অপরিসীম অবদান রয়েছে, আমি তা অবশ্যই স্বীকার করবো। তাঁরা যে পোশাক পরছেন, তাকে 'সুন্নাত' না বললেও তা উপমহাদেশের উলামায়ে কিরামের পোশাক, তা পরা অন্যায় কিছু নয়, তাও আমি স্বীকার করেছি।

বিগত প্রায় দশটি বছর পর্যন্ত গ্রন্থখানি পুনঃ মুদ্রণ সম্ভবপর হয়নি কোনো দুঃসাহসী প্রকাশক পাওয়া যায়নি বলে। বর্তমানে জনাব মোঃ আতাউর রহমান কর্তৃক তা নতুনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এতে অনেক কয়টি নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে এবং প্রথম সংস্করণের অনেক কথা অধিকতর বলিষ্ঠ ও যুক্তিসহ পুনর্লিখিত হয়েছে। তত্ত্ব ও তথ্যের দিক দিয়ে পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে এই সংস্করণটি।

তাই সহজেই আশা করতে পারি, প্রথম সংস্করণের তুলনায় এই সংস্করণ বিদগ্ধ পাঠক সমাজের নিকট অনেক বেশি সমাদৃত হবে। নতুন করে গ্রন্থখানি পাঠক সমাজের নিকট উপস্থাপিত করতে পারলাম দেখে মহান আল্লাহ্‌র অশেষ শোকর আদায় করছি।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম

সূচী পত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'সুন্নাত' ও 'বিদয়াত' দুটোই আরবী শব্দ। তা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে এ দুটো শব্দ ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং ইসলামের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এ শব্দ দুটো বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু যতদূর বোঝা যাচ্ছে, এ দুটো পরিভাষার সঠিক তাৎপর্য অনেকেই অনুধাবন করতে সক্ষম নয়। অথচ ইসলামী সংস্কৃতি যতোগুলো মৌলিক পরিভাষা রয়েছে, যে সব পরিভাষার ওপর ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার সম্যক অনুধাবন নির্ভরশীল, এ দুটো শব্দ তারই মধ্যে গণ্য। অতএব এ দুটো শব্দের সঠিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ এবং এ দুটোর দৃষ্টিতে বর্তমান বিশ্ব-মুসলিমের আকীদা, আমল ও আখলাক যাচাই ও পরখ করা একান্তই জরুরী, যদিও বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ।

এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আরো অধিক তীব্র হয়ে দেখা দেয়, যখন আমরা দেখতে পাই যে, বর্তমান মুসলিম সমাজে কার্যত সুন্নাত ও বিদয়াতের মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয় না। শুধু তা-ই নয়, বহু রকমের সুন্নাত-সমর্থিত ও সুন্নাতের দৃষ্টিতে অপরিহার্য— অবশ্য করণীয় কাজ আজও মুসলিম সমাজেই সাধারণভাবে পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে এবং বহু প্রকারের বিদয়াত সুন্নাতের মতোই গুরুত্ব লাভ করে শক্তভাবে শিকড় গেড়ে এবং শাখায় প্রশাখায়, পত্র-পল্লবে ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে বসে আছে। এখন অবস্থা এই যে, বর্তমান মুসলিম সমাজের চেহারা দেখে, তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সামগ্রিক কার্যক্রম দেখে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের বাস্তব ভূমিকা লক্ষ্য করে বুঝবার কোনো উপায়ই নেই যে, কোনটি সুন্নাত আর কোনটি বিদয়াত। ইসলামের দৃষ্টি এক উম্মতী-জাতির জীবনে এ এক মারাত্মক পরিস্থিতি। কেননা এরই ফলে দেখতে পাচ্ছি, আজকের মুসলিম জীবনে সুন্নাতের দিকপ্লাবী নির্মল আলোকচ্ছটা ম্লান হয়ে এসেছে আর তদস্থলে বিদয়াতের কালো আঁধার সর্বত্র ছেয়ে গেছে, গ্রাস করে ফেলেছে সমগ্র মুসলিম জীবনকে। বিদয়াতের এ রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত সুন্নাতের স্বচ্ছ আলোকধারায় মুসলিম জীবনকে উদ্ভাসিত করে তোলা কিছুতেই সম্ভবপর হবে না, হতে পারে না। ঠিক এ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে-ই আমরা এ আলোচনা প্রবৃত্ত হয়েছি।

সুন্নাত ও বিদয়াত-এর ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য

প্রথমে আমরা মৌলিকভাবে এ শব্দ দুটোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করতে চাই, বুঝতে চাই ইসলামী পরিভাষা হিসেবে 'সুন্নাত' বলতে কি বোঝায় ও আহলি-সুন্নাতই বা কারা ? এবং বিদয়াত কি ও সে বিদয়াত কতো দিক দিয়ে মুসলিম সমাজকে সচেতন বা অবচেতনভাবে গ্রাস করে ফেলেছে।

'সুন্নাত' শব্দের ব্যাখ্যা

'সুন্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلطَّرِيْقُ —'পথ'।

কুরআন মজীদে এই 'সুন্নাত' শব্দটি বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

একটি আয়াত হলো ঃ

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً (الفتح : ٢٣)

আল্লাহ্‌র সুন্নাত, যা পূর্ব থেকেই কার্যকর হয়ে রয়েছে। আর আল্লাহ্‌র এ সুন্নাতে কোনোরূপ পরিবর্তন দেখবে না কখনো।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً - (الفاطر ٤٣)

তুমি আল্লাহ্‌র সুন্নাতে কোনোরূপ পরিবর্তন হতে— কোনো প্রকারের ব্যতিক্রম হতে দেখবে না।

সূরা বনি ইসরাঈলেও 'সুন্নাত' শব্দটি একই আয়াতে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতটির ভাষা এই ঃ

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلاً

(بنى اسراءيل : ٧٧)

তোমার পূর্বে আমরা যেসব রাসূল পাঠিয়েছি এ হচ্ছে তাদের ব্যাপারে সুন্নাত এবং তুমি আল্লাহ্‌র সুন্নাতের কোনোরূপ পরিবর্তন পাবে না।

এসব আয়াতে ব্যবহৃত 'সুন্নাত' শব্দের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ طريقه অর্থাৎ পথ, পন্থা এবং পদ্ধতি। কিন্তু 'সুন্নাতুল্লাহ'— আল্লাহ্‌র সুন্নাতের মানে কি?

ইমাম রাগেব ইসফাহানী লিখেছেন ঃ

وَسُنَّةُ اللّٰهِ تَعَالٰى قَدْ تُقَالُ لِطَرِيْقَةِ حِكْمَتِهٖ وَطَرِيْقَةِ طَاعَتِهٖ -

আল্লাহ তা'আলার সুন্নাত বলা হয় তাঁর কর্মকুশলতার বাস্তব পন্থাকে, তাঁর আনুগত্য করার নিয়ম ও পদ্ধতিকে।

এভাবে দেখা যায় যে, 'সুন্নাত' শব্দটি একটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত এবং তা যেমন আল্লাহ্‌র ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়েছে, তেমনি করা হয়েছে নবী ও রাসূলদের ক্ষেত্রেও। সাধারণ মানুষের বাস্তব অবস্থা বুঝবার জন্যেও এ শব্দের ব্যবহার দেখা যায় কুরআন মজীদে।

এ হলো 'সুন্নাত' শব্দটির শাব্দিক ব্যবহার এবং আভিধানিক অর্থ। আমরা এখানে 'সুন্নাত' শব্দটির সে বিশ্লেষণ শুরু করেছি, তা এ দৃষ্টিতেই। আমাদের সামনে রয়েছে এর মূল ও নির্গলিত অর্থ।

আর এ দৃষ্টিতে এ শব্দটির মানে হলো— ইমাম রাগেবের ভাষায় ঃ

وَسُنَّةُ النَّبِىِّ طَرِيْقَتُهُ الَّتِىْ كَانَ يَتَحَرَّاهَا -

নবীর সুন্নাত হচ্ছে সেই নিয়ম, পন্থা ও পদ্ধতি, যা তিনি বাস্তব কাজে ও কর্মে অনুসরণ করে চলতেন।

আর আল্লামা মুহাম্মাদ বশীর সাহসোয়ানীর ভাষায় 'সুন্নাত' হলো ঃ

اَلطَّرِيْقَةُ الْمَخْصُوْصَةُ الْمَسْلُوْكَةُ الْمُتَّبَعَةُ بِالْفِعْلِ فِىْ اَمْرِ الدِّيْنِ فِعْلاً وَّ تَرْكًا مِّنْ عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (صيانة النسان)

সেই বিশেষ পথ, পন্থা ও পদ্ধতি, যা নবী করীম (স)-এর সময় থেকেই দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে কোনো কাজ করার বা না-করার দিক দিয়ে বাস্তবভাবে অনুসরণ করা হয়— যার ওপর দিয়ে চলাচল করা হয়।

'কিতাবুল মবসূত'-এর 'কিতাবুল কাজী' অধ্যায়ে 'সুন্নাত' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ ভাষায় ঃ

سُنَّةٌ مُّتَبَعَةٌ اَىْ طَرِيْقَةٌ مَسْلُوْكَةٌ فِى الدِّيْنِ يَجِبُ اِتِّبَا عُهَا عَلٰى كُلِّ حَالٍ -

'সুন্নাত' দ্বীন-ইসলামের এমন এক অনুসৃত কর্মপদ্ধতি, যার অনুসরণ সকল অবস্থায়ই ওয়াজিব বা কর্তব্য।

আল্লামা আবদুল আযীয আল-হানাফী লিখেছেন ঃ

لَفْظُ السُّنَّةِ شَامِلٌ لِّقَوْلِ الرَّسُوْلِ وَفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَتَطْلُقُ عَلٰى طَرِيْقَةِ الرَّسُوْلِ وَالصَّحَابَةِ - (كشف الاسرار، ص ٢٥٩)

'সুন্নাত' শব্দ বোঝায় রাসূলে করীম (স)-এর কথা এবং কাজ। আর তা রাসূলে করীম (স) সাহাবায়ে কিরামের বাস্তব কর্মনীতি বুঝবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়।

আল্লামা সফীউদ্দীন আল-হাম্বলী লিখেছেন ঃ

اَلسُّنَّةُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ غَيْرِ الْقُرْاٰنِ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ - (قواعد الاصول، ص ٩١)

কুরআন ছাড়া রাসূলের যে কথা, যে কাজ বা অনুমোদন বর্ণনার সূত্রে পাওয়া গেছে তা-ই সুন্নাত।

মনে রাখতে হবে, এখানে সুন্নাতের সেই অর্থ আলোচ্য নয়, যা হাদীস বিজ্ঞানীরা পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন; সেই অর্থও নয়, যা ফিকাহ্ শাস্ত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। হাদীস-বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় 'সুন্নাত' হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর মুখের কথা, কাজ ও সমর্থন-অনুমোদনের বর্ণনা— যাকে প্রচলিত কথায় বলা হয় 'হাদীস'। আর ফিকাহ্শাস্ত্রে 'সুন্নাত' বলা হয় এমন কাজকে, যা ফরয বা ওয়াজিব নয় বটে; কিন্তু নবী করীম (স) তা প্রায়ই করেছেন।[১] এ গ্রন্থে এ দুটো সুন্নাতের কোনটি-ই আলোচ্য নয়। এখানে আলোচ্য হচ্ছে 'সুন্নাত' তার মূলগত অর্থের দিক দিয়ে যা মৌলিক আদর্শ রীতি-নীতি, পথ, পন্থা ও পদ্ধতি বোঝায়।

---

১. ফিকাহ্শাস্ত্রে সুন্নাত বলা হয় ঃ

ماكان فعلهٗ اولٰى من تركه بلا منع الترك ان كان ممّا وَاظَبَ عليه الرَّسُوْل صلّى اللّٰهُ عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده فسنة - (درالمختار-١، ص-٩)

বস্তুত এ হিসেবে সুন্নাত হলো সেই মূল আদর্শ, যা আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-মানবের জন্যে নাযিল করেছেন, যা রাসূলে করীম (স) নিজে তাঁর বাস্তব জীবনে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের বিশাল ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন; অনুসরণ করার জন্যে পেশ করেছেন দুনিয়ার মানুষের সামনে। মূল ইসলামেরই বিকল্প শব্দ হচ্ছে সুন্নাত, যা আমরা এখানে আলোচনা করছি। কেননা নবী করীম (স) যা বাস্তবভাবে অনুসরণ করেছেন, তার উৎস হলো ওহী— যা আল্লাহ্র নিকট থেকে তিনি লাভ করেছেন। এ 'ওহী' দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে আল্লাহ্র জানিয়ে দেয়া বিধান ও নির্দেশ। রাসূলে করীম (স)-এর বাস্তব কর্মজীবন এ দুটোরই সমন্বয়, সেখানে এ সবকিছুরই প্রতিফলন ঘটেছে পুরোপুরিভাবে। রাসূলের বাস্তব জীবন বিশ্লেষণ করলে এ সব কয়টিরই প্রকটভাবে সন্ধান লাভ করা যাবে। আর তাই হচ্ছে 'সুন্নাত', তাই হচ্ছে পরিপূর্ণ দ্বীন-ইসলাম। কুরআন মজীদে রাসূলের এ বাস্তব জীবনের সত্যিকার রূপ সুস্পষ্ট করে তুলবার জন্যেই তাঁর জবানীতে বলা হয়েছে ঃ

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ -

আমি কোনো আদর্শই অনুসরণ করি না; করি শুধু তাই যা আমার নিকট ওহীর সূত্রে নাযিল হয়।

ওহীর সূত্রে নাযিল হওয়ার আদর্শই রাসূলে করীম (স) বাস্তব কাজে ও কর্মে অনুসরণ করেছেন, তা-ই হচ্ছে আমাদের আলোচ্য 'সুন্নাত'। এই সুন্নাতেরই অপর নাম ইসলাম।

কুরআন মজীদে এই সুন্নাতকেই 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূলের জবানীতে কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - (الانعام : ١٥٣)

নিশ্চয়ই এ হচ্ছে আমার সঠিক সরল দৃঢ় পথ। অতএব তোমরা এ পথই অনুসরণ করে চলবে, এ ছাড়া অন্যান্য পথের অনুসরণ তোমরা করবে না। তা করলে তা তোমাদের এ পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদের এরূপ-ই নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা ভয় করে চলো।

এ আয়াতে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বলতে সেই জিনিসকেই বোঝানো হয়েছে, যা বোঝায় 'সুন্নাত' শব্দ থেকে।

ইমাম শাতেবী 'সিরাতুল মুস্তাকীম'-এর পরিচয় দান প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ سَبِيْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ دَعَا اِلَيْهِ وَهُوَ السُّنَّةُ وَالسُّبُلُ هِىَ سُبُلُ اَهْلِ الْاِخْتِلَافِ الْحَائِدِيْنَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ وَهُمْ اَهْلُ الْبِدَعِ -

(الاعتصام : ج-١، ص- ٣٥)

'সিরাতুল মুস্তাকীম' হচ্ছে আল্লাহ্‌র সেই পথ, যা অনুসরণের জন্যে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন। আর তা-ই সুন্নাত; আর 'অন্যান্য পথ' বলতে বোঝানো হয়েছে বিরোধ ও বিভেদপন্থীদের পথ, যা মানুষকে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আর তারাই হচ্ছে বিদয়াতপন্থী লোক।

আরও মনে রাখতে হবে, সুন্নাত হচ্ছে তা-ই, যা বিদয়াতের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা এ সুন্নাতের বিপরীতই হচ্ছে বিদয়াত।

'বিদয়াত' শব্দের ব্যাখ্যা

ইমাম রাগেব 'বিদয়াত' শব্দের অর্থ লিখেছেন ঃ

اِنْشَاءُ صَنْعَةٍ بِلَا اِعْتِدَاءٍ وَاقْتِدَاءٍ - (مفردات)

কোনোরূপ পূর্ব নমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুকরণ অনুসরণ না করেই কোনো কার্য নতুনভাবে সৃষ্টি করা।

আর দ্বীনের ক্ষেত্রে যে বিদায়াত, তার সংজ্ঞা হিসেবে লিখেছেন ঃ

وَالْبِدْعَةُ فِى الْمَذَاهِبِ اِيْرَادُ قَوْلٍ لَّمْ يَسْتَنَّ قَائِلُهَا وَفَاعِلُهَا فِيْهِ بِصَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ اِمَائِلُهَا الْمُتَقَدِّمَةُ وَاُصُوْلُهَا الْمُتْقَنَةُ - (مفردات)

দ্বীনের ক্ষেত্রে বিদয়াত হচ্ছে এমন কোনো কথা উপস্থাপন করা, যার প্রতি বিশ্বাসী ও যার অনুসারী লোক কোনো শরীয়ত প্রবর্তক বা প্রচারকের আদর্শে আদর্শবান নয়, শরীয়তের মৌলনীতি ও সুষ্ঠু পরিচ্ছন্ন আদর্শের সাথেও যার কোনো মিল নেই।

অর্থাৎ শরীয়ত প্রবর্তক যে কথা বলেননি সে কথা বলা এবং তিনি যা করেননি এমন কাজকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা তা-ই হচ্ছে বিদয়াত।

ইমাম নববী 'বিদয়াত' শব্দের অর্থ লিখেছেন ঃ

اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ -

এমন সব কাজ করা বিদয়াত, যার কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

আর আল্লামা মুল্লা আলী আল-কারী লিখেছেন, শরীয়তের পরিভাষায় বিদয়াত হলো ঃ

اِحْدَاثُ مَالَمْ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(مرقاة ج- ا، ص- ٢١٦)

রাসূলের যুগে ছিল না এমন নীতি ও পথকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে প্রবর্তন করা।

ইমাম শাতেবী লিখেছেন। আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ

يُقَالُ اِبْتَدَعَ فُلَانٌ بِدْعَةً يَعْنِيْ اِبْتِدَاءَ طَرِيْقَةً لَّمْ يَسْبَقْهُ اِلَيْهَا سَابِقٌ -

অমুক লোক বিদয়াত করেছে। আর তার মানে বোঝা হয় ঃ অমুক লোক নতুন পন্থার উদ্ভাবন করেছে, যা ইতিপূর্বে কারো দ্বারাই অনুসৃত হয়নি।

(الاعتصام ج -١، ص-١٨)

আর এ জন্যেই নবোদ্ভাবিত কাজকেই 'বিদয়াত' বলা হয় এবং অনুসরণের জন্য নতুন পন্থা বের করাকে বলা হয় ابتدع। আর এর ফলে যে কাজটি সংঘটিত হয় তাকে বলা হয় 'বিদয়াত'।

তিনি আরো লিখেছেন ঃ

وَ لَا مَعْنٰى لِلْبِدْعَةِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ الْفِعْلُ فِيْ اِعْتِقَادِ الْمُبْتَدِعِ شَرْعًا وَّ لَيْسَ بِمَشْرُوْعٍ -

(ج-٢،ص - ٩٣)

বিদয়াত তখনই বলা হবে, যখন বিদয়াতী কোনো কাজকে শরীয়ত মুতাবিক কাজ বলে মনে করবে অথচ তা মূলত শরীয়ত মুতাবিক নয়। এ ছাড়া আর অন্য কোনো অর্থ নেই।

তার মানে, শরীয়ত মুতাবিক নয়— এমন কাজকে শরীয়ত মুতাবিক কাজ [illegible] আকীদা হিসেবে বিশ্বাস করে নেয়াই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বিদয়াত। অন্যত্র লিখেছেন ঃ

فَمِنْ هٰذَا الْمَعْنٰى سُمِّىَ الْعَمَلُ الَّذِىْ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ فِىْ الشَّرْعِ بِدْعَةً (اَيْضًا)

এ কারণেই এমন কাজকেও 'বিদয়াত' নাম দেয়া হয়েছে, যে কাজের সমর্থনে শরীয়তের কোনো দলীল নেই। তা হলো ঃ

فَالْبِدْعَةُ اِذَنْ عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيْقَةٍ فِىْ الدِّيْنِ مُخْتَرَعَةٍ تُضَاهِى الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوْكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِىْ التَّعَبُّدِ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ - (الاعتصام ج- ا، ص- ١٩)

মোটকথা দাঁড়াল এই যে, বিদয়াত বলা হয় দ্বীন-ইসলামের এমন কর্মনীতি বা কর্মপন্থা চালু করাকে, যা শরীয়তের বিপরীত এবং যা করে আল্লাহ্র বন্দেগীর ব্যাপারে আতিশয্য ও বাড়াবাড়ি করাই হয় লক্ষ্য।

আবার প্রকৃত বিদয়াত ও আপেক্ষিক বিদয়াতের পার্থক্য প্রদর্শন প্রসঙ্গে ইমাম শাতেবী লিখেছেন ঃ

اِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَقِيْقَةَ الَّتِىْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيْلٌ شَرْعِىٌّ لَامِنْ كِتٰبٍ وَّ لَامِنْ سُنَّةٍ وَّ لَا اِجْمَاعٍ وَّ لَا اِسْتِدْلَالَ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ وَ لَا فِى الْجُمْلَةِ وَ لَافِى التَّفْصِيْلِ وَلِذٰلِكَ سُمِّيَتْ بِدْعَةً لِاَنَّهَا مُخْتَرَعٌ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ - (الاعتصام ج : ٢)

প্রকৃত ও সত্যিকারের বিদয়াত তাই, যার স্বপক্ষে ও সমর্থনে শরীয়তের কোনো দলীলই নেই। না আল্লাহ্র কিতাব, না রাসূলের হাদীস, না ইজমার কোনো দলীল, না এমন কোনো দলীল পেশ করা যায় যা বিজ্ঞজনের নিকট গ্রহণযোগ্য। না মোটামুটিভাবে, না বিস্তারিত ও খুটিনাটিভাবে। এ জন্যে এর নাম দেয়া হয়েছে বিদয়াত। কেননা তা মনগড়া, স্বকপোলকল্পিত, শরীয়তে যার কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

প্রখ্যাত হাদীসবিদ ইমাম খাত্তাবী 'বিদয়াতের' সংজ্ঞা দিয়েছেন এ ভাষায় ঃ

كُلُّ شَىْءٍ اُحْدِثَ عَلٰى غَيْرِ اَصْلٍ مِنْ اُصُوْلِ الدِّيْنِ وَعَلٰى غَيْرِ عِيَارِهٖ وَ قِيَاسِهٖ وَ مَّا مَاكَانَ مَبْنِيًّا عَلٰى قَوَاعِدِ الْاُصُوْلِ وَمَرْدُوْدٌ اِلَيْهَا فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ وَّ لَاضَلَالَةٍ -
(معالم السنن ج -٤، ص- ٣٠١)

যে মত বা নীতি দ্বীনের মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, নয় কোনো দৃষ্টান্ত এবং কিয়াস সমর্থিত— এমন যা-ই নবোদ্ভাবিত করা হবে, তা-ই বিদয়াত।

কিন্তু যা দ্বীনের মূলনীতি মুতাবিক, তারই ভিত্তিতে গঠিত, তা বিদয়াতও নয়, গোমরাহীও নয়।

হাফেজ ইবনে রজবও এ কথাই লিখেছেন ঃ

اَلْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ مَا اُحْدِثَ مَكَّ لَا اَصْلَ لَهٗ فِى الشَّرِيْعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ -

(تحفة الاحوذى شرح الترمذى ج -٧، ص -٤٣٩ جامع العلوم)

'বিদয়াত' বললে বোঝায় তা, যা নবোদ্ভাবিত, বোঝার মতো কোনো দলীল বা প্রমাণ শরীয়তে যার নেই।

কুরআন ও হাদীসে 'বিদয়াত' শব্দের উল্লেখ

কুরআন মজীদে 'বিদয়াত' (بدعة) শব্দটি তিনটি ক্ষেত্রে তিনভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

একঃ আল্লাহ সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দুটো আয়াতে। একটি আয়াত ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ط وَ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَ -

(البقرة - ١١٧)

আসমান-জমিনের সম্পূর্ণ নবোদ্ভাবনকারী, নতুন সৃষ্টিকারী। তিনি যখন কোনো কাজের ফয়সালা করেন, তখন তাকে শুধু বলেন ঃ হও। অমনি তা হয়ে যায়।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ط وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ج وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

(الانعام ١٠١)

তিনি তো আসমান-জমিনের নব সৃষ্টিকারী। তাঁর সন্তান হবে কোত্থেকে, কেমন করে হবে তাঁর স্ত্রী? তিনি-ই তো সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি সর্ব বিষয়েই অবহিত।

এ দুটো আয়াতেই আল্লাহ তা'আলাকে 'আসমান জমিনের বদীউন'— 'পূর্ব দৃষ্টান্ত, পূর্ব উপাদান ও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই সৃষ্টিকারী' বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়, রাসূলে করীম (স)–এর জবানীতে তাঁর নিজের সম্পর্কে বলা একটি আয়াতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে ঃ

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِىْ مَايُفْعَلُ بِىْ وَ لَا بِكُمْ - (الاحقاف : ٩)

বলো হে নবী! আমি কোনো অভিনব প্রেরিত ও নতুন কথার প্রচারক রাসূল হয়ে আসিনি। আমি নিজেই জানিনে আমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে, তোমাদের সাথে কি করা হবে, তাও আমার অজ্ঞাত।

আর তৃতীয়, এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বনী ইসরাঈলের এক অংশের লোকদের বিশেষ ধরনের আমলের কথা বলতে গিয়ে। আয়াতটি এই ঃ

وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَ عُوْهَا مَاكَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ - (الحديد : ٢٧)

এবং অত্যধিক ভয়ের কারণে গৃহীত কৃচ্ছ্রসাধনা ও বৈরাগ্য নীতি তারা নিজেরাই রচনা করে নিয়েছে। আমরা তাদের ওপর এ নীতি লিখে ফরয করে দিইনি। বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি সন্ধানকেই তাদের জন্যে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছিলাম।

এখানে 'রাহবানিয়াত'কে 'বিদয়াত' বলা হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা ব্যবস্থা করে দেননি, লোকেরা নিজেদের তরফ থেকে রচনা করে নিয়েছে। এখানে যে 'বিদয়াতের' কথা বলা হয়েছে সুন্নাতের বিপরীত শব্দ হিসেবে, এ গ্রন্থে আমাদের তা-ই আলোচ্য বিষয়। এ আয়াত থেকে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হলো ঃ আল্লাহ বান্দাদের জন্যে যে বিধি ও বিধান দেননি— বান্দারা নিজেদের ইচ্ছেমত যা রচনা করে নিয়েছে, তাই 'বিদয়াত'। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যা কিছু লিখে দিয়েছেন, বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যা করতে আদেশ করেছেন, তা করা বিদয়াত নয়। এখান থেকেই 'বিদয়াত'' সংক্রান্ত মূল সংজ্ঞা ও ভাবধারার স্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল।

সূরা 'আল-কাহাফ'-এর এক আয়াতে 'বিদয়াত' শব্দের এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায়।

আয়াতটি এই ঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا- (الكهف : ١٠٣-١٠٤)

বলো হে নবী! আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের কথা কি তোমাদের বলবো ? তারা হচ্ছে এমন লোক, যাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনাই দুনিয়ার জীবনে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে আর তারাই মনে মনে ধারণা করে যে, তারা খুবই ভালো কাজ করেছে।

অর্থাৎ মূলত যাবতীয় কাজকর্ম ভুল ভিত্তিতে সম্পাদিত হওয়া সত্ত্বেও যারা নিজেদের কাজকে খুবই ভালো— খুবই ন্যায়সঙ্গত ও সওয়াবের কাজ বলে মনে করে, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত লোক। বিদয়াতপন্থীরাও ঠিক এমনি। তারা যেসব কাজ করে, আসলে তা আল্লাহ্‌র দেয়া নীতির ভিত্তিতে নয়। তা সত্ত্বেও এই হচ্ছে বিদয়াতের সঠিক পরিচয়। সূরা আল-কাহাফ-এর উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ

وَإِنَّمَا هِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ عَبَدَ اللّٰهُ عَلٰى غَيْرِ طَرِيْقَةٍ مَّرْضِيَّةٍ يَّحْسَبُ أَنَّهٗ مُصِيْبٌ فِيْهَا وَ اِنَّ عَمَلَهٗ مَقْبُوْلٌ وَّ هُوَ مُخْطِيءٌ وَ عَمَلُهٗ مَرْدُوْدٌ -

(تفسير القران الحكيم ج- ٣ ، ص- ١٠٧)

এ আয়াত সাধারণভাবে এমন সব লোকের বেলায়ই প্রযোজ্য, যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় পন্থার বিপরীত পন্থা ও পদ্ধতিতে। তারা যদিও মনে করছে যে, তারা ঠিক কাজই করছে এবং আশা করছে যে, তাদের আমল আল্লাহ্‌র নিকট স্বীকৃত ও গৃহীত হবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ভুল নীতির অনুসারী এবং এ পর্যায়ে তাদের আমল আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাখ্যাত।

অর্থাৎ ইবাদাত-বন্দেগীর কাজ— যা করলে সওয়াব হবে এবং যা না করলে গুনাহ হবে বলে মনে করা হবে— এমন সব কাজই হতে হবে আল্লাহ্‌র সন্তোষমূলক পন্থা ও পদ্ধতিতে, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের দেখিয়ে দেয়া নিয়মে ও প্রক্রিয়ায়। এই হচ্ছে সুন্নাত। আর তার বিপরীত রীতি ও নিয়মে হলে তা হবে সুস্পষ্ট বিদয়াত। কেননা তা সুন্নাত বিরোধী। ইমাম কুরতুবী তা-ই বিদয়াত বলেছেন এমন সব জিনিসকে, যা ঃ

مَالَمْ يَوَافِقْ كِتَابًا اَوْ سُنَّةً اَوْ عَمَلَ الصَّحَابَةِ - (تفسير القرطبى ج -٢، ص -٨٧)

যা আল্লাহ্‌র কিতাব বা রাসূলের সুন্নাত অথবা সাহাবাদের আমলের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও তার অনুরূপ নয়।

এ সম্পর্কে অধিক সুস্পষ্ট কথা বিবৃত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতটিতে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا - (النساء : ١١٥)

যে ব্যক্তি সঠিক হেদায়েতের পথ স্পষ্ট উজ্জ্বল হয়ে উঠার পরও রাসূলে করীমের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিন সমাজের সুন্নাতী আদর্শকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো পথ ও আদর্শের অনুসরণ করবে, আমরা তাদের সে পথেই চলতে দেবো। আর কিয়ামতের দিন তাদের পৌঁছে দেবো জাহান্নামে। বস্তুত জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ জায়গা।

এ আয়াতটি সুন্নাত-এর কুরআনী দলীলসমূহের অন্যতম। যে হেদায়েতের সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠার কথা এখানে বলা হয়েছে মূলত তা-ই 'সুন্নাত'। এ সুন্নাতই হেদায়েতের একমাত্র রাজপথ। কেননা আল্লাহ্র কালাম এবং আল্লাহ্র অস্পষ্ট ওহী (ওহীয়ে খফী) অনুযায়ীই তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে সুন্নাতের এ আদর্শকেই তিনি উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন। রাসূলের তৈরি সমাজের মুমিনগণ এইপথ অনুসরণ করেই চলতেন। এখন যদি কেউ রাসূলের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করে চলতে প্রস্তুত না হয়, আর এ জন্যে মুমিন সমাজের অনুসৃত আদর্শকে বাদ দিয়ে অপর কোনো আদর্শ অনুসরণ করে চলে, তবে তার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব রাসূলের 'সুন্নাত'কে অনুসরণ করে চলাই কল্যাণ ও মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়।

হাদীসে নবী করীমের ভাষায় সুন্নাতকেই বলা হয়েছে 'আল-আমর'। হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) ঘোষণা করেছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - (بخارى، مسلم)

যে লোক আমার 'এই জিনিসে' এমন কোনো জিনিস নতুন শামিল বা উদ্ভাবন করবে, যা মূলত এ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা-ই প্রত্যাহৃত হবে।

এই হাদীসে 'আমর' (অমর) বলে বুঝিয়েছেন মূল দ্বীন-ইসলামকে, যা নবী করীম (স) দুনিয়ায় উপস্থাপিত করেছেন। কেননা ঃ

مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ طَرِيْقَهُ وَشَانُهُ الَّذِىْ يَتَعَلَّقُ بِهِ -

এই দ্বীন-ইসলামই তাঁর কর্মনীতি এবং তাঁর মান-মর্যাদা ও অবস্থার সাথে পূর্ণ সম্পৃক্ত।

আল্লামা কাজী ইয়াজ এ হাদীসের অর্থ বলেছেন এ ভাষায় ঃ

مَنْ اَحْـدَثَ فِى الْاِسْـلَامِ رَاْيًا لَمْ يَكُنْ لَّهُ مِنَ الْكِتـبِ وَالسُّنَّةِ سَنَدٌ ظَاهِرٌ اَوْ خَـفِىٌّ مَلْفُوْظٌ اَوْ مُسْتَنْبَطٌ فَهُوَ مَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ - (مرقاةج-١ ص -٢١٥)

যে লোক ইসলামে এমন কোনো মত বা রায় প্রবেশ করাবে— ইসলামী বলে চালিয়ে দেবে, যার অনুকূলে কুরআন ও হাদীসে কোনো স্পষ্ট প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন কিংবা প্রকাশযোগ্য কোনো সনদ বর্তমান নেই, তা-ই প্রত্যাহারযোগ্য।

আর এ জিনিসেরই অপর নাম 'বিদয়াত'।

উপরোক্ত হাদীসে রাসূলে করীম (স) امرناهذا 'আমার এই ব্যাপারে' বলে ইসলামকেই বুঝিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, রাসূলের দৃষ্টিতে এ দ্বীন এক পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ পরিণত দ্বীন এবং তা সর্বজন পরিচিত, ব্যাপক প্রচারিত ও অনুভবযোগ্য মাত্রায় সর্বদিকে প্রকাশিত। এ দ্বীন বা দ্বীনের কোনো মৌলিক খুটিনাটি দিকও কোনো দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অজ্ঞাত, অপরিচিত বা লুক্কায়িত নেই। এখন যদি কেউ এতে দ্বীন-বহির্ভূত কোনো জিনিস বৃদ্ধি করতে চায়, কোনো অ-দ্বীনী ব্যাপার বা কাজকে 'দ্বীনী' বলে চালিয়ে দিতে চায়, তাহলে সে তো গোটা দ্বীনকেই বিনষ্ট কর দেবে। কেননা সে তো মূল দ্বীনকে আদৌ বুঝতে বা চিনতে পারেনি। এ জন্যে বিদয়াতের পরিচয় দান করতে গিয়ে আল্লামা কান্দেলভী লিখেছেন ঃ

اَلْمُرَادُ بِهَا مَا اُحْدِثَ وَ لَيْسَ لَهُ اَصْلٌ فِى الشَّرْعِ وَسُمِّىَ فِىْ عُرْفِ الشَّرْعِ بِدْعَةٌ -
(التعليق الصبيح فى مشكوة المصابيح)

বিদয়াত বলতে বোঝায় এমন জিনিস, যা দ্বীনের ক্ষেত্রে অভিনব, শরীয়তে যার কোনো ভিত্তি নেই, মৌলিক সমর্থন নেই। শরীয়তের পরিভাষায় তারই নাম হচ্ছে বিদয়াত।

'বিদয়াত'-এর এ সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, ব্যবহারিক জীবনের কাজে কর্মে এবং বৈষয়িক জীবন যাপনের জন্যে নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন এবং

নবাবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণের সঙ্গে শরীয়তী বিদয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা তার কোনোটিই ইবাদত হিসেবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে থেকে সওয়াব পাওয়ার আশায় করা হয় না। অবশ্য এ পর্যায়েও শর্ত এই যে, তার কোনোটিই শরীয়তের মূল আদর্শের বিপরীত হতে পারবে না। অনুরূপভাবে যেসব ইবাদত নবী করীম (স) কিংবা সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে কথার কিংবা কাজের বিবরণের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বা ইশারা ইঙ্গিতে প্রামণিত, তাও বিদয়াত নয়। এই সঙ্গে এ কথাও জানা গেল যে, নবী করীম (স)-এর জমানায় যে কাজ করার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো দ্বীনি কাজের জন্যে দ্বীনি লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই তা করার প্রয়োজন দেখা দেবে, তা করা-ও বিদয়াত পর্যায়ে গণ্য হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রচলিত নিয়মে মাদ্রাসা শিক্ষা ও প্রচারমূলক সংস্থা ও দ্বীনি প্রচার বিভাগ কায়েম করা, কুরআন হাদীস বোঝাবার জন্যে আরবী ব্যাকরণ রচনা বা ইসলাম বিরোধীদের জবাব দেয়ার জন্যে যুক্তিবিজ্ঞান ও দর্শন রচনা, জিহাদের জন্যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদান, দ্রুতগামী ও সুবিধাজনক যানবাহন ব্যবহার এসব জিনিস এক হিসেবে ইবাদতও বটে যদিও এগুলো রাসূলে করীম (স) এবং সাহাবায়ে কিরামের যুগে বর্তমান রূপে প্রচলিত হয়নি। তা সত্ত্বেও এগুলোকে 'বিদয়াত' বলা যাবে না। কেননা এ সবের এভাবে ব্যবস্থা করার কোনো প্রয়োজন সেকালে দেখা দেয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলেই তা করা হয়েছে এবং তা দ্বীনের জন্যেই জরুরী। আর সত্য কথা এই যে, এসবই সেকালে ছিল সেকালের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় রূপে এবং ধরনে। তাই আজ এর কোনোটিই 'বিদয়াত' নয়।

এসব সম্পর্কে এ কথাও বলা চলে যে, এগুলো মূলত কোনো ইবাদত নয়। এগুলো করলে সওয়াব হয়, সে নিয়তেও তা কেউ করে না। এগুলো হলো ইবাদতের উপায়, মাধ্যম বা ইবাদতের পূর্বশর্ত। তার মানে এগুলো এমন নয়, যাকে বলা যায় اِحْدَاثٌ فِى الدِّيْنِ —'দ্বীনের মধ্যে নতুন জিনিসের উদ্ভাবন।' এবং এগুলো হচ্ছে اِحْدَثُ الدِّيْنِ —'দ্বীনি পালন ও কার্যকরকরণের উদ্দেশ্যে নবোদ্ভাবিত জিনিস।' আল-কুরআন ও হাদীসের নিষিদ্ধ হলো দ্বীনের ভিতরে দ্বীনরূপে নতুন জিনিস উদ্ভাবন করা। দ্বীনের বাস্তবায়নের জন্যে নতুন জিনিসের উদ্ভাবন তো নিষিদ্ধ নয় আদৌ। কাজেই এ জিনিসকে না 'বিদয়াত' বলা যাবে, না তা অবশ্যই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে।

কুরআনের আয়াত ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ -

যারা নিজেদের দ্বীনের মূলকে নানা ভাগে ভাগ করে নানা দিকে যাওয়ার পথ বের করেছে এবং নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার — হে নবী— কোনোই সম্পর্কে নেই।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা খাজেন লিখেছেন, হযরত আবূ হুরায়রার বর্ণনানুযায়ী এখানে বলা হয়েছে, এ উম্মতে মুসলিমার গোমরাহ লোকদের কথা। আর অপর এক হাদীস অনুযায়ী নবী করীম (স) বলেছেন যে, এ আয়াতে মুসলিম উম্মতের বিদয়াতপন্থী, সংশয়বাদী ও পথভ্রষ্ট লোকদের কথাই বলা হয়েছে।

এ আলোচনার ফলে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) যে দ্বীন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে লাভ করেছেন, যা তিনি নিজে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে চলেছেন এবং যা তিনি জনগণের সামনে উপস্থাপিত করেছেন ও অনুসরণ করে চলতে বলেছেন, এক কথায় একটি পরিভাষা হিসেবে তা-ই হচ্ছে সুন্নাত'। আর তার বিপরীত যা কিছু— আকীদা, বিশ্বাস, কথা, আমল ও চরিত্র তা যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক তা-ই হলো 'বিদয়াত'। এ দৃষ্টিতে সুন্নাত ও বিদয়াত দুটো পরস্পর বিপরীত পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ, সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চিন্তা-বিশ্বাস, জীবনধারা ও জীবন ব্যবস্থা। এ দুটো সরল রেখার মতো পরস্পর বিপরীত দিকে ধাবিত। যা সুন্নাত তা বিদয়াত নয়; যা বিদয়াত তা সুন্নাত নয়। অনুরূপভাবে সুন্নাত কখনো বিদয়াত হতে পারে না এবং বিদয়াত কোনোরূপেই এবং কারো কথাতেই সুন্নাতরূপে গৃহীত হতে পারে না।

কুরআনে সুন্নাতের প্রমাণ

কুরআন মজীদে নবী করীম (স) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ - (الاعراف ١٥٧)

তিনি 'মারূফ' কাজের আদেশ করেন এবং 'মুনকার' কাজের নিষেধ করেন।

এই 'মারূফ' ও 'মুনকার' বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'মারূফ' বলতে সুন্নাত

এবং 'মুনকার' বলতে বিদয়াতকে বোঝানো হয়েছে। আল্লামা হাদ্দাদী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন ঃ

اَلْمَعْرُوْفُ هُوَ السُّنَّةُ وَالْمُنْكَرُ هُوَ الْبِدْعَةُ - (روح المعانى ج ، ص ٩٥٩)

'মারূফ' হচ্ছে 'সুন্নাত' আর 'মুনকার' হচ্ছে 'বিদয়াত'

হাদীসে সুন্নাতের প্রমাণ

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন ঃ

نَزَّلَ الْقُرْاٰنُ وَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّنَنَ ثُمَّ قَالَ اتَّبِعُوْنَا فَوَ اللّٰهِ اِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا تَضِلُّوا - (مسند احمد)

কুরআন নাযিল হলো এবং নবী করীম (স) সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমরা আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ্‌র কসম, যদি তা না করো, তবে তোমরা গোমরাহ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপনের যে নিয়ম, পথ ও আদর্শ তা-ই সুন্নাত। রাসূলে করীম (স) এই সুন্নাতকেই উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তা-ই অনুসরণ করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন সব মানুষকে। আর শেষ ভাগে বলেছেন, এ সুন্নাতের অনুসরণ করা না হলে স্পষ্ট গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। বস্তুত এ ভ্রষ্টতা-ই হচ্ছে বিদয়াত— যা সুন্নাতের বিপরীত।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ

كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ خَطًّا هٰكَذَا اَمَا مَهٗ فَقَالَ هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَطَّيْنِ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَخَطَّيْنِ عَنْ شِمَالِهٖ فَقَالَ هٰذَا سَبِيْلُ الشَّيْطَانِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهٗ فِى الْخَطِّ الْاَوْسَطِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ : وَاَنَّ هٰذَا اصِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - (احمد، نسائى ، دارمى)

আমরা একদা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি তাঁর সামনে একটি রেখা আঁকলেন এবং বললেন ঃ এই হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের

পথ। অতঃপর তার ডান দিকে দুটো ও বাম দিকে দুটো রেখা আঁকলেন এবং বললেন— এ হচ্ছে শয়তানের পথ। তারপর তিনি মাঝখানে রেখার ওপর হাত রাখলেন এবং কুরআনের এ আয়াতটি পড়লেন ঃ (যার মানে হলো) "এই হচ্ছে আমার পথ সুদৃঢ়, সোজা এবং সরল, অতএব তোমরা তা-ই অনুসরণ করে চল। আর এ ছাড়া অন্যান্য যত পথ-রেখা দেখতে পাচ্ছ, এর কোনোটাই অনুসরণ করো না। অন্যথায় তোমরা আল্লাহ্‌র পথ থেকে দূরে সরে যাবে— বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আল্লাহ তোমাদেরকে এরই নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এ নির্দেশ অবশ্যই পালন করবে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে উভয়ের ভাষায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। (দারেমী, মুসনাদে আহমদ)

হযরত ইবরাজ ইবনে সারিয়াতা বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْبِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ - (مسند احمد)

তোমাদের অবশ্যই অনুসরণ করে চলতে হবে আমার সুন্নাত এবং হেদায়েত প্রাপ্ত সত্যপন্থী খলীফাদের সুন্নাত। তোমরা তা শক্ত করে ধরবে, দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরে স্থির হয়ে থাকবে (যেন কোনো অবস্থায়ই তা হাতছাড়া হয়ে না যায়, তোমরা তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত হয়ে না পড়)।[১]

---

১. উপরোক্ত হাদীসে নবী করীম (স) নিজের সুন্নাতের সঙ্গে সঙ্গে খুলাফায়ে রাশেদূনের সুন্নাতকেও অনুসরণ করার তাগিদ করেছেন। কেননা তাঁরা পুরোপুরিভাবেই রাসূলের সুন্নাতকে অনুসরণ করেছেন, সেই অনুযায়ীই তাঁরা কাজ করেছেন এবং কোনো ক্ষেত্রেই তাঁরা রাসূলের সুন্নাতের বিপরীত কোনো কাজ করেননি। তা হলে সে সুন্নাতকে 'খুলাফায়ে রাশেদূনের সুন্নাত' বলা হলো কেন ? বলা হয়েছে এ জন্য যে, তাঁরা রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ীই আমল করেছেন, তাঁরা রাসূলের কথা ও কাজ থেকে তা-ই বুঝতে পেরেছেন এবং তা-ই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকটি ব্যাপারে রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার জন্যে অতিশয় উদগ্রীব থাকতেন এবং তার বিরুদ্ধতা থেকে তাঁরা সবাই দূরে থাকতেন। কেবল বড় বড় ব্যাপারেই নয়, ছোট ছোট ব্যাপারেও তাঁরা তাই করতেন। কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত থেকে কোনো বিষয়ে কোনো দলীল পেলে তাঁরা তা-ই আঁকড়ে ধরেছেন, কিছুতেই তা ত্যাগ করতেন না। অবশ্য যে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো নির্দেশ পেতেন না, সে ক্ষেত্রে তারা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা, পর্যালোচনা ও পারস্পরিক পরামর্শ করে

সুন্নাতকে শক্ত করে ধারণ করার এবং অচল-অটলভাবে তার অনুসরণ করার এবং তাগিদ অত্যন্তদ তীব্র ও মজবুত। কেননা এ সুন্নাত হচ্ছে নবী করীম (স)-এর বাস্তব কর্মনীতি। তার অনুসরণই হলো কার্যত ইসলাম পালন আর তা ত্যাগ করা হলে সুস্পষ্ট গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বলা হয়েছে ঃ

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ -

মূল সত্য বাদ দিলে গোমরাহী ছাড়া আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে ?

এজন্য রাসূল করীম (স)-এর ঘোষণাটি অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসের শেষ বাক্যটি হলো ঃ

وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَضَلَلْتُمْ - (مسلم)

তোমরা যদি তোমাদের নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ করো, তাহলে তোমরা নিঃসন্দেহে গোমরা হয়ে যাবে।

তিনি অপর এক হাদীসে বলেছেন ঃ

اِبْعَثْهَا قِيَامًا مُّقَيَّدَةً لِسُنَّةِ اَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

যে লোক আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে— তা অনুসরণ করে চলবে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়, নয় সে আমার পথের পথিক।

এক ব্যক্তি বসানো অবস্থায় উট জবাই করতে শুরু করছিল। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাকে বলেন ঃ

একটা মত ঠিক করতেন ও তদনুযায়ী আমল করতেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, খুলাফায়ে রাশেদূন যদি নিজেদের মত মতো কাজ করেই থাকেন তাহলে 'খুলাফায়ে রাশেদূনের সুন্নাত' বলার কি তাৎপর্য থাকতে পারে ? এর জবাব হলো এই যে, এমন অনেক লোকই ছিল যারা রাসূলের সময় ছিল না, খলীফাদের সময় ছিল কিংবা এ উভয় কালেই জীবিত ছিল; কিন্তু উত্তরকালের অনেক নতুন অবস্থার উদ্ভব হওয়ার কারণে খুলাফায়ে রাশেদূনকে সে ব্যাপারে একটা নীতি নির্ধারণ করতে হয়েছে। তা দেখে এ পর্যায়ে লোকদের মনে নানা সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। সেই কারণে এ কথাটি বলে রাসূলে করীম (স) এ সন্দেহ দূর করার ব্যবস্থা করে দিলেন। বলে দিলেন, তারা যে কাজ করবে তাতে আমারই সুন্নাত অনুসৃত হয়েছে বলে তোমরাও তা মেনে নেবে।

مِنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّىْ -

উটটিকে বেঁধে দাঁড় করাও, তারপর নহর করো— এ-ই হচ্ছে হযরত আবুল কাসেম মুহাম্মদ (স)-এর সুন্নাত।

মুসলিম সমাজে শরীয়ত মুতাবিক যে কর্মনীতি চালু রয়েছে, হাদীসে তাকেও 'সুন্নাত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهٗ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ -

যে লোক ঈদুল-আজহার নামায পড়ে জন্তু জবাই করলো, সে তার কুরবানী পূর্ণ করে দিলো এবং মুসলমানদের রীতিনীতি ঠিক রাখল।

'রাসূলের সুন্নাত' মানে রাসূলের আদর্শ, রাসূলের কর্ম-বিধান। আর তা অনুসরণ না করার মানে তার বিপরীত কর্মাদর্শ মেনে চলা। তাহলে যে লোক রাসূলে করীম (স)-এর বিপরীত কর্মাদর্শ পালন ও অনুসরণ করে চলবে, সে কিছুতেই ইসলাম পালনকারী হতে পারে না, হতে পারে না সে মুসলিম। বস্তুত এ হাদীস থেকে আরো বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হলো যে, এ 'সুন্নাত' ফিকাহ্শাস্ত্রের পারিভাষিক সুন্নাত নয়, নয় হাদীস শাস্ত্রবিদদের পারিভাষিক সুন্নাত। এসব হাদীসে 'সুন্নাত' বলে বোঝান হয়েছে রাসূলে করীমের উপস্থাপিত ও বাস্তবে অনুসৃত জীবনাদর্শ। আর এ সুন্নাতই আমাদের আলোচ্য।

বিদয়াতের তাৎপর্য

এই সুন্নাতের বিপরীত যা তা-ই হচ্ছে বিদয়াত। বিদয়াত কাকে বলে ? সাইয়েদ জামালুদ্দীন আল-কাসেমী লিখেছেন ঃ

> বিদয়াত বলতে বোঝায় দ্বীন পূর্ণ পরিণত হওয়ার পর দ্বীনের মধ্যে কোনো নতুন জিনিসের উদ্ভব হওয়া। আর তা হচ্ছে এমন সব জিনিস যার অস্তিত্ব নবী করীম (স)-এর যুগে বাস্তব কাজ, কথা বা সমর্থন অনুমোদনের আকারেও বর্তমান ছিল না এবং শরীয়তের নিয়ম বিধানের দৃষ্টিতেও যে বিষয়ে কোনো অনুমতি পাওয়া যায় না। আর অস্বীকৃতিও পাওয়া যায় না।
> (اصلاح لمساجد البدع والعوائد)

এ সংজ্ঞার দৃষ্টিতে যার অস্তিত্ব সাহাবায়ে কিরামের যুগের কথা, কাজ বা অনুমতি পর্যায়ে কোনো 'ইজমা' হওয়ারও সন্ধান পাওয়া যায় না, তা-ও বিদয়াত।

কেননা দ্বীনে কোনো নতুন জিনিস উদ্ভব করার কোনো অধিকারই কারো থাকতে পারে না। বস্তুত দ্বীন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাতে কোনো জিনিসের বৃদ্ধি করা বা কোনো নতুন জিনিসকে দ্বীন মনে করে তদনুযায়ী আমল করা— আমল করলে সওয়াব হবে বলে মনে করা এবং আমল না করলে আল্লাহ্‌র আজাব হবে বলে ভয় করাই হচ্ছে বিদয়াতের মূল কথা। যে বিষয়েই এরূপ অবস্থা হবে, তা-ই হচ্ছে বিদয়াত। কেননা, এরূপ করা হলে স্পষ্ট মনে হয় যে, আল্লাহ দ্বীনকে পূর্ণ পরিণত করে দেয়ার পরও মনে করা হচ্ছে যে, তা পূর্ণ নয়, অপূর্ণ এবং তাতে অনেক কিছুই অভাব ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে। আর এই ভাবধারাটা কুরআনের নিম্নোক্ত ঘোষণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কুরআন মজীদে দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -
(المائدة ٣)

> আজকার দিনে তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ-পরিণত করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম— মনোনীত করলাম।

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ। তাতে নেই কোনো অসম্পূর্ণতা, কোন কিছুর অভাব। অতএব তা মানুষের জন্যে চিরকালের যাবতীয় দ্বীনি প্রয়োজন পূরণে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম এবং এ দ্বীনে বিশ্বাসী ও এর অনুসরণকারীদের কোনো প্রয়োজন হবে না এ দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো দিকে তাকাবার, বাইরের কোনো কিছু এতে শামিল করার এবং এর ভিতর থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করার। কেননা এতে যেমন মানুষের সব মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তেমনি এতে নেই কোনো বাজে— অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্য জিনিস। অতএব না তাতে কোনো জিনিস বৃদ্ধি করা যেতে পারে, না পারা যায় তা থেকে কোনো কিছু বাদ দিতে। এ দুটোই দ্বীনের পরিপূর্ণতার বিপরীত এবং আল্লাহ্‌র উপরোক্ত ঘোষণার স্পষ্ট বিরোধী। ইসলামী ইবাদতের ক্ষেত্রে সওয়াবের কাজ বলে এমন সব অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করা, যা নবী করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরামের জামানায় চালু হয়নি এবং তা দেখতে যতই চাকচিক্যময় হোক না-কেন তা স্পষ্টত বিদয়াত, তা দ্বীন-ইসলামের পরিপূর্ণতার— কুরআনী ঘোষণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলে মনোপূত ছিল না, পছন্দসই ছিল না বলেই তা সেকালে চালু করা হয়নি। এ কারণেই ইমাম মালিক বলেছিলেন ঃ مالم يكن يومئذ دينًا لايكون اليوم دينا সেকালে যে কাজ দ্বীনী কাজ বলে ঘোষিত ও নির্দিষ্ট হয়নি, আজও তাকে দ্বীনি কাজ বলে মনে করা যেতে পারে না।

দ্বীনের ক্ষেত্রে বিদয়াতের প্রচলনে মূল দ্বীনেরই বিকৃত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কারণ নিহিত রয়েছে। ইবাদতের কাজ-কর্মে যদি আজ মনগড়া নিয়ম, শর্ত ও অনুষ্ঠানাদিকে বরদাশত করে নেয়া হয়, তাহলে তাতে নতুন নতুন জিনিস এত বেশি শামিল হয়ে যাবে যে, পরে কোনটি আসল এবং নবী করীম (স)-এর প্রবর্তিত আর কোনটি নকল— পরবর্তীকালের লোকদের শামিল করা জিনিস, তা নির্দিষ্ট করাই সম্ভব হবে না। অতীতকালের নবীর উম্মতদের দ্বারা নবীর উপস্থাপিত দ্বীন বিকৃত ও বিলীন হয়ে যাওয়ারও একমাত্র কারণই এই। তারা নবীর প্রবর্তিত ইবাদতে মনগড়াভাবে নতুন জিনিস শামিল করে নিয়েছিল। কিছুকাল পরে আসল দ্বীন কি, তা চিনবার আর কোনো উপায়ই থাকল না।

'দ্বীন' তো আল্লাহ্‌র দেয়া এবং রাসূলের উপস্থাপিত জিনিস। তাতে যখন কেউ নতুন কিছু শামিল করে, তখন তার অর্থ এই হয় যে, আল্লাহ্ বা রাসূলে করীম (স) যেন বুঝতেই পারছিলেন না দ্বীন কিরূপ হওয়া উচিত আর এরা

এখন বুঝতে পারছে। তাই নিজেদের বুঝমত সব নতুন জিনিস এর মাঝে শামিল করে এর ত্রুটি দূর করতে চাইছে এবং অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করে তুলছে। আর এর ভিতর থেকে কিছু বাদ-সাদ দিয়ে একে যুগোপযোগী করে তুলতে চাইছে। এরূপ কিছু করার অধিকার তাকে কে দিলো ? আল্লাহ্ দিয়েছেন? তাঁর রাসূল দিয়েছেন ? না, কেউ-ই দেয় নি, নিজ ইচ্ছে মতোই সে করেছে। ঠিক এ দিকে লক্ষ্য করেই হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেছেন ঃ

كُلُّ عِبَادَةٍ لَّمْ يَتَعَبَّدْهَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَعْبُدُوْهَا فَاِنَّ الْاَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْاٰخِرِ مَقَالًا فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ وَخُذُوا الطَّرِيْقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - (الاعتصام، ج- ٢)

যে ইবাদত সাহাবায়ে কিরাম করেন নি, সে ইবাদাত তোমরা করো না। (তাকে ইবাদত বলে মনে করো না, তাতে সওয়াব হয় বলেও বিশ্বাস করো না) কেননা অতীতের লোকেরা পিছনের লোকদের জন্য কিছু বাকী রেখে যান নি যা পরবর্তীকালের লোকদের পূরণ করতে হবে। অতএব হে মুসলিম সমাজ, তোমরা আল্লাহ্র ভয় করো এবং পূর্ববর্তী লোকদের রীতিনীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করে চলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও এরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে ঃ

এমতাবস্থায়ও দ্বীনের মাঝে কিছু বৃদ্ধি করা বা তা থেকে কিছু কমানর অর্থ শরীয়তের বিধানের অনধিকার চর্চা, অবৈধ হস্তক্ষেপ এবং আল্লাহ্র ঘোষণার বিরুদ্ধতা আর তাঁর অপমান। এরূপ অনধিকার চর্চা করার ধৃষ্টতা ক্ষমার অযোগ্য।

'বিদয়াত' করে এবং তা বরদাশত করে তারা, যারা একনিষ্টভাবে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করতে পারেনি, যারা নিজেদেরকে অনুগত বানাতে পারেনি রাসূলের। বস্তুত বিদয়াতের উৎস হচ্ছে নফসের খাহেশ, স্বেচ্ছাচারিতা, লালসা ও অবাধ্যতা। যারা আল্লাহ্র ফয়সালা ও রাসূলের পথ-প্রদর্শনকে নফসের খাহেশ পূরণের পথে বাধাস্বরূপ মনে করে, তারাই দ্বীনের ভিতরে নিজেদের ইচ্ছেমত হ্রাস-বৃদ্ধি করে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির পর যা হয় তাকেই দ্বীনের মর্যাদা দিয়ে বসে। আর যেহেতু এ কাজকেও দ্বীনি কাজই মনে করা হয়, সে জন্যে এ কাজের ভুল ও মারাত্মকতা তাদের চোখে ধরা পড়ে না। এ কারণেই বিদয়াতীরা কখনো

বিদয়াত থেকে তওবা করার সুযোগ পায় না। এ বিদয়াত এমনই এক মারাত্মক জিনিস, যা শরীয়তের ফরয ওয়াজিবকে পর্যন্ত বিকৃত করে দেয়। শরীয়তের ফরয ওয়াজিবের প্রতি অন্তরে থাকে না কোনো মান্যতা গণ্যতার ভাবধারা। শরীয়তের সীমালংঘন করার অভ্যাস হতে হতে লোকদের স্বাভাবিক প্রকৃতিই বিগড়ে যায় আর মন-মগজ এতোই বাঁকা হয়ে যায় যে, অতঃপর শরীয়তের সমস্ত সীমা-সরহদ চূর্ণ করে ফেলতেও কোনো দ্বিধা— কোন কুণ্ঠা জাগে না তাদের মনে। শরীয়ত বিরোধী কাজগুলোকে তখন মনে হতে থাকে খুবই উত্তম।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, দ্বীন-ইসলামের পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ বিধান হওয়ার সঠিক তাৎপর্য কি ? বস্তুত নবী করীম (স) দ্বীন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়কে বিস্তারিতভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আর দুনিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে দিয়েছেন মোটামুটি বিধান ও ব্যবস্থা। দিয়েছেন কতগুলো মূলনীতি। বাস্তব ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে ইসলামের শূরা ব্যবস্থা মুসলমানদের রাষ্ট্র নেতাকে শরীয়তের সীমার মধ্যে আনুগত্য দেয়া এবং তারা ইজতিহাদ করে যেসব হুকুম আহকাম বের করবে তা মানা, সহজতা বিধান, কষ্ট বিদূরণ ও প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা। এগুলো এমন যে, কালের পরিবর্তিত যে কোনো স্তরে এর নিয়ম বিধান সম্পূর্ণ নতুনভাবে মানুষের জীবন ও সমাজ গড়তে পারে। এ পর্যায়ে কয়েকটি হাদীসের ভাষা এখানে উল্লেখ্য। একটি হচ্ছে ইবরাজ ইবনে সারিয়ারা বর্ণিত হাদীস ঃ

وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْاَعْيُنُ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذِهٖ مَوْعِظَةٌ مُوَدِّعٍ فَمَا تَعْهِدُ اِلَيْنَا قَالَ : تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا وَ لَا يَزِيْغُ عَلَيْهَا بَعْدِىْ اِلَّا هَالِكٌ -

(ابوداؤد ، ترمذى)

রাসূলে করীম (স) একদা আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজ করলেন, উপদেশ দিলেন। তার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবে উপস্থিত লোকদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। লোকদের দিল নরম হয়ে গেল, কেঁপে উঠল। আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো বিদায় গ্রহণকারীর মতো ওয়াজ করলেন। তাহলে আমাদের প্রতি আপনি কি নির্দেশ দিচ্ছেন ? রাসূল (স) বললেন ঃ তোমাদের তো আমি এমন এক আলোকোজ্জ্বল আদর্শের

ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখে যাচ্ছি যার দৃষ্টিতে রাত ও দিনের মতোই উদ্ভাসিত। আমার চলে যাওয়ার পরে যে-ই এর বিরুদ্ধতা করবে সে-ই ধ্বংস হবে।

এ হাদীসের শব্দ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ বলতে রাসূলের কর্মময় বাস্তব জীবনের আদর্শ, দৃষ্টান্ত ও নির্দেশসমূহকে বোঝানো হয়েছে। আর বস্তুতই তা এমন উজ্জ্বল প্রকট জিনিস যে, তার দৃষ্টিতে মানব-জীবনের ঘোরতর সমস্যা সংকুল অন্ধকারেও দিনের আলোকের মতোই পথের দিশা লাভ করা যেতে পারে। অন্ধকার কোথাও এসে পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারে না, জীবনকে অচল ও সমস্যা ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারে না। কেননা নবী করীম (স) বিশ্ব-মানবতাকে এমনি এক আলোকোজ্জ্বল পথের দিশা দিয়ে যাবার জন্যেই এসেছিলেন দুনিয়ায়। আর তিনি তাঁর এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন পূর্ণ মাত্রায়। তাতে থেকে যায়নি কোনোরূপ অসম্পূর্ণতার কালো ছায়া। ইমাম মালিকের এই কথাটিও এই প্রেক্ষিতে পঠিতব্য ঃ

مَنِ ابْتَدَعَ فِى الْاِسْلاَمِ بِدْعَةً يَّرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ - (الاعتصام ،ج-١، ص -٢٨)

যে লোক ইসলামে কোনো বিদয়াত উদ্ভাবন করবে এবং তাকে ভালো ও উত্তম মনে করবে, সে যেন ধারণা করে নিয়েছে যে, নবী (স) রিসালাত ও নবুয়্যতের দায়িত্ব পালন করেন নি, খেয়ানত করেছেন। কেননা তিনি যদি তা করেই থাকেন, তাহলে ইসলাম ও সুন্নাতে ছাড়া আর তো কোনো কিছুর প্রয়োজন করে না। সব ভালোই তো তাতে রয়েছে।

ইবরাহীম নখয়ী (রহ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এমন কোনো কল্যাণই দেননি যা সাহাবায়ে কিরামের নিকট গোপন বা অজ্ঞাত থেকে গেছে। অথচ সাহাবারা তাঁর রাসূলেরই সঙ্গী-সাথী ছিলেন এবং তার মাখলুকাতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক ছিলেন।"

ইবরাহীম নখয়ী (রহ)-এর কথার তাৎপর্য এই যে, দ্বীনের ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। সত্যিকারভাবে যে দ্বীন রাসূলের নিকট থেকে পাওয়া গেছে, ঠিক তা-ই পালন করে চলা উচিত সব মুসলমানের। না তাতে কিছু কম করা উচিত, না তাতে কিছু বেশি করা সঙ্গত হতে পারে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে 'আহলি কিতাব'কে লক্ষ্য করে ঃ

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَ لَاتَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ - (نساء : ١٧١)

হে আহলি কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করো না। আর আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃত হক্ ছাড়া কোনো কথা বলো না।

এই 'আহলি কিতাব' সম্পর্ক বলা হয়েছে ঃ

وَرَهْبَانِيَّةَ نِا بْتَدَ عُوْهَا مَاكَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا - (الحديد ٢٧)

এবং বৈরাগ্যবাদ তারা নিজেরা রচনা করে নিয়েছে, আমরা তাদের জন্য এ নীতি লিখে দেইনি। আমরা তো তাদের জন্য লিখে দিয়েছিলাম আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্যে চেষ্টা করাকে কিন্তু তারা এ নিষেধের মর্যাদা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করেনি।

এ আয়াতদ্বয়ের দৃষ্টিতে দ্বীনকে যথাযথভাবে গ্রহণ করাই মুমিনের কর্তব্য। তাতে নিজ থেকে কিছু বাড়িয়ে দেয়া বা কিছু জিনিস বাদ-সাদ দিয়ে কমানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কাজ। এমন কি আল্লাহ্র দিনে সে সব জিনিস বা যে কাজের যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সে জিনিস ও কাজকে ঠিক ততটুকু গুরুত্ব না দেয়া, কম গুরুত্বকে বেশি গুরুত্ব দেয়া আর বেশি গুরুত্বকে কম গুরুত্ব দেয়া এ সবই নিতান্ত বাড়াবাড়ি। এমন কোনো জিনিসকে দ্বীনের জিনিস বলে চালিয়ে দেয়া, যা আদৌ দ্বীনের জিনিস নয়— সুস্পষ্টভাবে দুষণীয় কাজ, অপরাধজনক কাজ।

অতএব কেউ যদি এমন কাজ করে শরীয়তের বা শরীয়তসম্মত কাজ মনে করে, যা আদপেই শরীয়তের কাজ নয়, সে তো দ্বীনের ভিতরে নতুন জিনিসের আমদানী করলো এবং এটাই হচ্ছে বিদয়াত। সে নিজের মুখে সম্পূর্ণ না-হকভাবে আল্লাহ্ সম্পর্কে কথা বলছে। আল্লাহ যা বলেননি, তাকেই আল্লাহ্র নামে চালিয়ে দিচ্ছে।

হযরত আনাস ইবনে মালিকের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ

আমি ইহ্রাম বাঁধব কোন জায়গা থেকে ? তিনি বললেন ঃ যেখান থেকে নবী করীম (স) বেঁধেছিলেন, সেখান থেকেই বাঁধবে।' লোকটি বললো "আমি যদি সে জায়গার এ দিকে বসে ইহ্রাম বাঁধি তা হলে কি দোষ হবে ?" হযরত আনাস (রা) বললেন ঃ না, তা করবে না। আমি ভয় করছি তুমি ফিতনায়

নিমজ্জিত হয়ে যেতে পার। সেলোক বললো "ভালো কাজে কিছুটা বাড়াবাড়ি করাটাও কি ফিতনা হয়ে যাবে।" তখন হযরত আনাস (রা) এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - (النور ٦٣)

যারা রাসূলের আদেশ ও নিয়ম-বিধানের বিরুদ্ধতা করে, তাদের ভয় করা উচিত, ফিতনা তাদের গ্রাস করতে পারে কিংবা পৌঁছাতে পারে কোনো প্রাণান্তকর আযাব।

বললেন ঃ "তুমি এমন একটা কাজকে 'নেক কাজ' বলে মনে করছো যাকে রাসূলে করীম (স) নেক কাজ বলে নির্দিষ্ট করে দেননি, —এর চেয়ে বড় ফিতনা কি হতে পারে।"

এ কথোপকথন থেকে বিদয়াত সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল এবং জানা গেল যে, 'নেক কাজ' 'সওয়াবের কাজ' মনে করেও এমন কোনো অতিরিক্ত কাজ করা যেতে পারে না, যে কাজের কোনো বিধান মূল শরীয়তে নেই।

বিদয়াত কিভাবে চালু হয় ?

'বিদয়াত' উদ্ভূত ও চালু হওয়ার মূলে চারটি কার্যকারণ লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো এই যে, বিদয়াতী— তা নিজের থেকে উদ্ভাবিত করে সমাজে চালিয়ে দেয়। পরে তা সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় হলো, কোনো আলিম ব্যক্তি হয়ত শরীয়তের বিরোধী একটা কাজ করেছেন, করেছেন তা শরীয়তের বিরোধী জানা সত্ত্বেও; কিন্তু তা দেখে জাহিল লোকেরা মনে করতে শুরু করে যে, এ কাজ শরীয়তসম্মত না হয়ে যায় না। এভাবে এক ব্যক্তির কারণে গোটা সমাজেই বিদয়াতের প্রচলন হয়ে পড়ে। তৃতীয় এই যে, জাহিল লোকেরা শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করতে শুরু করে। তখন সমাজের আলিমগণ সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে থাকেন, তার প্রতিবাদও করেন না, সে কাজ করতে নিষেধও করেন না— বলেন না যে, এ কাজ শরীয়তের বিরোধী, তোমরা এ কাজ কিছুতেই করতে পারবে না। এরূপ অবস্থায় আলিমদের দায়িত্ব, সুযোগ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদয়াত বা শরীয়ত বিরোধী কাজের প্রতিবাদ কিংবা বিরুদ্ধতা না করার ফলে সাধারণ লোকদের মনে ধারণা জন্মে যে, এ কাজ নিশ্চিয়ই নাজায়েয হবে না, বিদয়াত হবে না। হলে কি আর আলিম সাহেবরা তার প্রতিবাদ করতেন না। অথবা অমুক সভায় এ কাজটি হয়েছে, এ কথাটি বলা হয়েছে, সেখানে অমুক অমুক বড় আলিম উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা যখন এর প্রতিবাদ করেন নি তখন বুঝতেই হবে যে, এ কাজ বা কথা শরীয়তসম্মত হবেই, নাহলে তো তাঁরা প্রতিবাদ করতেনই। এভাবে সমাজে সম্পূর্ণ বিদয়াত বা নাজায়েয কাজ 'শরীয়তসম্মত' কাজরূপে পরিচিত ও প্রচলিত হয়ে পড়ে। আর চতুর্থ এই যে, কোনো কাজ হয়ত মূলতই ভালো, শরীয়তসম্মত কিংবা সুন্নাত অনুরূপ। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত তা সমাজের লোকদের সামনে বলা হয়নি, প্রচার করা হয়নি। তখন সে সম্পর্কে সাধারণের ধারণা হয় যে, এ কাজ নিশ্চয়ই ভালো নয়, ভালো হলে আলিম সাহেবরা কি এতদিন তা বলতেন না! এভাবে একটি শরীয়তসম্মত কাজকে শেষ পর্যন্ত শরীয়ত বিরোধী বলে লোকেরা মনে করতে থাকে আর এ-ও একটি বড় বিদয়াত।

বিদয়াত প্রচলিত হওয়ার আর একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। আর তা হলো এই যে, মানুষ স্বভাবতই চিরন্তন শান্তি ও সুখ— বেহেশত লাভ করার

আকাঙ্ক্ষী। আর এ কারণে সে বেশি বেশি নেক কাজ করতে চেষ্টিত হয়ে থাকে। দ্বীনের হুকুম-আহকাম যথাযথ পালন করা কঠিন বোধ হলেও সহজসাধ্য সওয়াবের কাজ করার জন্যে লালায়িত হয় খুব বেশি। আর তখনী সে শয়তানের ষড়যন্ত্রে পড়ে যায়। এই লোভ ও শয়ীতানী ষড়যন্ত্রের কারণে খুব তাড়াহুড়া করে কতক সহজ সওয়াবের কাজ করার সিদ্ধান্ত করে ফেলে। নিজ থেকেই মনে করে নেয় যে, এগুলো সব নেক কাজ, সওয়াবের কাজ। তা করলে এত বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে যে, বেহেশতের চিরস্থায়ী শান্তি-সুখ লাভ করা কিছুমাত্র কঠিন হবে না। কিন্তু এ সময়ে যে কাজগুলোকে সওয়াবের কাজ বলে মনে করে নেয়া হয়, সেগুলো শরীয়তের ভিত্তিতেও বাস্তবিকই সওয়াবের কাজ কি না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবার মতো ইসলামী যোগ্যতা যেমন থাকে না, তেমনি সে দিকে বিশেষ উৎসাহও দেখানো হয় না। কেননা তাতে করে চিরন্তন সুখ লাভের সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর তাতেই তাদের ভয়।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, একটি দ্বীনী সমাজে দ্বীনের নামে বিদয়াত চালু হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং তা মানব ইতিহাসে অভিনব কিছু নয়। দ্বীন যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন তার ভিত্তি রচিত হয় ইল্‌মের ওপর। উত্তরকালে সেই ইল্‌ম যখন সমাজের অধিকাংশ বা প্রভাবশালী লোকেরা হারিয়ে ফেলে তখন দ্বীনের প্রতি জনমনে যে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ থাকে, তার মাধ্যমে দ্বীনের নামে অদ্বীন বা বেদ্বীন ঢুকে পড়ে। মানুষ অবলীলাক্রমে সেই কাজগুলো দ্বীনি মনে করেই করতে থাকে। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আরবরা ইবরাহীম-ইসমাইল (আ)-এর বংশধর ছিল। তাদের মধ্যে তওহীদ বিশ্বাস ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত তথায় তওহীদী দ্বীন প্রবল হয়েছিল কিন্তু তার পরে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের আকীদা ও আমলে 'হক'-এর সাথে 'বাতিল' সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে। ভালো কাজ হিসেবে এক সময় মূর্তিপূজা, পাহাড়-পাথর পূজাও ব্যাপকভাবে চালু হয়ে পড়ে। রাসূলে করীম (স)-এর আগমনকালে তাদের দ্বীনী ও নৈতিক অবস্থা চরমভাবে অধঃপতিত হয়েছিল।

আকায়েদ ও ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে বিদয়াত

আকায়েদ ও ফিকাহ্‌র কিতাবাদিতেও 'বিদয়াত' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কেননা বিদয়াত ইসলামে এক বড় গর্হিত কাজ এবং সর্ব পর্যায়ে তা বর্জন করে চলাই মুমিনের দায়িত্ব। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এ মহা অন্যায় থেকে বাঁচবার জন্যই এসব কিতাবে বিদয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি কিতাবের ভাষ্য উল্লেখ করছি।

'কাশফ্ বজদূভী' (كشف بزدوى) কিতাবে বলা হয়েছে ঃ "বিদয়াত হচ্ছে দ্বীন-এ নতুন উদ্ভাবিত জিনিস, যা সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীন আমলে আসে নি"।

'শরহে মাক্কাসিদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ঘৃণিত বিদয়াত বলতে বোঝায় এমন জিনিস, যা দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন করা হয়েছে, অথচ তা সাহাবা ও তাবেয়ীনের জামানায় ছিল না। আর না শরীয়তের কোনো দলীল-ই তার সমর্থনে রয়েছে।

আল্লামা শিহাবউদ্দীন আফেন্দী লিখিত 'মাজালিসুল আবরার' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ জেনে রাখো, বিদয়াত শব্দের দুটো অর্থ। একটি আভিধানিক আর তা হচ্ছে, যে কোনো নতুন জিনিস, তা ইবাদতের জিনিস হোক, কি অভ্যাসগত কোনো ব্যাপার। দ্বিতীয় হচ্ছে, শরীয়তী পারিভাষিক অর্থ। এ দৃষ্টিতে বিদয়াত হচ্ছে সাহাবাদের পরে দ্বীন-ইসলামের কোনো জিনিস বাড়িয়ে দেয়া কিংবা হ্রাস করা যে সম্পর্কে নবী করীম (স)-এর তরফ থেকে কথা কিংবা কাজের দিক দিয়ে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো অনুমতিই পাওয়া যায় না।

বিদয়াত সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য

একটি দীর্ঘ হাদীসের শেষাংশে 'সুন্নাত' পালনের তাগিদ করার পর বিদয়াত সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

وَ اِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ -

তোমরা নিজেদেরকে দ্বীনে নিত্য নব-উদ্ভুত বিষয়াদি থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কেননা দ্বীনে প্রত্যেক নব-উদ্ভাবিত জিনিসই বিদয়াত এবং সব বিদয়াতই চরম গোমরাহীর মূল। (আহমদ)

এ হাদীসের শব্দ 'মুহদাসাতুল উমুর'-এর ব্যাখ্যায় আল্লামা আহমাদুল বান্না লিখেছেন ঃ

وَهِيَ مَالَمْ يَكُنْ مَعْرُوْفًا فِيْ كِتَابٍ وَّ لَا سُنَّةٍ وَّ لَا اِجْمَاعٍ وَهِيَ الْبِدْعَةُ -

(الفتح الربانى)

মুহদাসাতুল উমুর বোঝায় এমন জিনিস ও বিষয়াদি যা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা— কোনো দিক দিয়েই শরীয়তের বিধিবদ্ধ নয়। আর এ-ই হচ্ছে বিদয়াত।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসটি মুসলিম শরীফ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে এ ভাষায় ঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ -

যে লোক এমন আমলো করলো, যার অনুকূলে ও সমর্থনে আমার উপস্থাপিত শরীয়ত নয় (অর্থাৎ যা শরীয়ত মুতাবিক নয়) সে আমল অবশ্য প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

ইমাম শাতেবী এ হাদীসটি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

وَهٰذَا الْحَدِيْثُ عَدَّهُ الْعَلَمَاءُ ثُلُثَ الْاِسْلَامِ لِاَنَّهُ جَمَعَ وَجُوْهَ الْمُخَالِفَةِ لِاَمْرِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يَسْتَوِيْ فِيْ ذٰلِكَ مَا كَانَ بِدْعَةً وَّ مَعْصِيَةً -

(الاعتصام ج-١ ، ص -٤٥)

বিশেষজ্ঞদের মতে এ হাদীসটি ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ মর্যাদার অধিকারী। কেননা এ হাদীসে নবী করীম (স)-এর উপস্থাপিত বিধানের বিরুদ্ধতার সব কয়টি দিকই একত্রিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, আর এর মুকাবিলায় সমান হয়ে দাঁড়ায় সেই জিনিস, যা বিদয়াত বা নাফরমানীর বিষয়।

ইমাম ইবনে রজব এ হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ سُنَنِى وَهُوَا اَصْلٌ عَظِيْمٌ مِنْ اُصُوْلِ الدِّيْنِ – (جامع العلوم)

হযরত উমর ফারূক ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-ও বলেছে ঃ

اِنَّكُمْ سَتَحْدِثُوْنَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ فَكُلُّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ وَّ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ – (الاعتصام)

তোমরা, হে মুসলিম জনতা! অনেক কিছুই নতুন উদ্ভাবন করবে। আর তোমাদের জন্যেও উদ্ভাবিত করা হবে দ্বীন ইসলামের অনেক নতুন জিনিস। জেনে রাখো, সব নবোদ্ভাবিত জিনিসই সুস্পষ্ট গোমরাহী। আর সব গোমরাহীরই চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নাম।

নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اِتَّبِعُوْا وَ لَا تَبْتَدِعُوْا (تفسير كبير الرازى ج-١، ص -١٥٠)

তোমরা শুধু রাসূলের দেয়া আদর্শকে অনুসরণ করে চলো এবং কোনোক্রমেই বিদয়াত করো না।

এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ

فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ – (مسلم)

জেনে রাখো, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব। আর সর্বোত্তম কর্মবিধান হচ্ছে মুহাম্মদ (স)-এর উপস্থাপিত জীবন-পন্থা। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম জিনিস হচ্ছে নবোদ্ভাবিত মতাদর্শ আর প্রত্যেক নবোদ্ভাবিত মতাদর্শ-ই সুস্পষ্ট গোমরাহী।

এই হাদীসের مُحْدَثَاتُهَا শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী লিখেছেন ঃ

يَعْنِى اَلْبِدْعَ الْاِعْتِقَادِيَّةَ وَالْقَوْلِيَّةَ وَالْفِعْلِيَّةَ - (مرقاة ج-١ ، ص -٢١٦)

'মুহ্‌দাসাত' বলতে বোঝায় সে সব বিদয়াত যা আকীদা, কথাবার্তা এবং আমলের ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবিত হয়।

ইমাম মালিক (রহ) বলেছেন ঃ

سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وُلَاةُ الْاَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا اَلْاَخْذُ بِهَا تَصْدِيْقٌ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَسْتِكْمَالٌ لِطَاعَةِ اللّٰهِ وَ قُوَّةٌ عَلٰى دِيْنِ اللّٰهِ لَيْسَ لِاَحَدٍ تَغْيِيْرُهَا وَلَا تَبْدِيْلُهَا وَلَا النَّظْرُ فِىْ شَىْءٍ خَالَفَهَا مَنْ عَمِلَ بِهَا مُهْتَدٍ وَمَنِ انْتَصَرَبِهَا مَنْصُوْرٌ وَمَنْ خَالَفَهَا اِتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَوَلَّاهُ اللّٰهُ مَا تَوَلّٰى وَاَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا - (الاعتصام ج ١، ص ٦٢)

রাসূলে করীম (স) এবং তাঁর পরে মুসলমানদের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সুন্নাতকে নির্ধারিত করে গেছেন। এখন তাকে আঁকড়ে ধরলে ও অনুসরণ করে চললেই আল্লাহ্‌রই কিতাবের সত্যতা বিধান করা হবে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে চলার দায়িত্ব পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। এ সুন্নাতই হলো আল্লাহ্‌র দ্বীনের স্বপক্ষে এক অতি বড় শক্তি বিশেষ। এ সুন্নাতকে পরিবর্তন করা বা বদলে দিয়ে তার স্থানে অন্য কিছু চালু করার অধিকার কারো নেই এবং তার বিপরীত কোনো জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেয়াও যেতে পারে না। বরং যে লোক এ সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে, সেই হবে হেদায়েতপ্রাপ্ত। যে এর সাহায্যে শক্তি অর্জন করতে চাইবে সেই হবে সাহায্যপ্রাপ্ত কিন্তু যে লোক এর বিরুদ্ধতা করবে, সে মুসলমানদের অনুসৃত আদর্শ পথকেই হারিয়ে ফেলবে। এসব লোক নিজেরা যে দিকে ফিরবে আল্লাহও তাদের সে দিকেই ফিরিয়ে দেবেন। আর তাদের জাহান্নামে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু জাহান্নাম বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা।

নবী করীম (স)-এর অনুসৃত কর্মনীতিই সুন্নাত। তা-ও সুন্নাত, যা তাঁর পরবর্তীকালের ইসলামী সমাজের পরিচালনকগণ খুলাফায়ে রাশেদীন প্রবর্তন

করেছেন। তাঁরা তো তা-ই প্রবর্তন করেছেন, যা রাসূলে করীম (স) করতে বলেছেন— পথ দেখিয়েছেন। রাসূলের দেখানো আদর্শের তাঁরা বিরুদ্ধতা করেননি, তাঁরা কোনো নতুন জিনিসেরও উদ্ভাবন করেননি দ্বীন-ইসলামে। এরাই হচ্ছেন খুলাফায়ে রাশেদীন। এ পর্যায়ে ইমাম শাতেবী লিখেছেন ঃ

وَمِنْهَا مَا سَنَّهَا وُلَاةُ الْاَمْرِ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ سُنَّةٌ لَابِدْعَةَ فِيْهِ اَلْبَتَّةَ وَلَمْ يُعْلَمْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلَاسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصٌّ عَلَيْهِ عَلَى الْخُصُوْصِ قَدْ جَاءَ مَا يُوْجَدُ عَلَيْهِ فِى الْجُمْلَةِ - (الاعتصام : ج-١)

রাসূলে করীম (স)-এর পরে মুসলিম সমাজের দায়িত্বশীল লোকেরা (খুলাফায়ে রাশেদীন) যে সুন্নাত— বাস্তব কর্মপন্থা নিধারণ করেছেন, তা-ও অবশ্যই অনুসরণীয় সুন্নাতরূপে গ্রহণীয়। তা বিদয়াত হতে পারে না, নেই তাতে কোনো বিদয়াত, যদিও কুরআন ও হাদীস থেকে তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। কেননা নবী করীম (স) বিশেষভাবে এ সুন্নাতেরও উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কুরআন ও সুন্নাতের যথার্থ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। খোদ নবী করীম (স)-ই তার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বিশ্বাস করতেন যে, শির্ক তওহীদের পরিপন্থী (Negation) আর বিদয়াত সুন্নাতের বিপরীত। শির্ক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু— কালেমার এই প্রথম অংশের অস্বীকৃতি। আর বিদয়াত হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কালেমার এই শেষাংশের বিপরীত এবং অন্তর থেকে তার অস্বীকৃতি। মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ) এই তত্ত্বের খুবই সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কথা হলো শির্ক ও বিদয়াত সুন্নাতের নির্মূলকারী। এ কারণে উভয়েরেই পরিণতি জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

এ কথা মুজাদ্দিদ সাহেব নিজ থেকে বলেননি। মুসনাদে আহ্মাদ-এ গজীব ইবনুল হারিস শিমালীর বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلَّا رَفَعَ مِثْلَهَا مِنَ السُّنَّةِ فَالتَّمَسُّكُ بِالسُّنَّةِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ - (كتاب الايمان)

জনগণ যে বিদয়াতের উদ্ভাবন করে, তারই মতো একটা সুন্নাত সেখান

থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতএব বিদয়াত উদ্ভাবন না করে সুন্নাত আঁকড়ে ধরাই উত্তম।

মুসনাদে দারেমী হাদীস গ্রন্থে হযরত হিসনের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِىْ دِيْنِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

জনগণ তাদের দ্বীনের মধ্যে যে বিদয়াতই চালু করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট থেকে অনুরূপ একটি সুন্নাত তুলে নিয়ে যান। পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর তা ফিরিয়ে আনেন না।

যে কাজটি সম্পর্কে আমাদের মনে ধারণা জন্মিবে যে, তা করলে আল্লাহ তা'আলা খুশী হবেন, আল্লাহ কিংবা রাসূলের নিকট প্রিয় বান্দা বলে গণ্য হবো অথবা আমাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে কিংবা এই কাজটির দ্বারা আমাদের সন্তান-সন্ততির রিযিকের পরিমাণ অতিপ্রাকৃতিক উপায়ে বৃদ্ধি পেয়ে যাবে, অথবা তাতে বরকত হবে বা সে কাজের বরকতে আমাদের বিপদ-আপদ অতিপ্রাকৃতিকভাবে দূর হয়ে যাবে। এই ধরনের সব কথাই 'দ্বীনী' বলে পরিচিত; কিন্তু এর সমর্থনে যদি শরীয়তের প্রমাণ না থাকে বা বড় বড় সাহাবীগণ নিজেদের জীবদ্দশায় তা না করে থাকেন, তাহলে তা বিদয়াত হবে। অনুরূপভাবে কোনো জায়েয কাজ শরীয়তের দিক থেকে একাধিক পন্থায় পালন করার অনুমতি থাকে; কিন্তু তন্মধ্যে একটিমাত্র পন্থাকে সে জন্যে আমরা যদি সুনির্দিষ্ট করে নেই এবং বিশ্বাস করি যে, কেবল সেই পন্থায় তা করলে সওয়াব হবে, তাহলে তা-ও বিদয়াত হবে।

(حاشیہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رض اورانکی فقہ ص - ۱۳۵)

কিয়াস ও ইজতিহাদ কি বিদয়াত ?

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন এবং হাদীস। এ দুটোকে ভিত্তি করেই ইসলামী জিন্দেগীর নিত্য নতুন প্রয়োজনীয় বিষয়ে শরীয়তের রায় জানতে হবে, দিতে হবে নিত্য নতুন উদ্ভুত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। তাই ইসলামী শরীয়তে কিয়াস ও ইজতিহাদ শরীয়তের অন্যতম উৎসরূপে পরিগণিত, এ দুয়ের সাহায্যেই ইসলাম সকল কালের, সকল মানুষের জন্যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হওয়ার সামর্থ্য ও যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়ে থাকে, দিতে পারে মুসলিম জীবনের সকল পর্যায়ে ও সব রকমের অবস্থায় নির্ভুল পথ-নির্দেশ। তাই এ দুটো বিদয়াত নয়। বিদয়াত নয় এ জন্যে যে, এ দুটো ইসলামী ব্যবস্থায় কিছুমাত্র নতুন জিনিস নয়। স্বয়ং রাসূলে করীম (স) এবং খুলাফায়ে রাশেদূন কর্তৃক এ দুটো পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে ইসলামী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

আল্লামা আলুসী লিখেছেন ঃ কিয়াস ও ইজতিহাদ দ্বীন পূর্ণ হওয়ার কিছুমাত্র বিপরীত নয়। কেননা দ্বীন পূর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে ঃ দ্বীন নিজস্ব দিক দিয়ে এবং তার আনুসঙ্গিক জরুরী বিষয়ে পূর্ণ পরিণত ও চূড়ান্ত। এখন তা থেকেই প্রয়োজনীয় আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি বের করা হবে। আকায়েদের মূলনীতি নির্ধারণ করা হবে, শরীয়তের মূলনীতি ও ইজতিহাদের কায়দা কানুন উদ্ভাবিত হবে। তার কোনোটাই কুরআন তথা দ্বীনের পূর্ণ হওয়ার বিপরীত হবে না।

(تفسیر روح المعانی : ج ١٦، ص- ٦٠)

মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমাদ সরহিন্দী বলেছেন ঃ

وَ اَمَّا الْقِيَاسُ وَ الْاِجْتِهَادُ فَلَيْسَ مِنَ الْبِدْعَةِ فِىْ شَىْءٍ فَاِنَّهٗ مُظْهِرٌ لِمَعْنَى النُّصُوْصِ لَا مُثْبِتَ لِاَمْرٍ زَائِدٍ - (مکتوبات امام ربانی دفتردوم)

কিয়াস ও ইজতিহাদকে কোনো দিক দিয়েই বিদয়াত মনে করা যেতে পারে না। কেননা এ দুটো মূল কুরআন হাদীসের দলীলই প্রকাশিত করে, কোনো নতুন অতিরিক্ত জিনিস দ্বীনের ভিতরে প্রমাণ করে না।

বস্তুত কিয়াস ও ইজতিহাদ রূপায়িত হয় ইজমার মাধ্যমে। ইজমাও দ্বীন-ইসলামের নবোদ্ভাবিত কোনো জিনিস নয় এবং তদ্দারা কোনো নতুন ইসলামের মূল বিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন কোনো মতও প্রমাণিত হয় না। তাই ইজমাও বিদয়াত নয়— ইজমা দ্বারা প্রমাণিত কোনো ফয়সালাও ইসলামে বিদয়াত বলে গণ্য হতে পারে না। ইজমার ভিত্তি স্পষ্টভাবে হাদীসেই স্বীকৃত। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا رَءَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ وَمَا رَءَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ قَبِيْحًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ قَبِيْحٌ - (مسلم احمد الفرالطبر انى الرازى فى تفسيره)

মুসলিম সমাজ সামগ্রিকভাবে শরীয়তের দৃষ্টিতে যে সিদ্ধান্ত করবে তা আল্লাহ্র নিকটও ভালো ও উত্তমরূপে গৃহীত হবে এবং সে মুসলিমরাই যাকে খারাপ ও জঘন্য মনে করবে, তাই খারাপ ও জঘন্য বলে গণ্য হবে আল্লাহ্র নিকট।[১]

এ হাদীসে মুসলিম সমাজের জন্যে শরীয়ত স্বীকৃত ইসলামের অন্যতম দলীল হিসেবেই ইজমার স্বীকৃতি ঘোষিত হয়েছে। ইজমা দ্বারাও যে শরীয়তের বিধান নির্ণীত হতে পারে, তাও এ হাদীস থেকেই প্রমাণিত।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন যে, "নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায়ই সাহাবায়ে কিরাম ইজতিহাদ করেছেন এমন অনেক ঘটনারই উল্লেখ করা যায়।" বিশেষত যখন কোনো বিষেয়ে কুরআন ও সুন্নাতে শরীয়তের এই মূল দলীল পাওয়া না যাবে তখন তো ইজতিহাদ করা ছাড়া কোনো উপায়ই নেই শরীয়ত পালনে। হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা) নবী করীম (স)-এর সামনেই ইজতিহাদ করেছেন এবং নবী করীম (স) তাদের ইজতিহাদকে সমর্থন করেছেন ও বহাল রেখেছেন। (زادالمعاد ج-٢، ص-١٢٤)

---

১. ইবনে নযীম এ হাদীসটিকে ইবনে মাসউদের কথা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তবুও ইজমার সমর্থনে এ একটি দলীলরূপে গণ্য। কেননা সাহাবীর কথাও শরীয়তের দলীল।

আহলে সুন্নাত ও আহলে বিদয়াত

সুন্নাত ও বিদয়াত সম্পর্কিত এ আলোচনার পর বিবেচ্য বিষয় হলো, কে আহলে সুন্নাত আর কে আহলে বিদয়াত ?

আহলে সুন্নাত কে— মানে, সুন্নাতের অনুসারী কারা ? কারা সুন্নাতকে অবলম্বন করে চলছে এবং জীবনধারাকে সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখছে। আর আহলে বিদয়াত কে— মানে, সুন্নাতের অনুসারী কারা নয়, কারা বিদয়াত পন্থী ? বিদয়াতী ?

এ প্রশ্নেরও আলোচনা আবশ্যক। কেননা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বেশ কিছু লোক চরম বিদয়াতী কাজ করে ও জীবনের বিভিন্ন দিকে সুন্নাতের বরখেলাফ কাজ করেও একমাত্র নিজেদেরকেই 'আহলে সুন্নাত' বলে দাবি করছে। আর তাদের বিদয়াতসমূহকে যারা সমর্থন করে না, যারা শক্তভাবে সুন্নাতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে চাচ্ছে, সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে জীবনে ও সমাজে তাদেরকে তারা বিদয়াতী (বা ইফরাতপন্থী) বলে ফতোয়া দিচ্ছে। কাজেই দলীল ভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণের মধ্যেমে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠা দরকার যে, সত্যিকারভাবে কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে কে আহলে সুন্নাত আর কে আহলে বিদয়াত এবং সেই সঙ্গে ইসলামে আহলে সুন্নাতেরই বা স্থান কোথায় এবং কোথায় স্থান আহলে বিদয়াতের ?

আহলে সুন্নাত কারা, এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা আবদুর রহমান ইবনুল জাওজীর কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে। তিনি বলেছেন ঃ

وَلَا رَيْبَ فِيْ اَنَّ اَهْلَ النَّقْلِ وَالْاَثَرِ الْمُتَّبِعِيْنَ بِاٰثَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاٰثَارِ اَصْحَابِهِ هُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ لِاَنَّهُمْ عَلٰى تِلْكَ الطَّرِيْقِ الَّتِىْ لَمْ يَحْدُثْ فِيْهَا حَادِثٌ وَاِنَّمَا وَقَعَتِ الْحَوَادِثُ وَالْبِدَعُ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهٖ ـ

(تلبيس ابليس)

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাদীস ও আস্‌র-এর অধিকারী এবং নবী করীম (স) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের আদর্শে অনুসারীরাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাত। কেননা তাঁরাই সুন্নাতের আদর্শকে বাস্তবভাবে অনুসরণ করে চলেছে, যে সুন্নাতে কোনোরূপ নতুন জিনিস উদ্ভাবিত হয়নি। এ জন্যে যে, নতুন জিনিস উদ্ভাবিত হয়েছে— বিদয়াত সৃষ্টি হয়েছে তো রাসূলে করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগে।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

فَقَدْ بَانَ بِمَا ذَكَرْنَا اَنَّ اَهْلَ السُّنَّةِ هُمُ الْمُتَّبِعُوْنَ وَ اَنَّ اَهْلَ الْبِدْعَةِ هُمُ الْمُظْهِرُوْنَ شَيْئًا لَّمْ يَكُنْ قَبْلُ وَ لَا مُسْتَنَدَ لَهٗ - (تلبيس ابليس)

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আহলে সুন্নাত হলো সুন্নাতের অনুসারী লোকেরা। আর আহলে বিদয়াত হলো তারা, যারা এমন কিছু জিনিস বের করেছে, যা পূর্বে ছিল না এবং তার কোনো সনদও নেই।

অর্থাৎ সুন্নাত যারা কার্যত পালন করে, তাতে কোনোরূপ হ্রাস করে না, বৃদ্ধিও করে না, যেমন রাসূল ও সাহাবায়ে কিরাম করেছেন, বলেছেন ও চলেছেন হুবহু তেমনি-ই পালন করে, তারাই তো অভিহিত হতে পারে আহলে সুন্নাত বলে। আর যারা তাতে কোনোরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করে, মনগড়া অনেক কিছু ধর্মের মধ্যে শামিল করে নেয়, ধর্মীয় কাজ বলে চালিয়ে দেয়, তারা 'আহলে সুন্নাত' হতে পারে না, তারা তো সম্পূর্ণরূপে 'আহলে বিদয়াত'— বিদয়াতপন্থী।

বস্তুত সাহাবায়ে কিরামের যুগে কোনো বিদয়াত ছিল না। তাঁরা তো খালেস সুন্নাতের ওপর আমল করেছেন; আমল করেছেন ব্যক্তি জীবনে, অনুসরণ করে চলেছেন সমষ্ঠিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে। শুধু তা-ই নয়, কোথাও কোনো বিদয়াত দেখা দিলে তাঁরা পূর্ণ শক্তিতে সে বিদয়াতের প্রতিরোধ করেছেন। তাঁরা নবী করীম (স)-এর ঘোষণার ওপর খাঁটি বলে উত্তীর্ণ হয়েছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَصْحَابِىْ اَمَنَةٌ لِاُمَّتِىْ فَاِذَا ذَهَبَ اَصْحَابِىْ اَتَى اُمَّتِىْ مَا يُوْعَدُوْنَ - (مسلم)

আমার সাহাবীগণ আমার উম্মতের আমানতদার। আর আমার সাহাবীরা যখন চলে যাবে, তখন আমার উম্মতের ওপর সেই অবস্থা ফিরে আসবে, যার ওয়াদা তাদের জন্যে করা হয়েছে।

সুন্নাত প্রতিষ্ঠা ও বিদয়াত প্রতিরোধের দায়িত্ব

এ ছিল রাসূলে করীম (স)-এর আগাম সাবধান বাণী। তাঁর উম্মতের ওপর যেসব আদর্শিক বিপদ ও সংঘাত আসতে পারে বলে রাসূলে করীম (স) মনে করেছেন, সেগুলোর উল্লেখ করে তিনি আগেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যেন উম্মতের জনগণ সে বিষয়ে হুঁশিয়ার হয়ে থাকে এবং নিজেদের ঈমান-আকীদায় এবং আমলে ও আখলাকে সে ধরনের কোনো জিনিস-ই প্রবেশ করতে না পারে। এ পর্যায়ের আর একটি হাদীস হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ - (مسلم)

আমার পূর্বে প্রেরিত প্রত্যেক নবীর-ই তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে হাওয়ারীগণ হয়েছে এবং এমন সব সঙ্গী-সাথীও হয়েছে, যারা সে নবীর সুন্নাত গ্রহণ ও ধারণ করেছেন। আর তাঁর আদেশ-ও নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। পরে সে উম্মতের উত্তরাধিকারী হয়েছে এমন সব লোক, যারা বলতো এমন সব কথা, যা তারা করতো না এবং করতো এমন সব কাজ, যা করতে তাদের আদৌ আদেশ করা হয়নি। এরূপ অবস্থায় এ লোকদের বিরুদ্ধে যারা জিহাদ করবে নিজেদের শক্তি দ্বারা, তারা মুমিন আর যারা জিহাদ করবে মুখের ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা তারাও মুমিন; আর যারা জিহাদ করবে দিল দ্বারা, তারাও মুমিন; কিন্তু অতঃপর একবিন্দু ঈমানের অস্তিত্ব আছে বলে মনে করা যেতে পারে না।

এ দীর্ঘ হাদীসে পরবর্তীকালে যে সব উত্তরাধিকারী সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে, তারাই হচ্ছে আহলে বিদয়াত। কেননা তাদের কাজ ও কথায় মিলন নেই এবং করে এমন কাজ, যা করতে তাদের বলা হয়নি। অথচ ইসলামী শরীয়তে এমন কাজকে দ্বীনি কাজ হিসেবে করার কাউকে-ই অনুমতি দেয়া

যেতে পারে না। তাহলে রাসূলে সুন্নাতের কোনো মূল্যই থাকবে না কারো কাছে, থাকবে না কোনো গুরুত্ব। এ জন্যে এদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব বিদয়াতীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরই কর্তব্য। যে তা করবে না, এ হাদীস অনুযায়ী তার মধ্যে ঈমানের লেশ মাত্র নেই।

ইসলামের জিহাদ ঘোষণার নির্দেশ মূলত কুফর ও শিরক-এর বিরুদ্ধে। কিন্তু এখানে যে বিদয়াতের বিরুদ্ধে জিহাদ করার গুরুত্ব এত জোরাল ভাষায় বলা হলো, তার কারণ এই যে, বিদয়াত সুস্পষ্ট কুফর ও প্রকাশ্য শিরক না হলেও তা যে কুফর ও শিরক এর সূচনা, কুফর ও শিরকের উৎস-বীজ, তাতে সন্দেহ নেই। ইসলামী সমাজে একবার বিদয়াত দেখা দিলে ও ক্ষেত্র তৈরী করে নিতে পারলে অনতিবিলম্বে তা-ই যে আসল শিরক ও কুফর-এর দিকে টেনে নিয়ে যাবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এ কারণেই ইসলামী সমাজে কুফর ও শিরক-এর এ বীজকে অংকুরেই বিনষ্ট করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ জন্যেই বিদয়াত ও বিদয়াতপন্থীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার ওপর ঈমানের নির্ভরশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত দ্বীন ইসলামে যে কাজ করতে বলা হয়নি সে কাজকে দ্বীনী কাজ মনে করে করাই হচ্ছে এক প্রকারের কুফরী এবং এতেই নিহিত রয়েছে শিরক-এর ভাবধারা। এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত হাদীস কয়টিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَحْيٰ سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِى قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِى فَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَّ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلَ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا - (ترمذى، ابن ماجه)

যে লোক আমার পরে মরেযাওয়া কোনো সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করবে, তার জন্যে সেই পরিমাণ সওয়াব রয়েছে যে পরিমাণ সওয়াব সেই সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে পাওয়া যাবে; কিন্তু আমলকারীর সওয়াবে বিন্দুমাত্র কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে লোক কোনো গোমরাহীর বিদয়াতকে চালু করবে— যে বিদয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মোটেই রাজি নহেন— তার গুনাহ হবে সে পরিমাণ, যে পরিমাণ গুনাহ তদনুযায়ী আমল করলে হবে; কিন্তু আমলকারীর গুনাহ থেকে এক বিন্দু কম করা হবে না।

এখানে মরে যাওয়া সুন্নাতকে পুনরায় চালু করার সওয়াব ও গোমরাহীর বিদয়াত প্রবর্তন করার গুনাহ সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে, তা থেকে মুসলিম সমাজকে সুরক্ষিত রাখা এবং সমাজে সুন্নাতকে চালু ও প্রতিষ্ঠিত করা— তাকে মরে যেতে না দেয়া ও বিদয়াতকে কোনোক্রমেই চালু হতে না দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করাই এ হাদীসের মূল লক্ষ্য। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَ سَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَّتِيْ -

দীন ইসলাম সূচনায় যেমন অপরিচিত ও প্রভাবহীন ছিল, তেমনি অবস্থা পরেও দেখা দেবে। এই সময়কার এই অপরিচিত লোকদের জন্যে সুসংবাদ। আর এই অপরিচিত লোক হচ্ছে তারা, যারা আমার পরে আমার সুন্নাতকে বিপর্যস্ত করার যাবতীয় কাজকে নির্মূল করে সুন্নাতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টিত হবে। (তিরমিযী)

মুসলিম সমাজে সাধারণভাবে যদি সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত না থাকে, বিদয়াত যদি মুসলিম সমাজকে গ্রাস করে ফেলে তাহলে প্রকৃত দীন ইসলাম সেখানে এক অপরিচিত জিনিসে পরিণত হবে এবং প্রকৃত ইসলাম পালনকারী লোকগণ— যাও বা অবশিষ্ট থাকে— তারা সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও প্রভাবহীন হয়ে পড়ে। সমাজের ওপর মাতব্বরি ও কর্তৃত্ব হয় বিদয়াতী ও বিদয়াতপন্থী লোকদের। এরূপ অবস্থায় যারাই সুন্নাতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দীনের দৃষ্টিতে সমাজকে সুস্থ করে গড়ে তুলতে চেষ্টিত হয়, তাদের জন্যে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের তরফ থেকে সুসংবাদ শুনান হয়েছে। কেননা তারা বাস্তবিক মজবুত ঈমানের ধারক।

বস্তুত সুন্নাত যখন সমাজে ম্লান ও স্তিমিত হয়ে আসে এবং বিদয়াতের জুলমাত পুঞ্জীভূত হয়ে গ্রাস করে ফেলে সমস্ত সমাজকে, তখন ঈমানদার লোকদের একমাত্র কাজ হলো বিদয়াতকে মিটিয়ে সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সংগ্রাম করা। কিন্তু তখনও যারা বিদয়াতী ও বিদয়াত পন্থীদের প্রতি সম্মান দেখায়, তারা ইসলামের সাথে করে চরম দুশমনি। রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْإِسْلَامِ - (بیہقی)

যে লোক কোনো বিদয়াতী ও বিদয়াতপন্থীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো, সে তো ইসলামকে ধ্বংস করায় সাহায্য করলো।

কেননা বিদয়াত পন্থী ব্যক্তির ভূমিকা ইসলামের বিপরীত। সে তো ইসলামকে নির্মূল করার ব্রতেই লেগে আছে নিরন্তর। আর এরূপ অবস্থায় তার প্রতি সম্মান দেখানো বা শ্রদ্ধা প্রকাশ করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে লোক বিদয়াতীর কাজকে সমর্থন করে এবং বিদয়াতকে পছন্দ করে। এতে করে বিদয়াতী ও বিদয়াতপন্থী ব্যক্তির মনে ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে অধিক সাহস ও হিম্মত হবে, সে হবে নির্ভীক, দুঃসাহসী। আর এ জন্যেই এ কাজ ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সাহায্য করে বলে রাসূলে করীম (স) ঘোষণা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِى الْحَرَمِ وَ مُبْتَغٍ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ مُطَّلِبُ دَمِ امْرِىءٍ مُّسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِقَ دَمَهٗ -

আল্লাহর নিকট তিন শ্রেণীর লোক অত্যধিক ঘৃণ্য। তারা হলো (১) যারা হারাম শরীফে শরীয়ত বিরোধী কাজ করে, (২) ইসলামী আদর্শে যারা জাহিলিয়াতের নিয়ম-নীতি প্রথাকে চালু করতে ইচ্ছুক এবং (৩) যারা কোনো কারণ ব্যতীত-ই মুসলমানের রক্তপাত করতে উদ্ধত হয়। (বুখারী)

হাদীসে বলা হয়েছে سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ জাহিলিয়াতের সুন্নাত, নিয়ম-নীতি ও প্রথা। অর্থাৎ জাহিলিয়াতের সুন্নাত। আর তা সম্যক ভাবেই সুন্নাতে রাসূলে'র বিপরীত জিনিস। এখন যে লোক ইসলামের সুন্নাতের মাঝে জাহিলিয়াতের সুন্নাত বা নিয়ম নীতি প্রথাকে চালু করতে চায় ইসলামের অন্তর্ভুক্ত সুন্নাত হিসেবে, সে যে আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য হবে, হবে আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত তাতে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে। (মিশকাত)

এ পর্যায়ে হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেছেন ঃ

سُنَّتُكُمْ وَاللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ بَيْنَهُمَا : بَيْنَ الْغَالِىْ وَالْجَافِىْ فَاصْبِرُوْا عَلَيْهَا رَحِمَكُمُ اللّٰهُ فَاِنَّ اَهْلَ السُّنَّةِ كَانُوْا اَقَلَّ النَّاسِ فِيْمَا مَضٰى وَهُمْ اَقَلُّ النَّاسِ فِيْمَا بَقِىَ الَّذِيْنَ لَمْ يَذْهَبُوْا مَعَ اَهْلِ الْاِتْرَافِ فِىْ تَرَافِهِمْ وَلَا مَعَ اَهْلِ الْبِدَعِ فِىْ بِدَعِهِمْ وَصَبَرُوْا عَلٰى سُنَّتِهِمْ حَتّٰى لَقُوْا رَبَّهُمْ فَكَذٰلِكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَكُوْنُوْا - (دارمى)

যে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইলাহ নেই তাঁর নামে শপথ করে বলছি, অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও মাত্রা হ্রাস করার দুই সীমাতিরিক্ত প্রান্তিক নীতির মধ্যবর্তী নীতিই হচ্ছে তোমাদের সুন্নাতের নীতি, অতএব তোমরা তারই ওপর ধৈর্য সহকারে অবিচল হয়ে থাক, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করবেন। কেননা আহলে সুন্নাত— সুন্নাত অনুসারী লোকদের সংখ্যা চিরদিনই কম ছিল অতীতে, পরবর্তীকালেও তাই থাকবে। এরা হচ্ছে তারা যারা কখনো বাড়াবাড়িকারীদের সঙ্গে যোগদান করেনি। বিদয়াতপন্থীদেরও সঙ্গী হয়নি তারা তাদের বিদয়াতের ব্যাপারে। বরং তারা সুন্নাতের ওপর অটল হয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে, যদ্দিন না আল্লাহ্র সাক্ষাতের জন্যে তারা মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ চাইলে তোমরাও এমনিই হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ

مَا اَتٰى عَلَى النَّاسِ عَامٌ اِلَّا اَحْدَثُوْا فِيْهِ بِدْعَةً وَ اَمَاتُوْا فِيْهِ سُنَّةً حَتّٰى تَحْىَ الْبِدْعُ وَ تَمُوْتُ السُّنَنُ - (رواه الطبرانى، والكبير و رجاله موثقون مجم الزوائد)

লোকেরা যখনই কোনো বিদয়াতের উদ্ভাবন করেছে, তখনই তারা এক একটি সুন্নাতকে মেরেছে। এভাবেই বিদয়াত জাগ্রত ও প্রচণ্ড হয়ে পড়েছে, আর সুন্নাত মিটে গেছে।

এসব কয়টি হাদীসই মুসলমানদের সামনে একটা সুস্পষ্ট কর্মসূচী পেশ করছে এবং তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা যে দেশে ও যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তারা বিদয়াত ও বিদয়াতপন্থীদের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং সুন্নাতকে তার আসল রূপে ও ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং রাখতে চেষ্টিত হবে। 'সুন্নাত' যদি বিলীন হয়ে যায় আর বিদয়াত যদি প্রবল হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে মুমিন ও মুসলিমের অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

সাহাবীদের জামা'আতই আদর্শ

দুনিয়া ইসলামের এ সুন্নাতের আদর্শ লাভ করেছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকট থেকে। মুহাম্মদ (স)-ই এ সুন্নাতকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সাহাবীরাও এই সুন্নাতের ওপরই অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সাহাবীদের পরে তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের যুগেও সুন্নাতই সমাজের ওপর জয়ী ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে মুসলিম মিল্লাতের নানাবিধ দুর্বলতা দেখা দেয়, দেখা দেয় নব নব বিদয়াত। সমাজের সাধারণ অবস্থা প্রচণ্ডভাবে বদলে যায়। বিদয়াত জয়ী ও প্রকট হয়ে পড়ে এবং

সুন্নাত হয় দুর্বল ও পরাজিত বরং লোকেরা বিদয়াতকেই সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করে এবং সুন্নাতকে বিদয়াতের ন্যায় পরিহার করে। সে আজ প্রায় বার তেরশ' বছর আগের কথা। তারপর মুসলিম জীবন সুন্নাতের আদর্শ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে পড়তে থাকে এবং সুন্নাতের আদর্শের পরিবর্তে শিকড় গাড়তে থাকে বিদয়াত। আজকের মুসলমান তো এ দৃষ্টিতে বিদয়াত-অজগরের একেবারে উদর গহ্বরে আটকে গেছে। কিন্তু আজও তাদের সামনে আদর্শ এবং অনুকরণীয় ও অনুসরণযোগ্য হচ্ছে রাসূলে করীম (স) এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম। তাঁদেরই অনুসরণ করে চলা উচিত সব মুসলমানের। রাসূল ও সাহাবাদের যুগে সুন্নাত বিশ্ব মুসলিমের নিকট চিরকালের তরে আঁধার সমুদ্রের আলোকস্তম্ভ। আজো সেখান থেকেই আলো গ্রহণ করতে হবে, পেতে হবে পথ-নির্দেশ। রাসূলে করীম (স) এমনি এক ভবিষ্যদ্বাণী করে বিভ্রান্ত মুসলিমের জন্যে পথ-নির্দেশ করে গেছেন। রাসূলের একটি হাদীসের শেষাংশ হচ্ছে এই ঃ

وَ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَ تَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِىْ النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ - (ترمذى)

বনী-ইসরাইলীরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল আর আমার উম্মত তিহাত্তর ফির্কায় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি ফির্কা ছাড়া আর সব ফির্কা-ই জাহান্নামী হবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই একটি ফির্কা কারা হে রাসূল ? তিনি বললেন, "তারা হচ্ছে সেই লোক যারা অনুসরণ করবে আমার ও আমার আসহাবদের আদর্শ"।

এ হাদীসকে ভিত্তি করে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনুল জাওজী যে কথাটি বলেছেন, তার মর্ম হলো এই ঃ

فَهٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْهِ دِلَالَةٌ عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَمَاعَةِ جَمَاعَةُ الصَّحَابَةِ -

এ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, 'এক জামা'আত' বলতে সাহাবাদের জামা'আতকে বোঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ বিশেষ কোনো একজন সাহাবী নন, নবী করীম (স) এবং সামগ্রিকভাবে সাহাবীদের জামা'আত যে সুন্নাতকে পালন করে গেছেন, পরিবর্তিত অবস্থায় এবং পতন যুগেও যারা সেই সুন্নাতকে অনুসরণ করবে, তারাই জান্নাতে যাওয়ার অধিকারী হবে। তারা হবে সেই লোক যারা আকীদা,

কথা ও বাহ্যিক আমলের রীতি-নীতি সব-ই সাহাবীদের ইজমা থেকে গ্রহণ করবে। আবুল আলীয়া তাবেয়ী বলেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ الَّذِيْ كَانُوْا عَلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَّفْتَرِقُوْا -

মুসলিম সমাজ ফির্কায় ফির্কায় বিভক্ত হওয়ার পূর্বে যে অবস্থা ছিল, তোমরা সেই অবস্থাকে শক্ত করে বজায় রাখতে ও বহাল করতে চেষ্টা করবে।

এ কথাটিতেও ঠিক সাহাবীদের যুগের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা সাহাবীদের যুগই ছিল এমন যুগ— যখন মুসলিম সমাজ ছিল ঐক্যবদ্ধ, অবিভক্ত।

আসেম বলেন, আবুল আলীয়ার এ নসীহতের কথা হাসানুল বসরীকে বলায় তিনি বলেন ঃ

قَدْ نَصَحَكَ وَاللّٰهِ وَصَدَقَكَ -

আল্লাহ্‌র কসম, তোমাকে ঠিকই উপদেশ দিয়েছে এবং তোমাকে একান্তই সত্য কথা বলেছে।

ইমাম আওজায়ী বলেছেন ঃ

اِصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُّنَّةِ وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ وَقُلْ بِمَا قَالُوْا وَكُفَّ عَمَّا كُفُّوْا عَنْهُ وَاسْلُكْ سَبِيْلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ فَاِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسَّعَهُمْ -

তোমার নিজেকে তুমি সুন্নাতের ওপর অবিচল রাখো সুন্নাতের ধারক লোকেরা যেখানে দাঁড়িয়েছেন অর্থাৎ যে নীতি গ্রহণ করেছেন, তুমিও সেই নীতিই গ্রহণ করো, তাঁরা যা বলেছেন, তুমি তাই বলবে, যা থেকে তাঁরা বিরত রয়েছেন, তুমিও তা থেকে বিরত থাকবে। আর তোমার পূর্ববর্তী নেককার লোক যে পথ ধরে চলে গেছেন, তুমিও সেই পথেই চলবে। তাহলে তাঁরা যা করেছেন; তা-ই করার তওফিক তুমিও পাবে।

মনে রাখতে হবে, ইমাম আওজায়ী একজন তাবেয়ী এবং তিনি সলফে সালেহ বলতে বুঝিয়েছেন সাহাবীদের জামা'আতকে। অতএব রাসূলের পরে সুন্নাতের আদর্শ সমাজ যেমন ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম, তেমনি রাসূলের পরে সাহাবায়ে কিরামই হতে পারেন সকল কালের, সকল মুসলিমের আদর্শ ও অনুস্বরণীয়। সলফে সালেহীন বলতে দুনিয়ার মুসলমানদের নিকট তাঁরাই বরণীয়। কেননা তাঁদের আদর্শবাদিতা ও রাসূলে অনুসরণ-গুণের কথা স্বয়ং

আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিয়েছেন কুরআন-হাদীসে, সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং নবী করীম (স)। রাসূলের সত্য মাপকাটিতে পুরোপুরিভাবে তাঁরাই উত্তির্ণ হয়েছেন।

বস্তুত রাসূল (স)-এর পরে সাহাবায়ে কিরাম ছাড়া মুসলমানদের নিকট আর কোনো ব্যক্তি কোনো কালের, কোনো দেশের কোনো বুযুর্গও (?) আদর্শ অনুসরণীয়রূপে গণ্য হতে পারে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কোনো ব্যক্তিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَاِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا اَفْضَلَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَّ اَعْمَقَهَا عِلْمًا وَّ اَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَ لِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلٰى اَثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَاِنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ - (رزين مشكوة)

কারো যদি সুন্নাতকে ধারণ করতেই হয়, তাহলে তার উচিত এমন ব্যক্তির সুন্নাত ধারণ করা, যে মরে গেছে। কেননা যে লোক এখনো জীবিত, সে-যে ভবিষ্যতে ফিতনায় পড়বে না, তার কোনো নিশ্চয়তাই নেই। আর মরে যাওয়া লোক হচ্ছেন মুহাম্মদ (স)-এর সাহাবীগণ, যাঁরা ছিলেন এ উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক, যাঁদের দিল ছিল সমধিক পূন্যময়, গভীরতম জ্ঞানসম্পন্ন। কৃত্রিমতা ছিল না তাঁদের মধ্যে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের বাছাই করে নিয়েছিলেন তাঁর নবীর সাহাবী হওয়ার জন্যে এবং তাঁর দ্বীন কায়েম করার জন্যে। অতএব তোমরা তাদের সঠিক মর্যাদা অনুধাবন করো— স্বীকার করো। তাঁদের পদাংক অনুসরণ করো। আর তাঁদের চরিত্র ও স্বভাবের যতদূর সম্ভব তোমরা ধারণ ও গ্রহণ করো। কেননা তাঁরা ছিলেন সঠিক ও সুদৃঢ় হেদায়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতো একজন সাহাবীরও এ এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। এর তাৎপর্য এই যে, সাহাবায়ে কিরামই সর্বকালের লোকদের জন্যে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত নির্ভরযোগ্য আদর্শ। আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাকের দৃষ্টিতে তাঁরা সর্বোন্নত পর্যায়ে উন্নীত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অভিষিক্ত। কিন্তু এখানে বিশেষ কোনো ব্যক্তি সাহাবীর কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে সমষ্টিগতভাবে সাহাবীদের জামা'আতের কথা। এই সাহাবীদের জামা'আতই মুসলিমের নিকট অনুসরণীয়।

এ থেকে এ কথা বোঝা গেল যে, রাসূলে করীম (স) ছাড়া মানব সমাজের কোনো এক ব্যক্তিকে-ই একান্তভাবে অনুসরণীয়রূপে গ্রহণ করা কিছুতেই কল্যাণকর হতে পারে না, ইসলাম সে নির্দেশ দেয়নি কাউকেই— সে যে যুগের এবং যত বড় বুযুর্গ ও অলী-আল্লাহ্ই হোক না কেন। শুধু তাই নয়, ইসলামে সে বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধ বাণীও উচ্চারিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

لَايُقَلِّدَنَّ اَحَدُكُمْ دِيْنِهٖ رَجُلًا فَاِنْ اٰمَنَ اٰمَنَ وَ اِنْ كَفَرَ كَفَرَ وَاِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ مُقْتَدِيْنَ فَاقْتَدُوْا بِالْمَيِّتِ فَاِنَّ الْحَىَّ لَا تُؤْ مَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ -

(الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح)

কেউ যেন নিজের দ্বীনকে কোনো ব্যক্তির সাথে এমনভাবে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে না দেয় যে, সে ঈমান আনলে সে-ও ঈমান আনবে, আর সে কুফরী করলে সে-ও কুফরী করবে। যদি তোমরা কারো অনুসরণ করতে বাধ্য হও-ই, তাহলে তোমরা অনুসরণ করবে মরে যাওয়া লোকদের। কেননা জীবিত মানুষ জীবিত থাকা অবস্থায় ফিতনা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

এখানেও মরে যাওয়া লোক বলতে বোঝায় সাহাবীদের জামা'আত, কোনো বিশেষ ব্যক্তি-সাহাবী নয়। একমাত্র রাসূলে করীম (স) ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়। এ হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতো একজন জলীলুল-কদর সাহাবার কথা। তিনি যেমন ছিলেন প্রথম যুগের সাহাবী, তেমনি রাসূলের বিশেষ খাদেম। কাজেই সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্যে সঠিক নির্ভরযোগ্য কর্মনীতি এ-ই হতে পারে যে, তারা মেনে চলবে শুধু আল্লাহ্কে, আল্লাহ্র রাসূলকে— কুরআনকে এবং হাদীসকে; আর এক কথায় সুন্নাতকে। এ ছাড়া কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতকে ব্যক্তিগত চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহারকে কখনই একমাত্র আদর্শরূপে আঁকড়ে ধরবে না। কোনো জীবিত বা মৃত মানুষের বিনা শর্তে আনুগত্য স্বীকার করবে না। বিনা শর্তে আনুগত্য মানব সমাজে কেবলমাত্র রাসূলে করীম (স)-কে করা যেতে পারে, করতে হবে, অন্য কারো নয়।

এ পর্যায়ে একটি বড় বিভ্রান্তির অপনোদন করা একান্তই আবশ্যক। বিভ্রান্তটি হচ্ছে একটি প্রখ্যাত হাদীসকে কেন্দ্র করে। হাদীসটি হলো এই ঃ

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ فَبِاَيِّهِمْ اِقْتَدَ يْتُمْ اِهْتَدَ يْتُمْ -

আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রপুঞ্জের মতোই (উজ্জ্বল)। এদের মধ্যে যার-ই তোমরা অনুসরণ করবে, হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

এই হাদীসের ভিত্তিতে কেউ কেউ বলতে চান যে, নিজেদের ইচ্ছেমতো যে কোনো একজন সাহাবীর অনুসরণ করলেই হেদায়েতের পথে চলা সম্ভব হবে।

কিন্তু কয়েকটি কারণে এ হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। প্রথম কারণ এই যে, এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে। একটি সূত্র হলো ঃ আ'মাশ থেকে আবূ সুফিয়ান থেকে, জাবির (রা) থেকে। আর একটি হলো সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে, ইবনে আমর থেকে। আর তৃতীয় হলো হামযা আল-জজী থেকে, নাফে থেকে, ইবনে উমর থেকে। কিন্তু মুহাদ্দিসদের বিচারে এ সব সূত্রে কোনো হাদীস প্রমাণিত নয়। ইবনে আবদুল বার্র-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম লিখেছেন ঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ مُفَرِّجٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حَمْدُبْنُ اَيُّوْبَ اَلصَّمُوْتُ قَالَ قَالَ لَنَا الْبَزَّارُ : وَ اَمَّا مَايُرْوٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بَاَيِّهِمْ اِقْتَدَ يْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ فَهٰذَ الْكَلَامُ لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (اعلام الموقعين : ج، ص- ٢٢٣)

আমাদের নিকট সাঈদের পুত্র ইবরাহীম, তাঁর পুত্র মুহাম্মদ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মুফার-রাহ তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাদের নিকট হামদ ইবনে আইয়ুব আস-সামূত বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের নিকট বাজ্জার বলেছেন যে, "আমার সাহাবীরা নক্ষত্রপুঞ্জের মতো, তাদের মধ্যে যার-ই তোমরা অনুসরণ করবে, হেদায়েত পাবে।" এই অর্থের যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয় তা এমন একটি কথা, যা নবী করীম (স) থেকেই সহীহ বলে প্রমাণিত হয়নি।[১]

হাদীস বিচারে সনদের গুরুত্ব হলো মৌলিক। আর সনদের বিচারে যে হাদীস সহীহ্ বলে প্রমাণিত নয়, তাকে শরীয়তের দলীল হিসেবে পেশ করার কোনো অধিকার কারোই থাকতে পারে না।

---

১. কিন্তু খতীব আল-বাগদাদীর উদ্ধৃত হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর বর্ণনা থেকে এর বিপরীত কথা জানা যায়।

সুন্নাত— কঠিন ও সহজ

আমরা যারা 'আহলি সুন্নাত হওয়ার দাবি করছি এবং মনে বেশ অহমিকা বোধ করছি এই ভেবে যে, আমরা কোনো গোমরাহ ফির্কার লোক নই; বরং নবী করীম (স)-এর প্রতিষ্ঠিত ও সুন্নাত অনুসরণকারী সমাজের লোক। কিন্তু আমাদের এই ধারণা কতখানি যথার্থ, তা আমাদের অবশ্যই গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।

আমরা আহ্‌লি সুন্নাত। অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসরণকারী। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা রাসূলে করীমের কোন সুন্নাতের অনুসরণকারী? কঠিন ও কষ্টের সুন্নাতের, না সহজ, নরম ও মিষ্টি মিষ্টি সুন্নাতের।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রাসূলে করীম (স)-এর জীবনে ও চরিত্রে এই উভয় ধরনের সুন্নাতেরই সমাবেশ ঘটেছে। তিনি একজন মানুষ ছিলেন। তাই মানুষ হিসেবেই তাঁকে এমন অনেক কাজই করতে হয়েছে, যা এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য দরকার। যেমন খাওয়া, পরা, দাম্পত্য ও সাংসারিক জীবন যাপন। এ ক্ষেত্রে তিনি যে যে কাজ করেছেন শরীয়তের বিধান অনুযায়ী, তা-ও সুন্নাত বটে। তবে তা খুবই সহজ, নরম ও মিষ্টি সুন্নাত। তা করতে কষ্ট তো হয়-ই না; বরং অনেক আরাম ও সুখ পাওয়া যায়। যেমন, কদুর তরকারী খাওয়া, মিষ্টি খাওয়া, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা, মিস্‌ওয়াক করা, আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করা, বিয়ে করা, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, লম্বা জামা-পাগড়ী বাঁধা, দাঁড়ি রাখা ইত্যাদি।

কিন্তু রাসূলে করীম (স)-এর জীবন প্রকৃত ও আসল সুন্নাত সেই সব কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ, যা তাঁকে সেই মুশরিক আল্লাহ্‌দ্রোহী সমাজে তওহীদী দাওয়াত প্রচার ও দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাথে করতে হয়েছে। এই পর্যায়ে তাঁকে ক্ষুধায় কাতর হতে, পেটে পাথর বাঁধতে ও দিন-রাত অবিশ্রান্তভাবে শারীরিক খাটুনী খাটতে হয়েছে। শত্রুদের জালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে, পায়ে কাঁটা লাগাতে এবং তায়েফে গিয়ে গুণ্ডাদের নিক্ষিপ্ত পাথরে দেহ মুবারককে ক্ষত-বিক্ষত করে রক্তের ধারা প্রবাহে পরনের কাপড় সিক্ত করতে ও ক্লান্ত-শ্রান্ত অবসন্ন হয়ে রাস্তার ধারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতে হয়েছে। এক সময়

বনু হাশিম গোত্রের সাথে মক্কাবাসীদের নিঃসম্পর্ক ও বয়কট হয়ে আবু তালিব গুহায় ক্রমাগত তিনটি বছর অবস্থান করতে হয়েছে। সর্বশেষে পৈতৃক ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছে। কাফির শত্রু বাহিনীর মুকাবিলায় মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে পূর্ণ পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করতে, দন্ত মুবারক শহীদ করতে ও খন্দক খুদতে হয়েছে।

রাসূলে করীম (স)-এর এই সব কাজও সুন্নাত এবং সে সুন্নাত অনুসরণ করাও উম্মতের জন্য একান্ত কর্তব্য। তবে এ সুন্নাত অত্যন্ত কঠিন, দুঃসাধ্য ও প্রাণান্তরকর কষ্টের সুন্নাত।

সহজেই প্রশ্ন জাগে, আমরা কি এই সুন্নাত পালন করছি? যদি না করে থাকি— করছি না যে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়— তাহলে রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করার আমরা যে দাবি করছি, তা কি সত্য বলে মনে করা যায়? বড়জোর এতটুকুই বলা চলে যে, হ্যাঁ, আমরা রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করছি বটে, তবে তা মিষ্টি, সহজ ও নরম নরম সুন্নাত। কিন্তু কঠিন, কষ্ট, প্রাণে ও ধন-সম্পদে আঘাত লাগে এমন কোনো সুন্নাত পালনের দিকে আমাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, তাও যে আমাদেরকে অবশ্য পালন করতে হবে, না করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে, সেকথা স্মরণ করতেও যেন আমরা ভয় পাই।

বিদয়াতের পুঞ্জীভূত স্তুপ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা)-এর পূর্বোক্ত কথাটি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তা মুসলমানদের সাহাবী-পরবর্তী যুগের ইতিহাস অকাট্য ও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। উত্তরকালে মুসলিম সমাজে নানাবিধ বিদয়াত প্রচলিত হয়ে পড়ে, সুন্নাত ধীরে পরিত্যক্ত হয়— মন ও জীবন থেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখনি সুন্নাতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে, তখনই এই ব্যক্তিগত অন্ধ অনুসরণের প্রবল বিদ্বেষ তার পথে প্রচণ্ড বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ ব্যক্তির নাম করে যে তার জীবদ্দশায় হয়ত বড় আলিম বা পীর, অলী-আল্লাহ্ হওয়ার সুখ্যাতি পেয়ে গেছেন জনগণের কাছে— তাঁর দোহাই দিয়ে বলা হয়েছে ঃ অমুক বুযর্গ বা অমুক আলিম এ কথা বলে গেছেন, কাজেই এতে কোনো দোষ নেই। এভাবে ব্যক্তি ভিত্তিক সত্যাসত্য ও ন্যায়ান্যায়ের বিচার ইসলামে এক সম্পূর্ণ নতুন জিনিস— সুস্পষ্ট বিদয়াত। অথচ ইসলামে রাসূলে করীম (স) ছাড়া আর কোনো ব্যক্তির কথার বা কাজের দোহাই আদৌ সমর্থনীয় নয়। এভাবে মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে সুন্নাত— রাসূলে করীম (স)-এর আদর্শ— তলিয়ে গিয়ে সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বিদয়াত— আবর্জনার স্তুপ। এ বিদয়াত যেমন দেখা দিয়েছে আকীদা-বিশ্বাসে, চিন্তায়-মনে, তেমনি আমলে ও আখলাকে, বাস্তব জীবনের সর্বদিকে ও সর্বক্ষেত্রে। এ স্তুপ প্রায় আকাশ ছোঁয়া। এর এক-একটা করে গণনা করাও সাধ্যাতীত। অথচ এ বিদয়াতগুলো নির্ধারিত ও চিহ্নিত না হলে মুসলমানকে তা থেকে রক্ষা করার— বিদয়াতের স্তুপের তলা থেকে তাদের উদ্ধার করার আর কোনোই উপায় নেই। তাই আমরা কতকগুলো বড় বড় বিদয়াত সম্পর্কে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা পেশ করবো। আমরা দেখাব ঃ এক-একটি বিদয়াত কিভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করেছে ও শিকড় গেড়ে বসেছে এবং মূল ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের কোথায়— গোমরাহীর কোন সুদূর প্রান্তে— নিয়ে পৌঁছিয়েছে।

এ পর্যায়ের আলোচনার শেষ ভাগে আমরা 'খলিফায়ে রাশিদ' হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের সে বিখ্যাত ভাষণটির উল্লেখ করবো, যা তিনি খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পরই সমবেত লোকদের সামনে পেশ করেছিলেন। ভাষণটি এইঃ

أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ نَبِيٌّ وَلَا بَعْدَ كِتَابِكُمْ كِتَٰبٌ وَلَا بَعْدَ سُنَّتِكُمْ سُنَّةٌ وَلَا بَعْدَ أُمَّتِكُمْ أُمَّةٌ - أَلَا وَأَنَّ الْحَلَالَ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ حَلَالٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَا وَإِنَّ الْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ حَرَامٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - أَلَا وَإِنِّيْ لَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ وَلٰكِنِّيْ مُتَّبِعٌ أَلَا وَإِنِّيْ لَسْتُ بِقَاضٍ وَلٰكِنِّيْ مُنْفِذٌ أَلَا وَإِنِّيْ لَسْتُ بِخَازِنٍ وَلٰكِنِّيْ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ - أَلَا وَإِنِّيْ لَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَلٰكِنِّيْ أَثْقَلُكُمْ حَمْلًا - أَلَا وَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

(الاعتصام : ج-١، ص- ٦٠ -٦١)

জেনে রাখো, তোমাদের নবীর পর আর কোনো নবী-ই নেই, তোমাদের কিতাব (কুরআন মজীদ)-এর পর আর কোনো কিতাব-ই নেই, তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট সুন্নাতের পর আর কোনো সুন্নাত নেই এবং তোমাদের এই উম্মতের পর অন্য কোনো (নবীর) উম্মত হবে না। তোমরা জেনে রাখো, হালাল তা-ই, যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে তাঁর রাসূলের জবানীতে হালাল করে দিয়েছেন এবং তা হালাল কিয়ামত পর্যন্ত। জেনে রাখো, হারাম কেবল তা-ই যা আল্লাহ হারাম করেছেন তাঁর কিতাবে তাঁর রাসূলের জবানীতে তা হারাম কিয়ামত পর্যন্ত। জেনে রাখবে, আমি বিদয়াতপন্থী বা নতুন কিছুর প্রবর্তক নই। আমি শুধু দ্বীনের অনুসরণকারী মাত্র। জেনে রাখো, আমি চূড়ান্ত ফয়সালাকারী কেউ নই, আমি তো শুধু নির্বাহকারী। জেনে রাখবে, আমি ধন-ভাণ্ডার সঞ্চয়কারী নই বরং আমি সেখানেই তাই রাখব, যা যেখানে রাখার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি। এ-ও জেনে রাখবে, আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নই; আমাকে তো তোমাদের ওপর বোঝাস্বরূপ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, আর শেষ কথা জেনে রাখবে, স্রষ্টার নাফরমানী করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

বস্তুত এ ভাষণটি ঠিক ইসলামী আদর্শানুসারী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তিরই উপযুক্ত ভাষণ। এ ভাষণের মূল বক্তব্য আমাদের এ আলোচনারও বক্তব্য।

বিদয়াত কত প্রকার ?

বিদয়াত সম্পর্কে এ মৌলিক আলোচনার শেষ পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা একান্তই আবশ্যকতা হলো বিদয়াতের প্রকারভেদ সম্পর্কে। প্রশ্ন হলো, বিদয়াত কি সত্যিই কয়েক ভাগে বিভক্ত ?

সাধারণভাবে মুসলিম সমাজের প্রচলিত ধারণা হলো ঃ বিদয়াত দু'প্রকার। একটি হলো بدعة حسنة "ভালো বিদয়াত' আর দ্বিতীয়টির নাম হলো بدعة سيئة 'মন্দ বিদয়াত' কেউ কেউ দ্বিতীয়টির নাম দিয়েছেন ঃ بدعة مستقبحة 'ঘৃণ্য ও জঘন্য বিদায়ত।' কিন্তু বিদয়াতের এই বিভাগও বোধ হয় একটি অভিনব বিদয়াত। কেননা বিদয়াতকে 'ভালো' ও মন্দ' এই দু'ভাগে ভাগ করার ফলে বহু সংখ্যক 'বিদয়াত'ই 'ভালো বিদয়াত' হওয়ার 'পারমিট' নিয়ে ইসলামী আকীদা ও আমলের বিশাল ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করেছে অগোচরে। ফলে তওহীদবাদীরাই আজ এমন সব কাজ অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে, যা প্রকৃতপক্ষেই তওহীদ বিরোধী— যা সুস্পষ্টরূপে বিদয়াত এবং কোনো তওহীদবাদীর পক্ষেই তা এক মুহূর্তের তরেও বরদাশত করার যোগ্য নয়।

এ পর্যায়ে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতো মনীষীও বিদয়াতকে দু'প্রকারে বলে এর একটি সংজ্ঞা পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ثُمَّ الْبِدْعَةُ عَلٰى نَوْعَيْنِ اِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَاِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبِحَةٌ - (عمدة القارى :ج-١٠، ص - ١٢٦)

বিদয়াত দু'প্রকার। বিদয়াত যদি কোনো শরীয়তসম্মত ভালো কাজের মধ্যে গণ্য হয়, তবে তা 'বিদয়াতে হাসানা'— ভালো বিদয়াত। আর যদি তা শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ ও জঘন্য কাজ হয়, তবে তা 'বিদয়াতে মুস্তাকবিহা'— ঘৃণ্য ও জঘন্য বিদয়াত।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

اَلْبِدْعَةُ اَصْلُهَا مَا اُحْدِثَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَتَطْلُقُ فِى الشَّرْعِ عَلٰى مُقَابِلَةِ السُّنَّةِ فَتَكُوْنُ مَذْمُوْمَةً - (نيل الاوطار ج ٣، ص ٦٣)

বিদয়াত আসলে বলা হয় এমন নতুন উদ্ভাবিত কাজ কিংবা কথাকে, পূর্ববর্তী সমাজে যার কোনো দৃষ্টান্তই পাওয়া যায় না। আর শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাতের বিপরীত জিনিসকে বলা হয় বিদয়াত। অতএব তা অবশ্যই নিন্দনীয় হবে।

অর্থাৎ যা-ই সুন্নাতের বিপরীত তা-ই বিদয়াত। অতএব বিদয়াতের সব কিছুই নিন্দনীয়, পরিত্যাজ্য, তার মধ্যে কোনো দিকই প্রশংসনীয় বা ভালো থাকতে পারে না। অন্য কথায়, বিদয়াতকে দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগকে ভালো বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করা এবং এক ভাগকে মন্দ বিদয়াত বলা একেবারেই অমূলক।

একথার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। শরীয়তে যার কোনো না-কোনো ভিত্তি বা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, তা তো কোনোক্রমেই সুন্নাতের বিপরীত হতে পারে না। যা-ই সুন্নাতের বিপরীত নয়, তা-ই বিদয়াত নয়। আর যার কোনো দৃষ্টান্তই ইসলামের সোনালী যুগে পাওয়া যায় না, শরীয়তে পাওয়া যায় না যার কোনো ভিত্তি তা কোনোক্রমেই শরীয়তসম্মত নয় বরং তা-ই সুন্নাতের বিপরীত; অতএব তা-ই বিদয়াত। এর কোনো দিকই ভালো প্রশংসনীয় বা গ্রহণযোগ্য নয়। এক কথায় বিদয়াতকে হাসানা ও সাইয়্যেয়া — ভালো ও মন্দ ভাগ করা অযৌক্তিক।

রাসূলের যুগে বিদয়াত-এর মধ্যে কোনো 'হাসানা' ভালো দিক পাওয়া যায়নি। সাহাবী ও তাবেয়ীনের যুগেও নয়, রাসূলের বাণীতেও বিদয়াতকে এভাবে ভাগ করা হয়নি।

তাহলে মুসলিম সমাজে বিদয়াতের এ বিভাগ কেমন করে প্রচলিত হলো? এর জবাব পাওয়া যাবে হযরত উমর ফারূকের একটি কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী বলেন:

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رض فِي رَمَضَانَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاِذَا النَّاسُ اَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ اِنِّى اَرٰى لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلَاءِ عَلٰى قَارِىءٍ وَّاحِدٍ لَكَانَ اَمْثَلُ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلٰى اُبَىِّ

ابن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاته قاريهم فقال عمر نعمت البدعة هذه - (بخارى)

আমি হযরত উমর (রা)-এর সাথে রমযান মাসে মসজিদে গেলাম। সেখানে দেখলাম লোকেরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নিজের নিজের নামায পড়ছে। আবার কোথাও একজন নামায পড়ছে, আর তার সঙ্গে পড়ছে কিছু লোক। তখন হযরত উমর (রা) বললেন ঃ আমি মনে করছি এ সব নামাযীকে একজন ভালো ক্বারীর পিছনে একত্রে নামায পড়তে দিলে খুবই ভালো হতো। পরে তিনি তাই করার ফয়সালা করেন এবং হযরত উবাই ইবনে কায়াবের ইমামতিতে জামায়াতে নামায পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই সময় এক রাত্রে আবার উমর ফারূকের সাথে আমিও বের হলাম। তখন দেখলাম লোকেরা একজন ইমামের পিছনে জামা'আতবদ্ধ হয়ে তারাবীহর নামায পড়ছেন। এ থেকে হযরত উমর (রা) বললেন ঃ এতো 'খুব ভালো বিদয়াত।'[১]

হাদীসের শেষভাগে উল্লিখিত উমর ফারূক (রা)-এর কথাটিই হলো বিদয়াতকে দুভাগে ভাগ করার। বাক্যটি হলো ঃ نعمت البدعة هذه এর শাব্দিক তরজমা হলো ঃ 'এটা একটা উত্তম বিদয়াত।' আর একটি বিদয়াত যদি উত্তম হয়, তাহলে আপনা আপনি বোঝা যায় যে, আর একটি বিদয়াত অবশ্যই খারাপ হবে। তাহ্লে মনে করা যেতে পারে যে, কোনো কোনো বিদয়াত ভালো, আর কোনো কোনো বিদয়াত মন্দ। এ হলো এ ব্যাপারে মূল ইতিহাস। মনে হচ্ছে উত্তরকালে হাদীসের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়েই লোকেরা বিদয়াতের এ দুটো ভাগকে তুলে ধরেছেন। এবং বুখারী থেকেই সাধারণ সমাজে এ কথাটি ছড়িয়ে পড়েছে ও লোকদের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসেছে। এখন অবস্থা হচ্ছে এই যে, যে কোনো বিদয়াতকে সমালোচনা করলে বা সে সম্পর্কে আপত্তি তোলা হলে, তাকে বিদয়াত বলে ত্যাগ করার দাবি জানান হলে অমনি জবাব দেয়া হয়, 'হ্যাঁ. বিদয়াত তো বটে, তবে বিদয়াতে সাইয়্যেয়া নয়, 'বিদয়াতে হাসানা', অতএব ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। হয়ত বা এ বিদয়াতে হাসানার আবরণে সুন্নাতের সম্পূর্ণ খেলাপ এক মারাত্মক বিদয়াত-ই সুন্নাতের মধ্যে, সওয়াবের কাজের মধ্যে গণ্য হয়ে মুসলিম সমাজে দ্বীনী মর্যাদা পেয়ে গেল। বস্তুত বিদয়াতের মারাত্মক দিক-ই হচ্ছে এই। এ কারণে বাস্তবতার দৃষ্টিতে রাসূলের বাণী

১. এই হাদীসটি ঈমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিস জামা'আতের সাথে তারাবীহ নামায পড়ার পর্যায়ে-ই উল্লেখ করেছেন। রমযান মাসে জামা'আতের সাথে তারাবীহ পড়া যে জায়েয, এ হাদীসই তার দলীল।

كل بدعة ضلالة 'সব বিদয়াত-ই গোমরাহী" অর্থহীন হয়ে যায়। কেননা সব বিদয়াত-ই যদি গোমরাহী হয়ে থাকে, তাহলে কোনো বিদয়াত-ই হেদায়েত হতে পারে না। কিন্তু বিদয়াতের ভাগ-বণ্টন তার বিপরীত কথাই প্রমাণিত হয়। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, রাসূলের কথা 'সব বিদয়াতেই গোমরাহী' ঠিক নয়। কোনো কোনো বিদয়াত ভালোও আছে (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)। রাসূলে কথার বিপরীত ব্যাখ্যা দানের মারাত্মক দৃষ্টান্ত এর চেয়ে আর কিছু হতে পারে না।

আমার বক্তব্য এই যে, মূলত বিদয়াতকে 'হাসানা' ও 'সাইয়্যেয়া' দুভাগে ভাগ করাই ভুল। আর হযরত উমর ফারূক (রা)-এর কথা দ্বারাও এ বিভাগ প্রমাণিত হয় না। কেননা উমর ফারূকের কথার অর্থ মোটেই তা নয়, যা মনে করা হয়েছে। এ জন্যে যে, হযরত উমর (রা) জামা'আতের সাথে তারাবীহর নামাযকে নিশ্চয়ই সেই অর্থে বিদয়াত বলেন নি, যে অর্থে বিদয়াত সুন্নাতের বিপরীত। তা বলতেও পারেন না তিনি। হযরত উমরের চাইতে অধিক ভালো আর কে জানবেন যে, জামা'আতের সাথে তারাবীহ নামায পড়া মোটেই বিদয়াত নয়। রাসূলের জামানায় তা পড়া হয়েছে। রাসূলে করীম (স) দু'তিন রাত তারাবীহর নামায নিজেই ইমাম হয়ে পড়িয়েছেন— এ কথা সহীহ হাদীস থেকেই প্রমাণিত। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى فِىْ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى بِصَلَاتِهٖ نَاسٌ ثُمَّ صَلّٰى الثَّانِيَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اَوِالرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ رَاَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلَّا اَنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَفْتَرِضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ -

(بخاری، مسلم)

নবী করীম (স) মসজিদে নিজের নামায পড়ছিলেন। বহু লোক তাঁর সঙ্গে নামায পড়ল। দ্বিতীয় রাত্রিতেও সে রূপ হলো। এতে করে এ নামাযে খুব বেশি সংখ্যক লোক শরীক হতে শুরু করলো। তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে যখন জনগণ পূর্বানুরূপ একত্রিত হলো, তখন নবী করীম (স) ঘরে থেকে বের হলেন না। পরের দিন সকাল বেলা রাসূলে করীম (স) লোকদের বললেন ঃ তোমরা যা করেছ তা আমি লক্ষ্য করেছি। আমি নামাযের জন্যে মসজিদে আসিনি শুধু একটি কারণে, তাহল এভাবে জামা'আতবদ্ধ হয়ে (তারাবীহ্) নামায পড়লে আমি ভয় পাচ্ছি, হয়ত তা তোমাদের ওপর ফরযই করে দেয়া হবে।

হযরত আশেয়া (রা) বলেন ঃ 'এ ছিল রমযান মাসের ব্যাপার।'

এ হাদীস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, জামা'আতের সাথে তারাবীহ্ নামায পড়াবার কাজ প্রথম করেন নবী করীম (স) নিজে। করেন পর পর তিন রাত্র পর্যন্ত। তাঁর পিছনে লোকরা নামাযে শরীক হয়; কিন্তু তিনি নিষেধ করেন না। পরে তিনি তা পড়ান বন্ধ করেন শুধু এ ভয়ে যে, এভাবে এক অফরয নামায রাসূলের ইমামতিতে নিয়মিত পড়া হলে এ কাজটি আল্লাহ্র তরফ থেকে ফরয করে দেয়া হতে পারে।[১] কেননা তখন তো অহী নাযিল হচ্ছিল, শরীয়ত তৈরী হচ্ছিল।[২] আর নবীর করা কাজ তো সুন্নাত। তা বিদয়াত হবে কি করে?

তাহলে হযরত উমর (রা) জামা'আতের সাথে তারাবীহ্ পড়াকে 'বিদয়াত' বললেন কেন? বলছেন বিদয়াতের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থে, পরিভাষা হিসেবে নয়। বিদয়াতের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ যে 'নতুন' তা পূর্বেই বলা হয়েছে। আর একে নতুনও এ হিসেবে বলা হয়নি যে, এরূপ নামায ইতিপূর্বে কখনোই পড়া হয়নি; বরং বলা হয়েছে এ কারণে যে, নবী করীম (স)-এর সময় জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র নামায পড়া ২-৪ দিন পর বন্ধ হয়ে যায়, তারপর

---

১. নবী করীম (স) নিজে তারাবীহ্ নামাযে ইমামতি করা বন্ধ করলেও তা জামা'আতের সাথে পড়া কিন্তু বন্ধ হলো না। তার পরও তা চলেছে; কিন্তু তিনি নিষেধ করেন নি জানা সত্ত্বেও। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসই তার প্রমাণ। তিনি বলেন ঃ তৃতীয় বা চতুর্থ রাত্রে তিনি যখন তারাবহী নামাযের ইমামতি করতে এলেন না, তখন পরের দিন সকাল বেলা তিনি সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

فَقَدْ رَاَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلَّا اَنِّى خَشِيْتُ اَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

রাত্রি বেলা যা তোমরা করছিলে (জামা'আতে সাথে তারাবীহ্ পড়ছিলে) তা আমি দেখেছি। কিন্তু কেবল একটি ভয়ই তোমাদের সাথে যোগ দিতে আমাকে বিরত রেখেছে, তা হচ্ছে, জামা'আতের সাথে তারাবীহ্ পড়া তোমাদের জন্য ফরয হয়ে যাওয়া। (মুসলিম)

২. নবী করীম (স) কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করেও যে তা করেন নি শুধু এ ভয়ে যে, তিনি নিয়মিত তা করলে লোকেরাও তা নিয়মিত করতে শুরু করবে। আর তা দেখে আল্লাহ্ও তাঁর বান্দাদের জন্যে তা ফরয করে দিতে পারেন, এ কথা হযরত আয়েশা (রা)-এর কথা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَّعْمَلَ بِهٖ خَشْيَةَ اِنْ يَّعْمَلَ بِهٖ النَّاسُ فَيُفْرَضُ - (الاعتصام :ج--١، ص- ١٥٤)

নবী করীম (স) কোনো কোনো কাজ করতে ভালবাসতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা করতেন না শুধু এই ভয় যে, তিনি তা নিয়মিত করতে থাকলে লোকদের ওপর তা ফরয হয়ে যেতে পারে।

বহু কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে এ নামায জামা'আতের সাথে নতুন করে চালু করা যায়নি। এরপর হযরত উমর ফারূকের সময় এ নামায চালু হয়। এ হিসেবে একে বিদয়াত বলা ভুল কিছু হয়নি এবং তাতে করে তা সেই বিদয়াতও হয়ে যায়নি যা সুন্নাতের বিপরীত, যার কোনো দৃষ্টান্তই রাসূলের যুগে পাওয়া যায় না। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে হযরত উমরের এ কথাটির সঠিক তাৎপর্য কি ? মুহাদ্দিসদের মতে এর তাৎপর্য এই ঃ

نِعْمَ الْاَمْرُ الْبَدِيْعُ الَّذِىْ ثَبَتَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُرِكَ فِىْ زَمَنِ اَبِىْ بَكْرٍ لِاشْتِغَالِ النَّاسِ فِيْمَا حَصَلَ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(نيل الاوطار :ج - ٣)

জামা'আতের সাথে তারাবীহ্ পড়া এক অতি উত্তম চমৎকার ব্যবস্থা, যা রাসূলে করীম থেকে শুরু হয়েছিল এবং পরে হযরত আবু বকরের সময়ে লোকদের নানা জটিলতায় মশগুল হয়ে থাকার কারণে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল।

মুল্লা আলী কারী হযরত উমর ফারূকের এ কথাটুকুর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

وَ اِنَّمَا سَمَّاهَا بِدْعَةً بِاِعْتِبَارِ صُوْرَتِهَا فَاِنَّ هٰذَا الْاِجْتِمَاعُ مُحْدَثٌ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ وَ اَمَّا بِاِعْتِبَارِ الْحَقِيْقَةِ فَلَيْسَتْ بِدْعَةً (مرقاة- ٣، ص - ١٨٦)

উমর ফারূক (রা) এ কাজকে বিদয়াত বলেছেন তার বাহ্যিক দিককে লক্ষ্য করে। কেননা নবী করীমের পর এ-ই প্রথমবার নতুনভাবে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র নামায পড়া চালু হয়েছিল। নতুবা প্রকৃত ব্যাপারের দৃষ্টিতে জামা'আতের সাথে এ নামায পড়া মোটেই বিদয়াত নয়।

এখানে ইমাম মালিক (রা)-এর প্রখ্যাত কথাটি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন ঃ

مَنِ ابْتَدَعَ فِى الْاِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ يَقُوْلُ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيْنًا فَلَا يَكُوْنُ الْيَوْمَ دِيْنًا -

যে লোক ইসলামের কোনো বিদয়াতের সৃষ্টি করলো এবং সে তাকে খুবই ভালো মনে করলো, সে প্রকারান্তরে ঘোষণা করলো যে, (নাউজুবিল্লাহ্) হযরত মুহাম্মদ (স) রিসালাতের দায়িত্ব পালনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কেননা আল্লাহ্ তো বলেছেন ঃ আমি আজ তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। অতএব রাসূলের সময় যা দ্বীনভুক্ত ছিল না, তা আজও দ্বীনভুক্ত নয়। (دعوت وعزمت   سید ابو الحسن علی ندوی ٤-٢٥٣)

এ বিষয়ে আমার শেষ কথা হলো, বিদয়াতকে দু'ভাগে ভাগ করাও একটা বিদয়াত এবং বিদয়াতের এ বিভাগের— দুয়ার— পথ দিয়ে অসংখ্যা মারাত্মক বিদয়াত ইসলামের গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে দ্বীনী মর্যাদা লাভ করেছে। বড় সওয়াবের কাজ বলে সমাজের বুকে শিকড় মজবুত করে গেড়ে বসেছে। এ বিষবৃক্ষ যত তাড়াতাড়ি উৎপাটিত করা যায়, ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষে ততোই মঙ্গল।

বিদয়াত সমর্থনে পীর অলীর দোহাই

বিদয়াতপন্থীরা সাধারণত নিজেদের উদ্ভাবিত বিদয়াতের সমর্থনে সূফীয়ায়ে কিয়াম ও মাশায়েখে তরীকতের দোহাই দিয়ে থাকে। তারা বড় বড় ও সুস্পষ্ট বিদয়াতী কাজকেও 'বিদয়াত' নয়— বড় সওয়াবের কাজ বলে চালিয়ে দেয়। আর বলে ঃ অমুক অলী-আল্লাহ্, অমুক হযরত পীর কিবলা নিজে এ কাজ করেছেন এবং করতে বলেছেন। আর তাঁর মতো অলী আল্লাহই যখন এ কাজ করেছেন, করতে বলে গেছেন, তখন তা বিদয়াত হতে পারে না, তা অবশ্যই বড় সওয়াবের কাজ হবে। তা না হলে কি আর তিনি তা করতেন। অতএব তা সুন্নাত বলে ধরে নিতে হবে।

বিদয়াতের সমর্থনে এরূপ পীরের দোহাই দেয়ার ফলে সমাজে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। একটি প্রতিক্রিয়া এই যে, কোনটি সুন্নাত আর কোনটি বিদয়াত কোনটি জায়েয আর কোনটি নাজায়েয় তা নির্দিষ্টভাবে ও নিঃসন্দেহে জানবার জন্যে না কুরআন দেখা হয়, না হাদীস, না সাহাবায়ে কিরামের আমল ও জীবন-চরিত। কেবল দেখা হয় অমুক হুযুর কিবলা এ কাজ করেছেন কিনা! তিনিই যদি করে থাকেন তাহলে তা করতে আর কোনো দ্বিধাবোধ করা হয় না। সেক্ষেত্রে এতটুকুও চিন্তা করা হয় না যে, যার বা যাদের দোহাই দেয়া হচ্ছে সে বা তারা কুরআন-হাদীস অনুযায়ী কাজ করেছে কিনা; তারা শরীয়তের ভিত্তিতে এ কাজ করেছে না নিজেদের ইচ্ছামতো।

এরূপ কথা তো আরবের কাফির সমাজের লোকদের বলা কথার মতো। যখন তাদের নিকট প্রকৃত তওহীদী দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা হয়েছিল, তখন তারা বলেছিল ঃ

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ - (الزخرف ٢٢)

আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটি পন্থার সংঘবদ্ধ অনুসারীরূপে পেয়েছি। আমরা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে চলতে হেদায়েত পেয়ে যাব।

অর্থাৎ তাদের নিকট হক্ না-হকের একমাত্র দলীল ছিল পূর্বপুরুষের দোহাই। তাদের তারা অনুসরণ করতো এ কারণে নয় যে, তারা কোনো ভালো আদর্শ অনুসরণ করে গেছে; বরং এজন্যে যে, তারা ছিল তাদের পূর্বপুরুষ। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই দেখা যায় ঃ বিদয়াত কাজের সমর্থনে কেবল হুযূর কিবলার দোহাই।

সে দোহাইর ভিত্তি শরীয়তের কোনো দলীল নয়, দলীল শুধু এই যে, সে তাদের ধারণা মতো একজন 'বড় অলী-আল্লাহ' আর তার করা কাজ শরীয়তের প্রধান সনদ।

সে দিন আরবদের উপরোক্ত কথার জবাবে নবীগণের জবানীতে কুরআন মজীদে বলা হয়েছিল ঃ

قَالَ قُلْ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَاءَكُمْ -

> বলো! তোমরা তোমাদের বাপ দাদাকে যে নীতি অনুসারী পেয়েছ, তার অপেক্ষা অধিক উত্তম হেদায়েতের বিধান যদি আমি তোমাদের নিকট নিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকি, তাহলেও কি তোমরা সেই বাপ-দাদাদেরই অনুসরণ করতে থাকবে ?

অর্থাৎ এ এক আশ্চর্যের ব্যাপার যে, নীতি হিসেবে যেটা ভালো ও উত্তম বিবেচিত হবে, সেটা তারা অনুসরণ করতে রাজি নয়। এমন কি ভালো নীতি কোনটি তার বিচার-বিবেচনা করতেও প্রস্তুত নয় তারা। সর্বত্তোম নীতি ও আদর্শ পেশ করা হলেও তারা যেমন পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করতেই বদ্ধপরিকর ছিল, তেমনি এরাও শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে যদি কোনো কাজের বিদয়াত হওয়ার প্রমাণিত হয়ও তবু তারা হুযূর কেবলার দোহাই দিয়ে সেই বিদয়াতের কাজ-ই করতে থাকবে।

এর পরিণাম এই যে, মানুষের দ্বীন ও ঈমানকে জনৈক অলী-আল্লাহ্ বা তথাকথিত পীরের আচার-আচরণের ওপর নির্ভরশীল করে দেয়া হয়। সেখানে না আল্লাহ্র কথার কোনো দোহাই চলে, না আল্লাহ্র রাসূলের কোনো কাজের বা কথার। আর কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে এ নীতি সুস্পষ্ট শিরক এবং নিষিদ্ধ। এরূপ নীতিই গোমরাহীর মূল উৎস। এরূপ অবস্থায় মানুষ মানুষের অন্ধ অনুসারী হয়ে যায়; আর আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার পরিবর্তে বান্দা হয়ে যায় সেই মানুষেরই। আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার কোনো সুযোগ-ই এদের জীবনে ঘটে না।

অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যিকার মুমিন-মুসলমানের ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হয়েছে কুরআনে, হাদীসে, ইতিহাসে। তাদের সমাজে দোহাই চলতো কেবল কুরআনের, হাদীসের। কোনো ব্যক্তির দোহাই দেয়া সে সমাজে শিরক্-এর পর্যায়ে গণ্য ছিল। সকল জটিল অবস্থাতেই শুধু এই কুরআন হাদীসের-ই দোহাই দেয়া হতো এবং একবার কুরআন-হাদীসের কোনো দলীল

তাদের সামনে পেশ করা হলে তাদের সব বিবাদ মিঠে যেত, বিদ্রোহ দমন হতো, ঘুছে যেত সব মতপার্থক্য। তা-ই মেনে নিত তারা মাথা নত করে। তার বিপরীত আচরণ গ্রহণ করতে তারা সাহস করতো না, সে অধিকার কারো আছে বলেও তারা মনে করতো না। রাসূলে করীমের ইন্তেকালের পরে পরে খিলাফত পর্যায়ে মুসলমানের মনে মতভেদ হয়, হয় বাক-বিতণ্ডা। কিন্তু যখনই তাঁদের সামনে রাসূলে করীমের একটি হাদীস পেশ করা হলো, অমনি সবাই তা মেনে নিলেন। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সাহাবীদের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ হলো। এ পর্যায়ে কুরআনের দলীল পেশ করা হলে সবাই মেনে নিলেন যে, খলীফার গৃহীত এ নীতি যুক্তিসঙ্গত। ক্রীতদাস উসামা ইবনে যায়দের নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ পর্যায়ে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ

مَاكُنْتُ لِاَرُدَّ بَعْثًا اَنْفَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

রাসূলে করীম (স) নিজে যে বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত করে গেছেন, আমি তা প্রত্যাহার করতে পারব না।

এ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সবাই মেনে নিলেন। বস্তুত এ-ই হচ্ছে আদর্শ মুসলমানের ভূমিকা। আর মুসলমানদের জন্যে চিরন্তন আদর্শ এ-ই হতে পারে, এ-ই হওয়া উচিত।

এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এই দেখা দিয়েছে যে, জনসাধারণ মনে করতে শুরু করেছে যে, শরীয়ত ও মারিফাত (বা তরীকত) দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। শরীয়তে যা নাজায়েয, মারিফাত বা তরীকতের দৃষ্টিতে তাই জায়েয। কেননা একদিকে শরীয়তের দলীল দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ এটা বিদয়াত কিন্তু পীরের দোহাই দিয়ে সেটিকেই জায়েয করে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে শরীয়ত আর মারিফাতের দুই পরস্পর বিধান হওয়ার ধারণা প্রকট হয়ে উঠে।

এরূপ ধারণা দ্বীন-ইসলামের পক্ষে যে কতখানি মারাত্মক, তা বলে শেষ করা কঠিন। অতঃপর দ্বীন ও ঈমানের যে কোনো কল্যাণ নেই, তা স্পষ্ট বলা যায়। কেননা মানুষকে সব রকমের গোমরাহী থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে শরীয়ত। এই শরীয়তের সুস্পষ্ট বিরোধিতাকেও যদি জায়েয মনে করা হয়, জায়েয বলে চালিয়ে দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে গোমরাহীর সয়লাব যে সবকিছুকে রসাতলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তা রোধ করতে পারবে কে?

তাই আমরা বলতে চাই, শরীয়তী ব্যাপারে রাসূল ও সাহাবাদের ছাড়া আর কারো দোহাই চলতে পারে না। কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে সাহাবা ছাড়া স্বীকৃত হতে পারে না অপর কোনো দলীল। কোনো মুসলমান-ই সে দোহাই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। নিলে তা ইসলাম হবে না, হবে অন্য কিছু।

কয়েকটি বড় বড় বিদয়াত

সুন্নাত ও বিদয়াত সম্পর্কে নীতিগত আলোচনা এখানে শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা কতগুলো বড় বড় বিদয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করবো। এখানে বিদয়াত হিসেবে যে কয়টি বিষয়কে পেশ করা হচ্ছে, তার মানে কখনো এ নয় যে, কেবল এ কয়টিই বিদয়াত, এর বাইরে বা এছাড়া আর কোনো বিদয়াত নেই এবং এ কয়টি বিদয়াতের উৎখাত হলেই সমস্ত বিদয়াত বুঝি শেষ হয়ে যাবে, আর সুন্নাতের সোনালী যুগের সূচনা হবে। না, তা নয়। বরং এর অর্থ এই যে, আমাদের মুসলিম সমাজে বর্তমানে যত বিদয়াতই প্রবেশ করেছে, তন্মধ্যে এগুলো হচ্ছে মৌলিক এবং বড় বড় বিদয়াত। তবে এ-ই শেষ নয়। এ রকম আরো অনেক বিদয়াত রয়েছে যা আমাদের জীবনে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। বিদয়াতের এ নীতিগত আলোচনার পর এখনকার আলোচনাকে মনে করা যেতে পারে দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ এ কয়টি বিদয়াতের আলোচনা এখানে পেশ করা হলো, এ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এ ধরনের আরো অনেক বিদয়াত রয়েছে আমাদের জীবনে ও সমাজে। এর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোরও মূলোৎপাটন আবশ্যক।

তওহীদী আকীদায় শির্‌ক-এর বিদয়াত

একথা কেবল মুসলমানেরই নয়, দুনিয়ার কারোই অজানা থাকার কথা নয় যে, ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা হচ্ছে তওহীদ। 'তওহীদ' মানে আল্লাহ্‌র একত্ব। আল্লাহ্‌র এ একত্ব সার্বিক, পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বাত্মক। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন তিনি একমাত্র পালনকর্তা, মালিক, রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা ও আইন-বিধানদাতাও। অতএব মানুষ ভয় করবে কেবল আল্লাহ্‌কে, ইবাদত-বন্দেগী ও দাসত্ব করবে একমাত্র আল্লাহ্‌র। সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও লালন-পালনকারী হিসেবে মানবে একমাত্র আল্লাহ্‌কে। এসব দিক দিয়ে তিনিই একমাত্র 'ইলাহ্‌'। তিনি ছাড়া কেউ ইলাহ্‌ নেই, কেউ ইলাহ নয়, কেউ ইলাহ্‌ হতে পারে না এবং তিনিই একমাত্র রব্ব, তিনি ছাড়া লালন-পালনকারী ও ক্রমবিকাশদাতা, রক্ষাকর্তা ও প্রয়োজন পূরণকারী আর কেউ নেই। মা'বুদও একমাত্র তিনি-ই। তিনি ছাড়া আর কেউ মানুষের ইবাদাত-বন্দেগী আনুগত্য পাবার অধিকারী নয়। অতএব মানুষের ওপর আইন-বিধান কেবল আল্লাহ্‌রই চলবে। সংক্ষেপ কথায় ঃ রব্ব হওয়ার দিক দিয়েও তিনি এক, একক, অনন্য; আর ইলাহ্‌ হওয়ার দিক দিয়েও তিনি এক, লা-শরীক। রবুবিয়তের দিক দিয়েও আল্লাহ এক, উলুহিয়াতের দিক দিয়েও তিনি এক। এর কোনো একটি দিক দিয়েও তাঁর শরীক কেউ নেই, জুড়ি কেউ নেই, সমতুল্য কেই নেই।

শুধু এখানেই শেষ নয়। তিনি তাঁর যাত— মূল সত্তায় এক, অনন্য। তাঁর গুণাবলীতেও তিনি একক— শরীকহীন। মাখলুকাতের ওপর— অতএব মানুষের ওপর— হক বা অধিকার তাঁরই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ হক্‌-হকুকের দিক দিয়েও তাঁর শরীক কেউ নেই। এবং ক্ষমতা ইখতিয়ারও একমাত্র তাঁরই রয়েছে সৃষ্টির ওপর— এই মানুষের ওপর। আর এসব ক্ষেত্রেও তাঁর শরীক কেউ নেই, কিছু নেই। কাউকেই তাঁর শরীক হওয়ার মর্যাদা দেয়া যেতে পারে না।

ইসলামের এই তওহীদী আকীদা কুরআন থেকে প্রমাণিত; প্রমাণিত হাদীস থেকেও। রাসূলে করীম (স) সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে এই আকীদা-ই পেশ করেছেন বিশ্ববাসীর সামনে। দাওয়াত দিয়েছেন মৌলিক আকীদা হিসেবে এ তওহীদকে গ্রহণ করার। যাঁরাই সেদিন ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁরা সকলে তওহীদের এ ধারণার প্রতি ঈমান এনেই হয়েছিলেন মুসলমান। অতএব রাসূলের

সাহাবীরাও ছিলেন এই আকীদায় বিশ্বাসী। এই ব্যাপারে তাঁরা কখনও দুর্বলতা দেখাননি, এক্ষেত্রে কারো সাথে তাঁরা রাজি হননি কোনোরূপ আপোস বা সমঝোতা করতে। অতএব এ-ই হচ্ছে সুন্নাতের তওহীদী আকীদা। আকীদার সুন্নাত এ-ই।

কিন্তু ইসলামের এ সুন্নাতী আকীদায় কিংবা বলা যায়— আকীদার এ সুন্নাতে বর্তমানে দেখা দিয়েছে নানা শির্‌ক-এর বিদয়াত। মুসলিম সমাজে আল্লাহ্‌কে এক ও অনন্য বলে সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় বটে। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, আল্লাহ্‌র উলুহিয়াতী তওহীদের প্রতি যদিও বিশ্বাস রয়েছে; কিন্তু তাঁর রবুবিয়াতের তওহীদ স্বীকার করা হচ্ছে না। মুখে স্বীকার করা হলেও কার্যত অস্বীকারই করা হচ্ছে। বরং এক্ষেত্রেই অন্য শক্তিকে শরীক করা হচ্ছে। রব্ব হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছে আরো অনেক শক্তিকে; মুখে নয়— বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে। আর এ-ই হচ্ছে শির্‌ক। শব্দগত আকীদা হিসেবে যদিও আল্লাহ্‌কে-ই রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সৃষ্টিকর্তা, প্রভাবশালী, কর্তৃত্বসম্পন্ন, বিশ্ব ব্যবস্থাপক এবং রব্ব বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু এ শ্রেণীর লোকেরাই মৃত 'বুযুর্গ' (?) লোকদের নিকট প্রার্থনা করে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাদেরই ভয় করে চলে, তাদেরই নিকট থেকে কোনো কিছু পেতে আশা পোষণ করে। বিপদে পড়লে তাদের নিকটই নিস্কৃতি চায়, উন্নতি তাদের নিকট থেকেই চায় লাভ করতে। মনে করে ঃ এরা অলৌকিকভাবে মানুষের দো'আ শুনতে ও কবুল করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, ফয়েজ দিতে পারে। ভালো-মন্দ করাতে ও ঘটাতে পারে। এই উদ্দেশ্য তাদের সন্তোষ কামনা করে। আর তাদের সন্তোষ বিধানের জন্যেই তাদের উদ্দেশে মানত মানে, জন্তু জবাই করে, মরার পর তাঁদের কবরের ওপর সিজদায় মাথা লুটিয়ে দেয়, নিজেদের ধন-সম্পদের একটা অংশ তাদের জন্যে ব্যয় করা কর্তব্য মনে করে। আর এসব কারণেই দেখা যায়, এ শ্রেণীর লোকদের কবরকে নানাভাবে ইজ্জত ও তাজীম করা হচ্ছে, বহু অর্থ খরচ করে কবরের ওপর পাকা-পোখত কুব্বা নির্মাণ করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তর সফর করা হয়। এক নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে চারিদিক থেকে ভক্তেরা এসে জমায়েত হয়। ঠিক যেমন মুশরিক জাতিগুলো গমন করে তাদের জাতীয় তীর্থভূমে।

ইসলামের তওহীদী আকীদার দৃষ্টিতে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নিকট— আর কাউকে সংম্বোধন করে দো'আ করা সুস্পষ্ট শির্‌ক। ইসলামে তা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ। কুরআন মজীদে এপর্যায়ের অসংখ্য আয়াত তার অকাট্য প্রমাণ। কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে মুশরিকদের লক্ষ্য করে, কোনো কোনো

আয়াতে সাধারণভাবে এবং অনেক আয়াতে তওহীদবাদী মুসলিমদের লক্ষ্য করেই এই নিষেধ বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

এ পর্যায়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পেশ করা হচ্ছে ।

একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ - (الاحقاف ٥)

আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে (বা আল্লাহ ছাড়াও) যারা এমন সবকে ডাকে— দো'আ করে, যারা তাদের জন্যে কিয়ামত পর্যন্তও জবাব দিতে পারবে না আর তারা তাদের দো'আ সম্পর্কে কিছুই জানে না, এই শ্রেণীর লোকদের চাইতে অধিক গোমরাহ আর কে হতে পারে।

অপর এক আয়াতের ভাষা হলো এই ঃ

وَ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا - (الجن ١٨)

সব মসজিদ-ই আল্লাহ্র। অতএব আল্লাহ্র সঙ্গে অপর কাউকেই ডাকবে না।

এ আয়াটিতে স্বয়ং রাসূলে করীম ও মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে। এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اٰمِرًا عِبَادَهٗ اَنْ يُّوَحِّدُوْهُ فِىْ مَحَالِ عِبَادَتِهٖ وَ لَايُدْعٰى مَعَهٗ اَحَدٌ وَ لَا يُشْرَكُ بِهٖ -

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা যেন তাঁর ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে একমাত্র তাঁকেই ডাকে, তাঁরই একত্বকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকেই যেন ডাকা না হয়, তাঁর সাথে যেন কোনোরূপ শির্ক করা না হয়।

একটি আয়াতে খোদ নবী করীম (স)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

فَلَاتَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ -

তুমি আল্লাহ্র সাথে অপর কোনো ইলাহ্কে একত্রিত করে ডেকো না— একত্রিত করো না। যদি তা করো, তাহলে তুমি আযাবপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।

আয়াতে 'তুমি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে স্বয়ং নবী করীম (স)-কে। 'তফসীরে ফতহুল বয়ান'-এ লেখা হয়েছে ঃ

ثُمَّ لَمَّا قَدَّرَ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ حَقِيَّةَ الْقُرْاٰنِ وَاَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ عِنْدِهٖ اَمَرَ نَبِيَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءِ اللّٰهِ وَحْدَهٗ -

আল্লাহ তা'আলা যখন কুরআনের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করলেন, প্রমাণ করে দিলেন যে, কুরআন তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ কিতাব, তখন তিনি তাঁর নবী মুহাম্মদ (স)-কে নির্দেশ দিলেন এককভাবে কেবলমাত্র তাঁকেই ডাকবার, কেবল তাঁরই নিকট দো'আ করার।

আর আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা উক্ত তফসীরে লেখা হয়েছে এভাবে ঃ

اِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ الَّذِىْ دَعَوْكَ اِلَيْهِ - وَخِطَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا مَعَ كَوْنِهٖ مُنَزَّهًا عَنْهُ مَعْصُوْمًا مِنْهُ لِحَثِّ الْعِبَادِ عَلَى التَّوْحِيْدِ وَنَهْيِهِمْ عَنْ شَوَائِبِ الشِّرْكِ وَكَاَنَّهٗ قَالَ اَنْتَ اَكْرَمُ الْخَلْقِ وَ اَعَزُّهُمْ عِنْدِىْ وَلَوِ اتَّخَذْتَ مَعِىْ اِلٰهًا لَعَذَّبْتُكَ فَكَيْفَ بِغَيْرِكَ مِنَ الْعِبَادِ -

রাসূলে করীমকে বলা হয়েছে যে, তুমি যদি তাই করো, তাহলে তোমাকে আযাব দেয়া হবে। এখানে মুহাম্মদ (স)-কে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে। তিনি নিজে যদিও শির্কের গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ পবিত্র, তবুও তাঁকে লক্ষ্য করে একথা বলা হয়েছে তওহীদ সম্পর্কে মুমিন বান্দাগণকে উদ্বুদ্ধ করার ও সর্ব প্রকারের শির্ক-এর স্পর্শ থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে। তাহলে কথাটি এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ বললেন ঃ তুমি তো সৃষ্টিলোকের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত, আমার নিকট সবচাইতে মর্যাদাবান, সবচেয়ে বেশি প্রিয়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তুমি যদি আমার সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে বিশ্বাস করো, তাহলে আমি তোমাকেও আযাব দেবো। অতএব ভেবে দেখো, অন্যান্য বান্দারা এরূপ করলে তাদের পরিণতি কি হবে?

আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য কাউকেই ডাকা শির্ক, অন্য কারো নিকট দো'আ করা শির্ক— অতএব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তা কুরআনের নিম্নোক্তে আয়াত কয়টি থেকেও প্রমাণিত হয় ঃ

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ج فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ - (يونس ١٠٦)

আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবে না, যা তোমাকে কোনো উপকার দিতে পারে না, তোমার কোনো ক্ষতি সাধনও করতে পারে না। তুমি-ও যদি তাই করো, তাহলে তুমিও জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।

সূরা المؤمن। এর আয়াতটি এ পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দো'আ সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে পথনির্দেশ করছে এ আয়াত। আল্লাহ্ তা'আলাই ইরশাদ করেছেন ঃ

هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - (المؤمن ٦٥)

তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কেউই মা'বুদ নেই। অতএব তোমরা ডাকো কেবল তাঁকেই একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্য সহকারে। আর সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌র জন্যে নির্দিষ্ট, যিনি সারেজাহানের রব্ব।

আল্লাহ্‌কে জীবন্ত ও চিরঞ্জীব বলার মানে-ই হলো এই যে, তিনি ছাড়া আর যত মা'বুদ— যাদের তোমরা মাবুদ, বলে স্বীকার করো, বাস্তবভাবে যাদের তোমরা বন্দেগী ও দাসত্ব করো— তারা সবই আসলে মৃত। জীবনের কোনো সন্ধানই সেখানে পাওয়া যাবে না। আর যারা মৃত, জীবনহীন, তাদের ডাকার— তাদের নিকট কাতর স্বরে দো'আ প্রার্থনা করার কি সার্থকতা থাকতে পারে! কেননা মৃতদের না দো'আ শুনবার ক্ষমতা আছে, না শুনে তা কবুল করার ও দো'আ অনুযায়ী কোনো কাজ করে দেবার আছে কোনো সামর্থ্য। জীবন্ত ও চিরঞ্জীব তো একমাত্র আল্লাহ; তাঁর কোনো লয়, ক্ষয় বা কোনোরূপ অক্ষমতা নেই। অতএব কেবলমাত্র তাঁকেই ঢাকা উচিত, তাঁরই নিকট দো'আ ও প্রার্থনা করা বাঞ্ছনীয়— সব সময়, সকল অবস্থায়। এর ব্যতিক্রম কিছু হতে পারে না।

এ আয়াত থেকে আরো স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, যিনি প্রকৃত ইলাহ, দো'আ কেবল তাঁরই নিকট করা যেতে পারে এবং যাঁর নিকট দো'আ করা হবে, ঐকান্তিক নিষ্টার সাথে বাস্তব আনুগত্যও করতে হবে একমাত্র তাঁরই। আর দো'আ কবুল হওয়ার জন্য প্রয়োজন আল্লাহ্‌র জন্য সব তারীফ ও প্রশংসা উৎসর্গ করা। আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য বাস্তব জীবনে না করলে এবং মুখে অকৃত্রিমভাবে তাঁর প্রশংসা না করলে তাঁর নিকট দো'আ করার কোনো অর্থ হয় না। তুমি যাঁর আনুগত্য করে চলতে রাজি নও, যার প্রশংসা ও শোকর তোমার

মুখে ধ্বনিত হয় না, তার নিকট তোমার দো'আ করারও কোনো অধিকার থাকতে পারে না। আর তিনিই বা সে দো'আ কবুল করবেন কেন ? দো'আ কবুল করার তাঁর তো কোনো ঠেকা নেই।

তাই সূরা আল-আরাফে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা ঃ

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ - (الاعراف : ٥٥)

সাবধান, মনে রেখো, সৃষ্টি তাঁরই, বিধানও তাঁরই চলবে। মহান বরকতওয়ালা সেই আল্লাহ যিনি সারে জাহানের রব্ব। তোমরা ডাকো তোমাদের এই রব্বকে কাঁদ কাঁদ স্বরে, চুপে চুপে। নিশ্চিয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।

এ আয়াত স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে যে গভীর তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করে, তা হলো এই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্, অতএব দুনিয়া-জাহানে আইন ও বিধান চলবে একমাত্র তাঁরই। এই সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা আল্লাহ্ বড় মহান, অসীম বরকতের মালিক। তোমাদের এই রব্বকেই তোমরা ডাকবে। ডাকবে কাঁদ কাঁদ স্বরে— বিনীত অবনত মস্তকে কাতর কণ্ঠে। এবং ডাকবে গোপনে, অনুচ্চ স্বরে। আর শেষ কথাটি বলে দিচ্ছি যে, যে লোক আল্লাহকেই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বিধানদাতা বলে মানে না, মানে না বরকতওয়ালা মহান আল্লাহ রূপে এবং তাঁরই নিকট যে লোক দো'আ করে না, বিপদে আপদে একমাত্র তাঁকেই ডাকে না, তারাই সীমালংঘনকারী। আর সীমালংঘনকারীরা আল্লাহ্র ভালোবাসা পায় না।

কোনো কোনো মহল মনে করে যে, কুরআনে এসব আয়াতে যে 'দো'আ' (الدعا) শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, তার মানে হচ্ছে ইবাদত (عبادت) আর এ আয়াত কয়টির মানে হলো ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। তা করা শির্ক। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দো'আ করা নিষিদ্ধ নয়, শির্ক - ও নয়। কিন্তু একথা যে কতখানি ভুল এবং প্রকৃত সত্যের বিপরীত, তা বলাই বাহুল্য। আসল কথা হলো, কুরআন মজীদের এসব আয়াতে যে দো'আ (الدعا) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এর প্রকৃত অর্থ ঃ النداء— ধ্বনি দেয়া, আওয়াজ দেয়া এবং الطلب مما الامرية فيه, এমনভাবে কারো নিকট প্রার্থনা করা, যার নিকট দো'আ কবুল হতে এবং প্রার্থিত জিনিস পাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা

সংশয় নেই। ইবাদত এ শব্দের প্রকৃত অর্থ নয়। তা হচ্ছে এর 'মাজাজী' বা পরোক্ষ অর্থ। আরবী অভিধানে বা শরীয়তে কোনো দিক দিয়েই এর অর্থ 'ইবাদতে' নয়। আরবী ভাষার কোনো অভিধানেই এর অর্থ ইবাদত লেখা হয়নি। এমনকি জাহিলিয়াত যুগের কোনো কবি-সাহিত্যিকের লেখায়ও এ শব্দের ব্যবহার এ অর্থ হতে দেখা যাবে না। এখানে আমরা দু' তিনটি আরবী প্রাচীন ও প্রমাণিক অভিধান থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি ঃ

আল-জাওহারী তাঁর অভিধানে লিখেছেন ঃ

وَ دَعَوْتُ فُلاَنًا اَىْ صِحْتُ بِهِ وَاسْتَدَعْتُهُ وَ دَعَوْتُ اللّٰهَ لَهٗ وَ عَلَيْهِ دُعَاءً وَّالدَّعْوَةُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ وَالدُّعَاءُ وَاحِدُ الْاَدْعِيَّةِ -

আমি অমুক ব্যক্তিকে ডেকেছি, মানেঃ তার নাম করে আওয়াজ দিয়েছি, তাকে আহবান করেছি। তার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করেছি। তার ওপর বদ্‌দো'আ করেছি। দাওয়াত মানে একবার ডাকা। আর দো'আ হলো এক বচনের শব্দ। এর বহু বচন داعية দো'আসমূহ।

এখানে 'দো'আ' শব্দের ভিন্ন রূপ ও প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। সবক্ষেত্রেই অর্থ হলো প্রার্থনা, ডাকা, আহবান করা।

আর القاموس এ বলা হয়েছে ঃ

اَلدُّعَاءُ اَالرَّغْبَةُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى دَعَاهُ دُعَاءً وَّ دَعْوٰى وَلَهُمُ الدَّعْوَةُ عَلٰى غَيْرِ هِمْ اَىْ يُبْدَ ابِهِمْ فِىْ الدُّعَاءِ وَتَدَا عُوْا عَلَيْهِمْ وَتَجَمَّعُوْا وَ دَعَاهُ سَاقَهُ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاعِى اللّٰهِ وَيَطْلُقُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ الخ -

দো'আ মানে আল্লাহ্‌র দিকে নিষ্ঠাপূর্ণ আগ্রহ, ঝোঁক প্রবণতা। তাঁকে ডাকো যেমন ডাকা দরকার। অপরের ওপর তাদের জন্য দাওয়াত অর্থাৎ দো'আ তাদের থেকেই শুরু করা হবে। তাদের ডাকো, মানে ঃ তাদের একত্রিত করো। নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র (দিকে) আহবানকারী। মুয়াযযিনকেও داعى আহবানকারী বলা হয়।

القيومي তাঁর الصباح الصنير গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

دَعَوْتُ اللّٰهِ اَدْعُوْهُ دُعَاءً اِبْتَهَلْتُ اِلَيْهِ بِالسُّوَالِ وَ رَغَيْبُ فِيْمَا عِنْدَهُ مِنَ الْخَيْـ

وَدَعَوْتُ زَيْدًا نَادَيْتُهُ وَطَلَبْتُ اِقْبَالَهُ وَ دَعَا الْمُؤَذِّنُ النَّاسَ اِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ دَاعِى اللّٰهِ وَالْجَمْعُ دُعَاةٌ وَ دَاعُوْنَ مِثْلَ قَاضِىْ وَقُضَاةٌ وَقَاضُوْنَ وَالنَّبِىُّ دَاعِى الْخَلْقِ اِلَى التَّوْحِيْدِ وَ دَعَوْتُ الْوَلَدَ زَيْدًا وَبِزَيْدِ اِذَا سَمَّيْتُهُ بِهٰذَا الْاِسْمِ -

আমি আল্লাহ্কে ডাকলাম মানে ঃ তাঁর নিকট আমি দো'আ করি যেমন করে দো'আ করতে হয়; তাঁর নিকট প্রার্থনা করে কান্নাকাটি করলাম, তাঁর নিকট যে মহান কল্যাণ রয়েছে তার জন্যে নিষ্ঠার সঙ্গে আগ্রহী হলাম। যায়দকে ডাকলাম মানে আওয়াজ দিলাম, তাকে (আমার দিকে) ফিরতে বললাম। মুয়াযযিন লোকদেরকে নামাযের দিকে ডাক দিয়েছে। অতএব সে আল্লাহ্র (দিকে) আহ্বানকারী। এরই বহুবচন হলো دعاة وداعون যেমন কাযী। এর বহুবচন قضاة ও قاضون আর নবী সমস্ত মানুষকে তওহীদের দিকে আহবানকারী।

তেমনি ছেলেকে যায়দ নাম রেখে যায়দ বলে ডাকলাম।

মোটকথা আরবী অভিধানের কোনো কিতাবেই الدعا (দো'আ) মানে العبادة (ইবাদত) লিখিত হয়নি।

অবশ্য আল্লামা ইবনুল হাজার বলেছেন ঃ

وَيُطْلَقُ الدُّعَاءُ اَيْضًا عَلَى الْعِبَادَةِ -

দো'আ শব্দটি ইবাদত অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কিন্তু তা নিশ্চয়ই এ শব্দের আসল ও প্রত্যক্ষ অর্থ নয়, পরোক্ষ অর্থ হবে। শায়খ আবুল কাশেম আল-কুশাইরী লিখেছেন ঃ

কুরআনে الدعا শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ

اَلثَّنَاءُ اَلنِّدَاءُ اَلْقَوْلُ اَلسُّوَالُ اَلاِسْتِغَاثَةُ اَلْعِبَادَةُ - (الاسماء الحسنى)

ইবাদত, কাতর ফরিয়াদ, প্রার্থনা, কথা, আওয়াজ, ধ্বনি, প্রশংসা ইত্যাদি।

আল্লামা তাকীউদ্দীন আসসুবকী লিখেছেন ঃ

اَلاَوْلٰى حَمْلُ الدُّعَاءِ فِى الْاٰيَةِ عَلٰى ظَاهِرِهِ -

তা সত্ত্বেও এ আয়াতে 'দো'আ' শব্দের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম।

কেননা الدعا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যত আয়াতে তার কোথাও এমন কোনো কারণ দেখা যায় না, যার দরুন শব্দটির আসল ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের পরিবর্তে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা দরকারী হতে পারে। কুরআনের সব তাফসীরকারই এই মত পোষণ করেছেন। কাজেই কুরআনের ব্যবহৃত 'দো'আ'' শব্দের ইবাদত অর্থ করা এবং এই সুযোগে আল্লাহ ছাড়া অন্য শক্তির নিকট 'দো'আ' করাকে জায়েয মনে করা চরম বাতুলতা এবং সুস্পষ্ট বিদয়াত ছাড়া আর কিছুই নয় ঃ কুরআনের আয়াত ঃ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ঃ

অধিকাংশ মুফাসসিরই এর মানে বলেছেন ঃ

وَحِّدُوْنِىْ وَاعْبُدُوْنِىْ اَتَقَبَّلُ عِبَادَتَكُمْ وَاغْفِرْلَكُمْ وَاُجِيْبُكُمْ وَ اُثِيْبُكُمْ - فتح البيان

তোমরা আমাকে 'এক' বলে মানো, আমারই ইবাদাত করো, আমি তোমাদের ইবাদত কবুল করবো, তোমাদের ক্ষমা করবো, তোমাদের দো'আর জবাব দেবো এবং তোমাদের সওয়াব দেবো।

এ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্‌র নিকট বান্দার ইবাদত ও দো'আ কবুল হওয়া এবং গুনাহ্‌র ক্ষমা লাভ করা আল্লাহ্‌কে সর্বতোভাবে এক ও একক বলে স্বীকার করার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এজন্যে অন্য কোনো শর্ত নেই। এছাড়া আরো কোনো শর্ত আরোপ করাই হলো বিদয়াত।

কুরআনের আয়াত ঃ

وَ لَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ -

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখছেন ঃ

اِنَّ الْمُرَادَ بِالدُّعَاءِ فِىْ هٰذَا الْاٰيَةِ طَلَبُ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَضَرَّةِ يَعْنِىْ لَوِ اشْتَغَلْتَ بِطَلَبِ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَضَرَّةِ مِنْ غَيْرِ اللّٰهِ فَاَنْتَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ لِاَنَّ الظُّلْمَ عِبَارَةٌ عَنْ وَضْعِ الشَّيْءِ فِىْ غَيْرِ مَوْضَعِهٖ فَاِذَا كَانَ مَاسَوَى الْحَقِّ مَعْزُوْلًا عَنِ التَّصَرُّفِ كَانَتْ اِضَافَةُ التَّصَرُّفِ اِلٰى مَاسَوٰى الْحَقِّ وَضْعًا لِشَّيْءِ فِىْ غَيْرِ مَوْضَعِهٖ فَيَكُوْنَ ظُلْمًا -

আয়াতের 'দো'আ' শব্দের অর্থ হলো উপকার পেতে চাওয়া, ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাওয়া। আর আয়াতের অর্থ হলো ঃ তুমি যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নিকট উপকার বা ক্ষতির জন্যে প্রার্থনায় মনোনিবেশ করো, তাহলে তুমি জুলুমকারী হবে। কেননা জুলুম বলা হয় কোনো জিনিসকে তার আসল

জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় স্থাপন করা। আর আল্লাহ ছাড়া যখন কারোই কোনো ক্ষমতা নেই, তখন কোনো প্রকার ক্ষমতা চালনাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি অর্পণ করা অন্য কারো ক্ষমতা চালাবার শক্তি আছে বলে মনে করা নিঃসন্দেহে জুলুম।

আর এই 'দো'আ' শব্দের প্রত্যক্ষ অর্থ 'ইবাদত' না হলেও দো'আ ও এক প্রকারের ইবাদত। অতএব তা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নিকট করা যেতে পারে না।

তাহলে আল্লাহ ছাড়া নানাভাবে নানা শক্তি ব্যক্তির নিকট যে দো'আ করা হয়, বিপদ মুক্তি ও দুনিয়ার উন্নতির জন্যে প্রার্থনা করা হয়, নিরাময়তা চাওয়া হয়, সেগুলো কি হবে? সেগুলোর যে সুস্পষ্ট শিরক হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং এ শির্ক হচ্ছে ইসলামের তওহীদী সুন্নাতের এক মহা বিদয়াত। কেননা একজন যে অপর একজনকে ডাকে, অপর একজনের নিকট দো'আ করে এমন এক কাজের জন্যে, যা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোই নেই— থাকতে পারে না। এভাবে ডাকার মানেই এই যে, সে তাকে অলৌকিক ক্ষমতার মালিক মনে করে, বিশ্বাস করে তার কিছু একটা করার ক্ষমতা আছে। তা মনে না করলে সে কিছুতেই তাকে ডাকত না, তার নিকট দো'আ করতো না। ফলে তার মনে তার নিকট কেবল দো'আ করেই ক্ষান্ত হয় না; শান্ত হয় না, বরং তার ইবাদত করতেও আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ে। আর এরূপ হচ্ছে সুস্পষ্ট শির্ক।

কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হলো ঃ

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ط وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - (الانعام : ١٧)

কোনো দুঃখ বা বিপদ যদি তোমাকে গ্রাস করে থাকে তবে তা (আল্লাহ্র মর্জীতেই হয়েছে মনে করতে হবে এবং তা) দূর করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমনিভাবে তুমি যদি কোনো কল্যাণ লাভ করে থাকো তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান।

অর্থাৎ এ কল্যাণ দান করার ক্ষমতাও তাঁরই রয়েছে এবং তাঁরই অনুগ্রহে তুমি এ কল্যাণ লাভ করেছ। তিনি ছাড়া এ কল্যাণ তোমাকে আর কেউই দিতে পারেনি। কেননা অন্য কারোই কিছু করার ক্ষমতা নেই, সামর্থ্য নেই।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ج وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ط
يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ - (يونس : ١٠٧)

আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোনো কল্যাণ দান করতে ইচ্ছে করেন, তাহলে তাঁর এই কল্যাণ দানকে প্রত্যাহার করতে পারে এমন কেউ নেই। তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়।

এ আয়াত দুটো— এমনিভাবে কুরআনের আরো ভূরি ভূরি আয়াত এবং রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ বিপদ দিতে পারে না, কেউ সে বিপদ দূরও করতে সক্ষম নয় আল্লাহ ছাড়া। অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া কেউ কল্যাণ করতে পারে না কারো। তিনি কারো কল্যাণ করতে চাইলে তা ফেরাতেও এবং সেই কল্যাণ থেকে তাকে বঞ্চিত রাখতেও পারে না কেউই। সব শক্তির একচ্ছত্র মালিক তো তিনিই। অতএব দো'আ একমাত্র আল্লাহ্র নিকটই করা কর্তব্য। কর্তব্য সব রকমের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে দো'আ করা, কর্তব্য সব রকমের কল্যাণ লাভের জন্যে দো'আ করা। এবং সেই দো'আ হবে সরাসরিভাবে আল্লাহ্র নিকট, অন্য কারো অসীলা দিয়ে বা দোহাই দিয়ে নয়, অন্য কারো মাধ্যমেও নয়। তওহীদ বিশ্বাসের ঐকান্তিক দাবিও হলো এই। কেননা আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নিকট দো'আ করার কোনো ফল নেই, নেই কোনো সার্থকতা। আল্লাহ তা'আলা এ পর্যায়ে আরো স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ج
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ - (الفاطر : ١٣-١٤)

আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা আর যারই নিকট দো'আ করো, তাদের কেউই একবিন্দু জিনিসের মালিক নয়। তা সত্ত্বেও যদি তোমরা তাদেরই ডাকো— তাদের নিকটই দো'আ করো, তবে তারা তো তোমাদের ডাকও শুনতে পারে না।

তোমাদের দো'আ আর যদি শুনতে পায়ও, তবু একথা চূড়ান্ত যে, তারা না দেবে তোমাদের ডাকের জবাব, না পারবে কবুল করতে তোমাদের দো'আ।

বস্তুত দো'আ যে কেবল আল্লাহ্র নিকটই করতে হবে খালেসভাবে অপর কারো দোহাই দিয়ে নয়, কাউকে তাঁর নিকট অসীলা বানিয়ে নয়, একথা কুরআন মজীদে উদ্ধৃত অসংখ্য দো'আ থেকেও আমাদের শিখান হয়েছে। কুরআনে উল্লিখিত যে কোনো দো'আই তার দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআনের বিশেষ কয়েকটি দো'আ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

কুরআনের প্রথম সূরা আল-ফাতিহায় উদ্ধৃত হয়েছে এই দো'আ ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -

হে আল্লাহ্ তুমিই আমাদের সরল সঠিক দৃঢ় পথ দেখাও— পরিচালিত করো সে পথে।

এরূপ দো'আ করতে শেখান হয়নি ঃ হে আল্লাহ্! অমুক পীরের অসীলায় আমাদের সরল সঠিক সুদৃঢ় পথ দেখাও।

সূরা আল-বাকারা'র শেষ আয়াত কয়টিও আল্লাহ্র শিখিয়ে দেয়া দো'আ। তাতে কোনো একটি কথা সরাসরিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট কিংবা কারো অসীলা ধরে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করার শিক্ষা দেয়া হয়নি। এই পর্যায়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দো'আও উল্লেখ্য। কাবা ঘর নির্মাণের সময় তিনি এবং হযরত ইসমাঈল (আ) দো'আ করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَاَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - (البقرة : ١٢٧ - ١٢٨)

হে আল্লাহ, তুমি আমাদের দো'আ কবুল করো। তুমি সব-ই শোনো, সব-ই জানো। হে আমাদের আল্লাহ তুমি আমাদের দুজনকে মুসলিম— তোমার অনুগত বানাও। আর আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন এক উম্মত জাগ্রত করো, যা হবে তোমার অনুগত। হে আল্লাহ্, তুমি আমাদের যাবতীয় ইবাদাত-বন্দেগীর— হজ্জ ও কুরবানীর নিয়ম-নীতি জানিয়ে দাও, আমাদের তওবা কবুল করো। কেননা তুমি তওবা কবুলকারী।

বস্তুত বান্দার মনে দুঃখ ও ব্যথা-বেদনার কথা কেবল আল্লাহ্র নিকট-ই বলা যেতে পারে, বলতে হবে কেবলমাত্র তাঁরই সমীপে। কেননা সে দুঃখ বেদনার সৃষ্টিও যেমন হয়েছে আল্লাহ্র মঞ্জুরীতে, তা দূর করার ক্ষমতাও

একমাত্র তাঁরই রয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আ) পুত্রহারা হয়ে তাঁর মর্মবেদনা পেশ করেছিলেন দুনিয়ার অপর কারো নিকট নয়, নয় কোনো পীর বা গদ্দীনশীনের নিকট; বলেছিলেন কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট। তাঁর তখনকার কথা উদ্ধৃত হয়েছে কুরআন মজীদে এ ভাষায় ঃ

اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَ حُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ -

আমি আমার দুঃখ-বেদনা এবং চিন্তা-ভাবনার কথা কেবল আল্লাহ্‌র নিকটই প্রকাশ করছি, পেশ করছি।

হযরত মূসা (আ)-এর দো'আ ছিল নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اِلَيْكَ الْمُشْتَكٰى وَ اِلَيْكَ الْمُسْتَعَانُ وَ بِكَ الْمُسْتَغَاثُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ وَ لَاحَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ -

আয় বারে আল্লাহ! তোমার জন্যেই সব প্রশংসা, সব অভিযোগ তোমারই নিকট, কেবল তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা, কেবল তোমার নিকটই ফরিয়াদ। কেবল তোমার ওপরই ভরসা। কেননা কোনো কিছু করার সামর্থ্য এবং ক্ষমতা ও শক্তি তুমি ছাড়া আর কারো নিকটই নেই।

আল্লাহ্ নিজেই হযরত জাকারিয়া এবং তাঁর স্ত্রীর প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَ يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا ط وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ -

(الانبياء : ٩٠)

তারা ছিল সব কল্যাণময় কাজে উৎসাহী, প্রতিযোগী ও তৎপর। তারা কেবল আমাকে ডাকত— আমারই নিকট দো'আ করতো আগ্রহ উৎসাহ এবং ভয়-আতংক সহকারে। আসলে তারা সব সময় আমার জন্যেই ভীত হয়ে থাকত।

স্বয়ং আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নীতিও ছিল তাই। কোনো ব্যক্তিক্রম ছিল না এ থেকে। বদরের যুদ্ধে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যাল্পতা দেখে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে দু'হাত তুলে দো'আ করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْنِىْ مَا وَعَدْتَنِىْ اَللّٰهُمَّ اِنْ تَهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِى الْاَرْضِ -

(احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذى بن عباس)

হে আল্লাহ্, তুমি আমার কাছে যে ওয়াদা করেছ তা আজ পূর্ণ করো। হে আল্লাহ! ইসলামের ধারক এই মুষ্টিমেয় বাহিনীকে যদি তুমি ধ্বংস করে দাও তাহলে যে দুনিয়ায় তোমার বন্দেগী করা হবে না।

এর-ই পর আল্লাহ্র আয়াত নাযিল হলো ঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ - (الانفال ٩)

তোমরা যখন তোমাদের আল্লাহ্র নিকট-ই ফরিয়াদ করলে, তখন তিনি তোমাদের জবাব দিলেন তোমাদের দো'আ ও ফরিয়াদ কবুল করে নিলেন।

এ আয়াত থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ফরিয়াদ যদি একান্তভাবে আল্লাহ্র নিকট করা হয়, কোনো মাধ্যম, অসীলা আর ওয়াস্তা ছাড়াই, তাহলেই তিনি দো'আ কবুল করেন, অন্যথায় তাঁর কোনো ঠেকা নেই কারো দো'আ কবুল করার। কেউ তাঁকে সেজন্যে বাধ্যও করতে পারে না। দো'আ কার কাছে করতে হবে সে কথা অধিক স্পষ্ট করে তোলবার জন্যে নবী করীম (স) ঘোষণা করেছেন ঃ

يَسْئَلُ اَحَدُ كُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتّٰى بِشَسْعِ نَعْلَيْهِ اِذَا اَنْقَطَعَ فَاِنَّهُ اِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ -

তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজের যাবতীয় প্রয়োজন কেবল আল্লাহ্র নিকট চাও। এমনকি কারও জুতার ফিতাও যদি ছিঁড়ে যায়, তবুও তাঁর নিকটই চাইবে। তিনি যদি না-ই দেন, তবে তা কেউই দিতে পারবে না।

আল্লাহ্র শিক্ষা এবং রাসূলেরও শিক্ষা এই যে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত বিপদের কালে ফরিয়াদ করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র নিকট এবং তাতে অন্য কাউকে অসীলা ধরা কিংবা কারো দোহাই দেয়ার এই শিক্ষা— ইসলামের এই সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। নবী-রাসূলগণই যদি নিজেদের সব ব্যাপারে কেবলমাত্র আল্লাহ্রই নিকট ফরিয়াদ করে থাকেন এবং এ ব্যাপারে আর কারো নিকট কোনো ইস্তেমদাদ (সাহায্য প্রার্থনা) না করে থাকেন, তাহলে আমরা সাধারণ মুসলমানরাই বা কেন অন্য কারো প্রতি মুখাপেক্ষী হবো, নির্ভরশীল হবো, কেন অন্য কাউকে অসীলা ধরবো ? অথচ এই নবী-রাসূলগণই তো আমাদের চিরন্তন আদর্শ। তাঁদের কাজও যেমন আমাদের পক্ষে অনুসরণীয়, তেমনি অনুসরণীয় তাঁদের কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতিও। বিশেষত আল্লাহ এসব

দো'আ শিক্ষা দিয়ে আমাদেরকেও অনুরূপ একান্তভাবে আল্লাহ মুখী হতে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটই দো'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

অবশ্য একথা অস্বীকার করা যাচ্ছে না যে, নবী করীমের জীবদ্দশায় তাঁকে অসীলা বানিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করেছেন তদানীন্তন মুসলমানেরা। হাদীসে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তা হলো রাসূলের জীবদ্দশায়, রাসূল নিজ একজন প্রার্থনাকারী হিসেবে লোকদের মাঝে উপস্থিত থাকা অবস্থায়। আর তা থেকে এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁকে 'অসীলা' বানিয়ে দো'আ করা জায়েয ছিল। কিন্তু রাসূলের ইন্তিকালের পর আর কোনো দিন সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে দো'আ-প্রার্থনায় অসীলা বানাননি। 'অসীলা' বানানো হয়নি এমন কোনো ব্যক্তিকে যে মরে গেছে এবং যে নিজে দো'আর অনুষ্ঠানে শরীক নেই। এই পর্যায়ে কুরআন মজীদের আরো দুটো আয়াত বিবেচ্য। সূরা সিজদায় আল্লাহ্র নেক বান্দাদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا - (السجدة : ١٦)

তাদের পার্শ্ব ও পৃষ্টদেশ সুখশয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে, তারা (তাদের আল্লাহ্র প্রতি) ভয় ও আশা পোষণ করেই ডাকতে থাকে তাদের আল্লাহ্কে।

এ আয়াতে يدعون ربهم خوفاو طمعا বাক্যাংশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি প্রকৃত যারা ঈমানদার তারা ভয় পায় একমাত্র আল্লাহ্কে, আশা পোষণ করে একমাত্র আল্লাহ্র প্রতিই, যিনি তাদের রব্ব। বিপরীত অর্থে তাঁরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয়ও করে না, কারো প্রতি কিছু আশাও পোষণ করে না। আর ভয়ের কারণ হলেও তাঁরা ডাকে কেবল আল্লাহ্কে, আল্লাহ্রই নিকট দো'আ প্রার্থনা করে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকটই প্রার্থনা করে না। অনুরূপভাবে কোনো কিছু পাওয়ার আশাও করে কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকট থেকে, সে জন্যেও দো'আ করে তাঁরই নিকট। আল্লাহ্র নিকট ছাড়া আর কারো কাছ থেকে কিছুই পাওয়ার আশা করে না তারা এবং কোনো কিছু পাওয়ার প্রয়োজন হলে তখন একমাত্র আল্লাহ্র নিকটই সেজন্যে দো'আ করে, প্রার্থনা করে।

তাছাড়া প্রথমাংশে বলা হয়েছে নামায পড়ার কথা, আর শেষাংশে বলা হয়েছে দো'আ করার কথা। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেন ঃ

إِنَّ الدُّعَاءَ وَالصَّلٰوةَ مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ فِى الْمَعْنٰى -

দো'আ ও নামায প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে একই জিনিস।

অর্থাৎ নামায যেমন আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্যে, কারো উদ্দেশ্যে পড়া হয় না, দো'আও তেমনি আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট করা যায় না।

আর দ্বিতীয় আয়াতটি হলো সূরা الزمر এর ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَاۤئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّه -

যে লোক আল্লাহ্র অনুগত— আল্লাহ্রই হুকুম পালনকারী, রাতের বেলা আল্লাহ্র জন্যে সিজদা করে, পরকালকে ভয় করে এবং কেবল আল্লাহ্র রহমতেরই আশা করে, তার পরিণতি কি মুশরিক ব্যক্তিদের মতো হতে পারে?

তার মানে এসব গুণ যার আছে সে মুশরিক নয়, সে তওহীদবাদী। আর যার এসব গুণ নেই, নেই এর কোনো একটি গুণও, সে-ই মুশরিক হয়ে যাবে প্রকৃত ব্যাপারের দিক দিয়ে। যেমন কেউ যদি আল্লাহ্র অনুগত না হয়ে অনুগত হয় আল্লাহ্র সৃষ্ট কোনো শক্তির— যে লোক পরকালকে ভয় করে না কিংবা যে লোক তার আল্লাহ্র রহমতের আশা করে না বা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য কারো রহমত ও অনুগ্রহ দৃষ্টি লাভের আশা পোষণ করে— কুরআনের এ আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী সে-ই মুশরিক হবে। অতএব আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা কুরআনের দৃষ্টিতে কিছুতেই জায়েয হতে পারে না।

এ আলোচনার শেষ পর্যায়ে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ)-এর দু-তিনটি কথা এখানে প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করা জরুরী মনে করছি। তিনি তাঁর গ্রন্থ غنية الطالبين -এর শুরুতেই লিখেছেন ঃ

সব প্রশংসা আল্লাহ্র-ই জন্যে, যাঁর প্রশংসা সহকারে সব কিতাব-ই শুরু করা হয় এবং যাঁর যিকির করে সব কথা শুরু করতে হয়। তাঁরই প্রশংসার দৌলতে জান্নাতী লোকেরা জান্নাত পাবে, তিনিই এমন সত্তা যে তাঁর নাম উচ্চারণ করলে সব রোগ নিরাময় হয়, তাঁরই নামে সব চিন্তা, দুঃখ ও বিপদ দূর হয়ে যায়। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দকালে তাঁরই দরবারে কাতর কণ্ঠে কাঁদ কাঁদ স্বরে দো'আ করা হয়। তাঁর জাত-ই এমন যে, নানা বুলি ও নানা ভাষায় হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত দো'আ প্রার্থনাকারীর ডাক তিনি শুনেন, বিপদগ্রস্থ কাতর মানুষের দো'আ তিনিই কবুল করেন।

তিনি তাঁর গ্রন্থ فتح الغيب এ লিখেছেন ঃ

আমাদের কান্না-কাটা, আমাদের দো'আ এবং সব অবস্থায় আমাদের রুজু হতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই নিকট, যিনি আমাদের পরোয়ারদিগার, আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের রিযিকদাতা। তিনি খাওয়ান, তিনিই পান করান, তিনিই উপকার দেন, তিনিই মুহাফিজ, তিনিই নিগাহ্‌বান। আমাদের জীবন তাঁরই হাতে।

"অতএব তোমার প্রার্থনা হবে এবং নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্যে ডাকবে এক আল্লাহ্‌কেই, আল্লাহ্‌রই নিকটে, তিনি একাই তোমার দাতা, তিনি-ই তোমার লক্ষ্য হবেন।"

"যে লোক নিজেরই মতো কোনো মাখলুকের ওপর ভরসা করে, সে অভিশপ্ত।" (غنية الطالبين)

শায়খ জিলানী মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকা অবস্থায় তাঁর পুত্র আবদুল ওহাব তাঁকে বললেন ঃ "আমাকে এমন কিছু অসীয়ত করুন, আপনার পরে যা অনুসরণ করে আমি চলবো, আমল করবো"।

তখন তিনি বললেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَلَا تَخَفْ اَحَدٌ سَوَى اللّٰهِ وَلَا تَرْجُ اَحَدًا سَوَى اللّٰهِ وَكُلَّ الْحَوَائِجِ اِلَى اللّٰهِ وَلَا تَعْتَمِدْ اِلَّا عَلَيْهِ وَاطْلُبْهَا جَمِيْعًا مِنْهُ وَلَا تَثِقْ بِاَحَدٍ غَيْرِ اللّٰهِ اَلتَّوْحِيْدَ اَلتَّوْحِيْدَ اَلتَّوْحِيْدَ عَلَيْهِ اِجْمَاعُ الْكُلِّ -

(فتوح الغيب ص ٩-٣-٣١٠ مطبع محمدی لاهور)

আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলাই তোমাদের কর্তব্য; আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট কিছু চাইবে না— কারো কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করবে না। সব প্রয়োজনকেই এক আল্লাহ্‌র ওপরই সোপর্দ করে দেবে। সেই এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট কিছুমাত্র ভরসা করবে না, নির্ভরতা গ্রহণ করবে না। সব কিছু কেবল তাঁরই নিকট থেকে পেতে চাইবে। আল্লাহ ছাড়া কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করবে না। তওহীদকেই ধারণ করবে, তওহীদকেই ধারণ করবে, তওহীদকেই ধারণ করবে। সকলেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত।

এ পর্যায়ে শেষ কথা এই যে, দো'আ কবুলকারী যদি একমাত্র আল্লাহ্ই হয়ে থাকেন, আর তিনি-ই যদি সরাসরি তাঁরই নিকট দো'আ করতে বলে থাকেন, তাহলে অন্য কারো নিকট দো'আ করা, দো'আয় অন্য কাউকে অসীলা বানানো আল্লাহ্র ওপর খোদকারী ছাড়া আর কিছু নয়। যারা তা করতে বলে তারা শুধু বিদয়াতীই নয়, তারা সুস্পষ্টরূপে শির্ক-এ লিপ্ত— শির্ক প্রচারকারী তারা। ইসলামের তওহীদী আকীদায় শির্ক-এর আমদানী করে।

বস্তুত ইসলামের ঐকান্তিক দাবি হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেই মা'বুদ ও (অলৌকিকভাবে) প্রয়োজন পূরণকারী বলে মেনে নিতে সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করবে এবং কোনোরূপ শরীকদারী ছাড়াই একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই অনন্য মা'বুদ হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করবে। এই হচ্ছে প্রকৃত তওহীদী আকীদা এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রথম অংশ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর তাৎপর্য। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহ তা'আলার রাসূল মানবে। অর্থাৎ জীবন যাপনে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, তা জানবার সর্বশেষ একমাত্র ব্যক্তি হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (স)। তাই জীবন যাপনের অপরাপর নিয়ম ও পদ্ধতিকে— যা হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রচারিত নয় তা-ও মেনে নিতে অস্বীকার করতে হবে। কলেমার দ্বিতীয় অংশের এই হচ্ছে তাৎপর্য।

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণও তাঁদের উম্মতদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, উত্তরকালে তারা গোমরাহ হয়ে শির্কে নিমজ্জিত হয়েছে। এই কারণে হযরত মুহাম্মদ (স) কালেমার এই উভয় পর্যায়ে বৈপরীত্য শির্ক ও বিদয়াতের গোমরাহীতে নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কেননা তার কোনো একটি দিক দিয়েও শির্কে নিমজ্জিত হলে নিঃসন্দেহে জাহান্নামে যেতে হবে।

আইন পালনের শির্ক -এর বিদয়াত

ইসলামের তওহীদী আকীদায় আল্লাহ্‌র একত্ব ও অনন্যতা স্বীকৃত যেমন বিশ্বসৃষ্টি, লালন-পালন, রিযিকদান এবং দো'আ ও ইবাদত পাওয়ার অধিকার প্রভৃতির ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে মানুষের বাস্তব জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে নিরংকুশভাবে আনুগত্য করে চলতে হবে কেবল এক আল্লাহ্‌কেই। মানুষের নিকট এই আনুগত্য পাওয়ার একমাত্র অধিকার হচ্ছে আল্লাহ্‌র, আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই এই অধিকার নেই, যেমন সমগ্র বিশ্বলোক— বিশ্বলোকের অনু-পরমাণু পর্যন্ত আনুগত্য করে চলেছে এক আল্লাহ্‌র। পরন্তু নিখিল জগতের সবকিছুর ওপর যেমন আইন বিধান চলে এক আল্লাহ্‌র, তেমনি মানুষের জীবনেও সর্বদিকে ও বিভাগে আইন জারী করার নিরংকুশ অধিকারও একমাত্র আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এই মানুষের ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই আইন জারী করার অধিকার নেই। মানুষও পারে না আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন মেনে নিতে ও পালন করতে। করলে তা হবে সম্পূর্ণরূপে অনধিকার চর্চা, অন্যায় এবং অনাচার; তা হবে সুস্পষ্টরূপে শির্ক।

বস্তুত মানুষের জন্যে আইন বিধান তিনিই রচনা করবেন, মানুষ তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবল তাঁরই দেয়া আইন পালন করে চলবে। তাঁর দেয়া আইন-বিধানের বিপরীত কোনো কাজ কিছুতেই করবে না। কেননা মানুষের ওপর হুকুম করার অন্য কথায়— আইন দেয়ার ও জারী করার অধিকার তো আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই, থাকতে পারে না। এ বিষয়ে মূল কথা হলো; আপনি কাকে এই অধিকার দিচ্ছেন যে, সে আপনার জন্যে আইন তৈয়ার করবে, আর আপনি তা পালন করবেন— করতে প্রস্তুত হবেন আর কাকে এই অধিকার আপনি দিচ্ছেন না। যদি আপনি একমাত্র আল্লাহ্‌কে এই অধিকার দেন, তাহলে আল্লাহ্‌র তওহীদ বিশ্বাস পূর্ণ হলো, আর যদি ওপর কাউকে— কোনো ব্যক্তিকে, কোনো প্রতিষ্ঠানকে— এই অধিকার দেন বা অধিকার আছে বলে মনে করেন, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে-ই হলো আপনার আল্লাহ, আর আপনি তার বান্দা— দাস। কিন্তু এই শেষোক্ত অবস্থা নিঃসন্দেহে শির্ক-এর অবস্থা। একথাই ঘোষিত হয়েছে কুরআন মজীদে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ঃ সূরা আল-আন্‌আমের আয়াতে রাসূলে করীমের জবানীতে বলা হয়েছে ঃ

مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ط اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ - (الانعام ৫৭)

তোমরা যে জন্যে খুব তাড়াহুড়া করছো তা তো আমার কাছে নেই। সব ব্যাপারেই ফয়সালা করার ও হুকুম দেয়ার অধিকার কারোরই নেই— এক আল্লাহ ছাড়া। তিনিই সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালা দানকারী।

সূরা ইউসূফের আয়াত হলো ঃ

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ -

হুকুমদানের— আইন বিধান রচনার চূড়ান্ত অধিকার কারোরই নেই এক আল্লাহ্ ছাড়া। সেই আল্লাহ-ই ফরমান দিয়েছেন যে, হে মানুষ তোমরা কারোরই দাসত্ব করবে না, করবে কেবলমাত্র সেই আল্লাহ্র।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ

اِنَّ الْحُكْمَ وَالتَّصْرِيْفَ وَالْمَشِيْئَةَ وَالْمُلْكَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ وَقَدْ اَمَرَ عِبَادَهٗ قَاطِعَةً اَنْ لَّا يَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ - (تفسير القران العظيم :ج-٤، ص ٢٨)

নির্দেশ দান, হস্তক্ষেপ করণ, ইচ্ছা করা ও মালিকানা বা নিরংকুশ কর্তৃত্ব এই সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। তিনি তাঁর বান্দাদের চূড়ান্তভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই ইবাদাত-বন্দেগী বা দাসত্ব করবে না।

উপরোক্ত এ আয়াতে একদিকে বলা হয়েছে হুকুম দানের কথা, অপর দিকে দাসত্বের কথা। যার হুকুম পালন করা হয়, কার্যত দাসত্ব তারই করা হয়। আর কারো হুকুম-আইন, আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম পালন করা, মেনে নেয়া ও অনুসরণ করাই হচ্ছে শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদত। কাজেই এ ব্যাপারে আল্লাহ্কেই একমাত্র আইনদাতা বলে মেনে নেয়া তওহীদেরই আকীদা এবং আমল। আর এই দিক দিয়ে অপর কাউকে এ অধিকার দিলে হবে সুস্পষ্ট শিরক। নিম্নোক্ত আয়াতও ঠিক এ কথাই ঘোষণা করেছে ঃ

مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا - (الكهف ২৬)

লোকদের জন্যে এক আল্লাহ ছাড়া কোনো 'অলী' নেই এবং তিনি তাঁর হুকুম রচনা ও জারী করার ক্ষেত্রে কাউকেই শরীক করেন না।

এখানে ولى 'অলী' শব্দটি ঠিক 'আদেশদাতা' 'আইন-বিধানদাতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং আল্লাহ্ ছাড়া কেউ 'অলী' নেই— এর মানে, আল্লাহ্ ছাড়া আদেশদাতা, আইন-বিধানদাতা ও প্রভুত্ব কর্তৃত্বসম্পন্ন আর কেউ নেই, কেউ হতে পারে না। এ কথাই এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ কথাকে অধিক চূড়ান্ত করে বলা হয়েছে আয়াতের শেষাংশে এই বলে যে, তাঁর হুকুমের ক্ষেত্রে তিনি কাউকেই শরীক করেন না। অর্থাৎ আইন-বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহ এক, একক ও অনন্য। তিনি আর কাউকেই নিজস্বভাবে মানুষের ওপর হুকুমদানের ও আইন জারী করার অধিকার দেননি। সেই সঙ্গে মানুষকেও অধিকার দেয়া হয়নি অপর কাউকে হুকুমদাতা বলে মেনে নেয়ার এবং আর কারো দেয়া আইন পালন করার। মানুষ যদি কাউকে এরূপ অধিকার দেয়, তবে আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা হয়। তা হবে অনধিকার চর্চা। কেননা আল্লাহ্র সৃষ্টির ওপর আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেই এই অধিকার তিনি নিজে দেন নি; এখন আল্লাহ্র সৃষ্টির ওপর অপর কারো হুকুমদানের এবং হুকুমদাতা বলে মেনে নেয়ার কার অধিকার থাকতে পারে? আল্লাহ তো শির্ক-এর গুনাহ্ কখনো মাফ করেন না। অন্যান্য গুনাহ্র কথা স্বতন্ত্র। ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ – (النساء : ١١٦)

আল্লাহ্র সাথে শির্ক হলে তিনি তা মাফ করেন না। এছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন।

বস্তুত ইসলামের তওহীদী আকীদায় এ-ই হচ্ছে সুন্নাত। কুরআন মজীদের ত্রিশ পারা কালাম এই আকীদারই বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। নবী করীম (স) এই আকীদাই প্রচার করেছেন, এ আকীদার ভিত্তিতেই তিনি চালিয়েছেন তাঁর সমগ্র দাওয়াতী ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। তখনকার সময়ের লোকেরা একথাই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর প্রচারিত আকীদা থেকে এবং আকীদা গ্রহণ করেই তাঁরা মুসলিম হয়েছিলেন। এক কথায় এই হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা এবং এরই ভিত্তিতে নবী করীম (স) গড়ে তুলেছিলেন পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র।

এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ –

হুকুম আইন-বিধান রচনা ও জারী করার অধিকার কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট।

আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে লক্ষ্য করে হুকুম দিয়েছেন ঃ

إِنَّانَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا - فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَاتُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا - (الدهر : ٢٣ - ٢٤)

নিশ্চয়ই আমরা কুরআন নাযিল করেছি। অতএব আল্লাহ্র হুকুম পালনের মধ্যেই সবর করতে থাকো, তা বাদ দিয়ে কোনো গুনাহগার কিংবা কাফির ব্যক্তির আনুগত্য করো না, তার দেয়া হুকুম মেনো না।

কুরআন নাযিল করার কথা বলার পরই আল্লাহ্র হুকুম পালনে সবর করতে বলার তাৎপর্য এই যে, কুরআনই হলো আল্লাহ্র হুকুমপূর্ণ কিতাব। এ কিতাব মেনে চললেই আল্লাহ্র হুকুম মান্য করা হবে। আর তা পালনে সবর করার অর্থ আল্লাহ্র হুকুম পালন করেই ক্ষান্ত থাকা, তাছাড়া আর কারো হুকুম পালন না করা।

নবী করীম (স) নিজের ভাষায় বলেছেন ঃ

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

সৃষ্টির আনুগত্য করতে গিয়ে স্রষ্টার নাফরমানী করার কোনো অধিকার নেই কারো।

তার মানে, আনুগত্য মৌলিকভাবে কেবল আল্লাহ্রই প্রাপ্য মানুষের কাছে। মানুষ কেবল তাঁরই আনুগত্য করতে আদিষ্ট। কিন্তু যদি কোনো ক্ষেত্রে অন্য কারো আনুগত্য করতে হয়, অন্য কারো দেয়া আইন বিধান পালন করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে কি করা যাবে? রাসূলের এ কথাটুকুতে তারই জবাব রয়েছে। এখন এর তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করা যেতে পারে কেবলমাত্র একটি শর্তে আর সে শর্ত হলো এই যে, অন্য কারো আনুগত্য করা হলে তাতে যেন আনুগত পাওয়ার আসল ও মৌল অধিকার আল্লাহ্র নাফরমানী হয়ে না যায়। যদি তা হয় তাহলে কিছুতেই অন্য কারো আনুগত্য করা যেতে পারে না।

ইল্‌মে ফিকাহ্ও এই কথাই আমাদের সামনে পেশ করে নানাভাবে, নানা ভাষায়। উসূলুল ফিকহ্র কিতাব 'নূরুল আনওয়ার'-এ লিখিত হয়েছে ঃ

وَالَّذِىْ يُعْلَمُ مِنَ التَّوْضِيْحِ فِىْ ضَبْطِهَا اَنَّ لِلْحُكْمِ مُفْتَقِرٌ اِلَى الْحَاكِمِ وَالْمَحْكُوْمِ

عَلَيْـهِ وَالْمَحْكُوْمُ بِهِ فَـالْحَـاكِمُ هُوَ اللّٰـهُ تَعَـالٰى وَالْمَحْكُوْمُ عَلَيْـهِ هُوَا الْمُكَلَّفُ وَالْمَحْكُوْمُ بِهِ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ - (ص ٢٢٦)

তওজীহ্ কিতাবের বিশ্লেষণ থেকে যা জানা যায়, তা হলো এই যে, প্রত্যেকটি হুকুমের জন্যে (১) হুকুমদাতা, (২) যার প্রতি হুকুম দেয়া হয় এবং (৩) যে বিষয়ে হুকুম দেয়া হলো এই তিনটি জিনিস জরুরী। অতএব হুকুমদাতা হচ্ছে এক আল্লাহ্, হুকুম দেয়া হয়েছে শরীয়ত পালনে বাধ্য মানুষকে এবং হুকুম দেয়া হয়েছে শরীয়ত পালনের।

'তাওজীহ' কিতাবে আরো স্পষ্ট করে কথাটি বলা হয়েছে এভাবে ঃ

اَلْقِسْمُ الثَّانِىْ مِنَ الْكِتَابِ فِى الْحُكْمِ وَ يَفْتَقِرُ اِلَى الْحَاكِمِ وَهُوَا اللّٰـهُ تَعَالٰى لَاالْعَقْلُ - (ص : ٦٠٧)

কিতাবের দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা হবে হুকুম সম্পর্কে। হুকুম-এর জন্যে হুকমদাতা আবশ্যক, আর হুকমদাতা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক নয়।

বলা হয়েছে ঃ لَاحُكْمَ اِلَّا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِاِجْمَاعِ الْاَئِمَّةِ -

হুকুম কেবল আল্লাহ্রই হতে পারে। এ ব্যাপারে সব ইমামই সম্পূর্ণ একমত।

কুরআন, হাদীস ও ইজমা— ইসলামী শরীয়তের এই তিনটি বুনিয়াদী দলীল থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়। তা হচ্ছে এই যে, হুকুম দেয়ার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। আল্লাহ্র তওহীদে বিশ্বাসী লোক এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেই হুকমদাতা, আইন বিদানদাতা ও জায়েয-নাজায়েয নির্ধারণকারী হিসেবে মানতে পারে না। মানলে তা হবে শির্ক। রাসূলে করীমের পরে খুলাফায়ে রাশিদুনের আমলেও মুসলমানদের এই ছিল আকীদা এবং এই ছিল তাঁদের আমল। হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত আবু মূসা আশ'আরীর নিকট ইসলামী শাসন কার্য পরিচালন সম্পর্কিত পলিসি নির্ধারণকারী এক চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْقَضَا فَرِيْضَةٌ وَمُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبِعَةٌ -

শরীয়ত ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা কায়েম করা এক অকাট্য দ্বীনী ফরয এবং অনুসরণযোগ্য এক সুন্নাত।

কিন্তু উত্তরকালে মুসলিম সমাজে তওহীদের এই মৌলিক ভাবধারা— যাকে আমাদের ভাষায় বলতে পারি তওহীদ আকীদার রাজনৈতিক তাৎপর্য— স্তিমিত হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এমন একদিনও আসে, যখন মুসলমানরা দ্বীন-ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতিকে দুই বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন জিনিস বলে মনে করতে শুরু করে এবং এই মনোভাবের ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। কেবল আল্লাহ্র হুকুমই নয়, সেই সঙ্গে ধর্মনেতা তথা পীর সাহেবের হুকুম পালন করাও দরকারী বলে মনে করে। জীবনের বৃহত্তম দিক— রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কাজকর্মকে ইসলামের আওতার বাইরে বলে মনে করে। সেখানে মেনে নেয়া হয় রাজনীতিক ও শাসকদের বিধান। নামাযের ইমামতি ধার্মিক লোকই করবে বলে গুরুত্ব দেয়া হয়, কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ফাসিক-ফাজির তথা ইসলামের দুশমনদের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিতেও এতটুকু দ্বিধাবোধ করা হয় না—একে ইসলামের বিপরীত কাজ মনে করা হয় না। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি জীবনে যারা ধর্মকে খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করে— পালন করা দরকার মনে করে, তারাই যখন রাজনীতি করতে নামে, তখন সেখানে করে চরম গায়র-ইসলামী রাজনীতি, চরম শরীয়ত বিরোধী সামাজিকতা এবং সুস্পষ্ট হারাম উপায়ে লেন-দেন ও ব্যবসায় বাণিজ্য। কেননা এ সব ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্কে হুকুম দেয়ার অধিকার দিতে রাজি হয় না, আল্লাহ্র হুকুম এ ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে তা মনে করতে পারে না। ধর্ম ও রাজনীতি কিংবা ধর্ম ও অর্থনীতি ইত্যাদিকে বিচ্ছিন্ন পরস্পর সম্পর্কহীন মনে করাই হলো আধুনিক সেকিউলারিজম-এর মূল কথা এবং ইসলামের তওহীদী আকীদার সামাজিক-রাজনৈতিক দিকে এই হলো এক মারাত্মক বিদয়াত। এই পর্যায়ে এসে সমাজের ধার্মিক লোকেরা আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য পীর ধরা ফরয বলে প্রচার করে। আর অপর শ্রেণীর লোকেরা রাজতন্ত্র, বাদশাহী ও ডিকটেটরী শাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত ইসলাম সম্মত মনে করতে শুরু করে। ফাসিক-ফাজির নেতা, রাজা-বাদশাহ ও ডিকটেটরকে বাস্তব জীবনে আইন-শাসনের ক্ষেত্রে ঠিক আল্লাহ্র স্থানে বসিয়ে দেয়। তারা এ জন্যে রাসূলের হাদীস ঃ السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ। 'সুলতানরা আল্লাহ ছায়া সদৃশ' প্রচার করে। রাজা-বাদশাহ ও ফাসিক ফাজির নেতৃবৃন্দকে মানব সমাজের ওপর আল্লাহ্র সমান মাননীয় করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মুসলমানদের বাস্তব আনুগত্যের ক্ষেত্রে ধর্মীয় দিক দিয়ে আলিম ও পীরকে এবং জাগতিক ব্যাপারে রাজা-বাদশাহ, রাজনৈতিক নেতা ও ডিকটেটরকে আল্লাহ্র সমতুল্য করে তুলেছে। আল্লাহ যেমন জনগণের ওপর নিজস্ব আইন বিধান জারী করেন, তেমনি ধর্মনেতা বা পীর-বুজুর্গ এবং রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্রকর্তাদেরও নিজেদের মর্জীমত আইন বিধান জারী করার

অধিকার আছে বলে মনে করেছে। ইসলামী ধর্ম ব্যবস্থায় এবং বৈষয়িক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমনিভাবেই এক মহা বিদয়াতের অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়েছে। আর তারই ফলে আল্লাহ্‌র তওহীদী ধর্মে ধর্মনেতার তথা পীর-বুজুর্গ লোকদের এবং রাজনীতি ও সমাজ সংস্থায় রাজনীতিকদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্বীকার করে শির্‌ক-এর এক অতি বড় বিদয়াত দাঁড় করিয়ে নিয়েছে। পরবর্তীকালে ক্রমশ এমন একদিন এসে পড়ে, যখন রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্রকর্তাদের রচিত আইন বিধান পালন করাকে আল্লাহ্‌র আইন পালনের মতোই কর্তব্য এবং পীরের হুকুম মানা আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের সমান কর্তব্য বলে মনে করতে থাকে। আর তাদের নাফরমানীকে আল্লাহ্‌র নাফরমানীর মতোই গুনাহের কাজ বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে।[১] অথচ শরীয়তের নির্দেশ মুতাবিক তাদের কর্তব্য ছিল এক ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা এবং সেজন্যে ইসলামী আদর্শবাদী ইমাম তথা রাষ্ট্র চালক নিয়োগ করা। কুরআনের আয়াত انى جاعل فى الارض خليـفـة "আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাব"— এর ভিত্তিতে ইমাম কুরতবী লিখেছেন ঃ

هٰذِهِ الْاٰيَةُ اَصْلٌ فِىْ نَصْبِ اِمَامٍ وَخَلِيْفَةٍ يُسْمَعُ لَهٗ وَيُطَاعُ لِتَجْتَمِعَ بِهٖ كَلِمَةٌ وَ تَنْفُذَ بِهٖ اَحْكَامُ الْخَلِيْفَةِ وَ لَاخِلَافَ فِىْ وُجُوْبِ ذٰلِكَ بَيْنَ الْاُمَّةِ وَ لَا بَيْنَ الْاَئِمَّةِ فَدَلَّ عَلٰى وُجُوْبِهَا - وَ اِنَّهَا رُكْنٌ مِّنْ اَرْكَانِ الدِّيْنِ الَّذِىْ بِهٖ قِوَامُ الْمُسْلِمِيْنَ -

ইমাম ও খলীফা নিয়োগ কর্তব্য— যার কথা শোনা হবে ও আনুগত্য করা হবে, যেন জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও খলীফার আইন আদেশ পুরোপুরি জারী হয়— এ পর্যায়ে উপরোক্ত আয়াতই মূল দলীল। উম্মত ও মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। অতএব এ কাজ যে ওয়াজিব তা প্রমাণিত হলো। প্রমাণিত হলো যে, এরূপ একজন ইমাম বা খলীফা নিয়োগ করা সেই দ্বীন ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ, যে দ্বীন হলো মুসলমানদের সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনের ভিত্তি।

আল্লাহ্‌র হুকুম ও আইন ছাড়া অন্য কারো আইন পালন করা যে শির্‌ক, পূর্বের আলোচনায় শরীয়তের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে তা প্রমাণিত হয়েছে।

---

১. ঠিক এ কারণে এক সঙ্গে দু'জন ইমাম— রাষ্ট্রপ্রধান মেনে নেয়াও জায়েয নয়। একজন ধর্মীয় ইমাম— পীর ও একজন রাষ্ট্রীয় ইমাম— বাদশাহ বা ডিকটেটর মেনে নেয়া শরীয়ত বিরোধী। মুল্লা আলী লিখেছেন ঃ

ولايجوز نصب الامامين فى عصر واحد لانه يؤدى الى منازعات ومخاصمة مفضية الى اختلاف امرالدين والدنيا لمايشا هذ فى زماننا هذا - (شرح فقه اكبر : ص - ١٧٩)

কিন্তু আলিম নামধারী এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা জাহিল পীরদের ফেরেবে পড়ে কেবল আল্লাহ্কেই একমাত্র আইন বিধানদাতা বলে মানতে রাজি নয়। কেননা হুকুম আইনদাতা রূপে কেবল আল্লাহ্কেই যদি মানতে হয়, তাহলে 'হুযুর কিবলার' স্থান হবে কোথায় ? অতএব আল্লাহ্র সঙ্গে 'হুযুর কিবলাকে'ও হুকুম দেয়ার অধিকারী মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। এ জন্যে "এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম মানা শির্ক— "ইসলামের তওহীদী" আকীদাসম্মত এই কথার জবাবে নেহায়েত মূর্খের মতোই বলতে শুরু করে ঃ

"পাঠকগণ! একটু চিন্তা করুন— স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা-মক্তব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে, রাজনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন সমিতি, কমিটি ও সংস্থায়, নৌকা, স্টিমার, বাস, ট্রেন ইত্যাদি পরিচালনায় ও যাতায়াত প্রভৃতি অসংখ্য পার্থিব ও বৈষয়িক ব্যাপারে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে কি মানুষের গড়া কোনো আইন মেনে চলতে হয় না ? জি হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই হয়; তাতে আর সন্দেহ কি ? তাহলে কি আল্লাহ্কে একমাত্র হুকুমদাতা বলে মানতে হবে ? আমাদের পূর্বোক্ত দীর্ঘ আলোচনার আলোকে চিন্তা করলে আলিম নামধারী ব্যক্তির উপরোক্ত কথা যে কতখানি হাস্যকর তা যে কোনো লোকই বুঝতে পারেন। একে তো তিনি নিজেই বলেছেন ঃ "পার্থিব ও বৈষয়িক ব্যাপারে মানুষের গড়া আইন পালন করতে হয়।" নিতান্ত বৈষয়িক ব্যাপারেও যেসব বিষয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের কোনো বিধান বা নির্দেশ নেই, যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া অন্য কারো হুকুম মানা যাবে না— একথা আপনাকে কে বলেছে ? এখানে মূল কথা হলো মানুষের জীবনকে বৈষয়িক ও ধর্মীয়— এ দু'ভাগে ভাগ করাই আপনার মারাত্মক ভুল। ইসলামে এ বিভাগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। আতএব কেবল জাগতিক ব্যাপারেই নয়, নিছক ধর্মীয় ব্যাপার বলে আপনি যাকে মনে করেন, তাতেও আল্লাহ ছাড়া অন্যের হুকুম পালন করা যেতে পারে; কিন্তু বিনা শর্তে নয়, একটি বিশেষ শর্তের ভিত্তিতে। তাহলো সে হুকুম প্রথমত আল্লাহ্র হুকুম মুতাবিক হবে। আর দ্বিতীয়ত আল্লাহ্র হুকুমের বিপরীত কিছু হবে না এ শর্তের ভিত্তিতে যে-কোন ক্ষেত্রে যে কারোরই হুকুম পালন করা যেতে পারে। কেননা তা মূলত আল্লাহ্রই হুকুম। কিন্তু জনাব, হুযুর কিবলার হুকুমকে যে আল্লাহ্র হুকুমের মতোই বিনাশর্তে নির্বিচারে মানবেন, তা চলবে না, তাহলে সুস্পষ্টরূপে শির্ক হবে এবং আপনি সেই শির্কের অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকবেন।

রাজনীতি না করার বিদয়াত

রাজনীতিকে পরিত্যাগ করে, তার সাথে কোনোরূপ সম্পর্ক না রেখে চলা আর এক প্রকারের বড় বিদয়াত, যা বর্তমান মুসলিম সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে গ্রাস করে আছে। এ লোকদের দৃষ্টিতে রাজনীতি সম্পূর্ণ ও মূলগতভাবেই দুনিয়াদারীর ব্যাপার। দুনিয়াদার লোকেরাই রাজনীতি করে। আর যারাই রাজনীতি করে, তাদের দুনিয়াদার হওয়ার একমাত্র প্রমাণই এই যে, তাঁরা রাজনীতি করে। এই শ্রেণীর লোকদের মুখে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, তারা বলে বেড়ায় ঃ 'আমরা রাজনীতি করি না' কিংবা রাজনীতি অনেক দিন করেছি, এখন আর করি না" আবার কেউ কেউ বলে ঃ "আমরা ধার্মিক লোক, রাজনীতির সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।"

এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি যে বিদয়াত, তার কারণ এই যে, তা স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর আদর্শ, আকীদা ও কর্মনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলে করীম (স)-এর নবুয়্যতীর জিন্দেগীটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি রাজনীতি করেছেন, রাষ্ট্রের সাথে তাঁর কাজের সংঘর্ষ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সব বাতিল রাষ্ট্র ও গায়র-ইসলামী রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে পুরোপুরি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইসলামী আদর্শের রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাসূলের জীবদ্দশায় এবং তাঁর পরে এ রাজনীতি সাহাবায়ে কিরাম করেছেন, রাষ্ট্র চালিয়েছেন এবং রাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনরাও রাজনীতি করেছেন।

রাজনীতির কথা কুরআন মজীদে রয়েছে, রয়েছে হাদীসে, আছে এ দুয়ের ভিত্তিতে তৈরী ফিকাহ শাস্ত্রের মসলা-মাসায়েলে। কাজেই রাজনীতি করা সুন্নাত। ইসলামী আদর্শের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রাজনীতি সুন্নাত, ইসলামী আদর্শ মুতাবিক শুধু তা-ই নয়, তা হচ্ছে ইসলামের মূল কথা। দুনিয়ায় নবী প্রেরণের মূলেও রয়েছে জমিনের বুকে আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। নবীগণ দুনিয়ায় এ কাজ করেছেন পূর্ণ শক্তি দিয়ে, জীবন ও প্রাণ দিয়ে আর আধুনিক ভাষায় এ-ই হচ্ছে রাজনীতি।

আল্লাহ্র নিকট মানুষের জন্যে মনোনীত জীবন-ব্যবস্থা হচ্ছে একমাত্র ইসলাম, অন্য কিছু নয়। এই হচ্ছে আল্লাহ্র ঘোষণা ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ -

এর অর্থও তাই। আর এ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে মানব সমাজে আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক ইনসাফ কায়েম করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাঠিয়েছেন আম্বিয়ায়ে কিরামকে।

আল্লাহ নিজেই ইরশাদ করেছেন ঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ - (الحديد : ٢٥)

নিশ্চিই আমরা আমাদের নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছি অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে। তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব এবং ইনসাফের মানদণ্ড যেন লোকেরা হক্ ও ইনসাফ সহকারে বসবাস করতে পারে। আর দিয়েছি 'লৌহ'। এর মধ্যে রয়েছে বিপুল ও প্রচণ্ড শক্তি এবং জনগণের জন্যে অপূর্ব কল্যাণ।

এ আয়াত থেকে যে মূল কথাটি জানা যাচ্ছে, তা হলো, দুনিয়ার মানুষ সুষ্ঠু ও নির্ভুল ইনসাফের ভিত্তিতে জীবন যাপন করার সুযোগ লাভ করুক— এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ যাতে করে দুনিয়ায় সঠিক ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করতে সক্ষম হন, তার জন্যে রাসূলগণকে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রধানত দু'টো জিনিস দেয়া হয়েছে বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহ্‌র সরাসরি প্রেরণের নিদর্শন হিসেবে। তার একটি হলো মুজিযা— অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ, যা লোকদের সামনে নবী-রাসূলগণের নবুয়্যাত ও রিসালাতকে সত্য বলে প্রমাণিত করে দেয়। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম— আসমানী কিতাব, যা নাযিল করা হয়েছে মানুষের জীবন যাপনের বাস্তব বিধান হিসেবে। এ ছাড়া আরো দু'টা জিনিস দেয়া হয়েছে। একটি হলো 'মীযান' মানে মানদণ্ড, মাপকাটি; যার সাহায্যে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ও সত্য মিথ্যা প্রমাণ করা যায়। আল্লামা ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে 'মীযান' শব্দের ব্যাখ্যা হিসেবে লিখেছেন ঃ 'মীযান' মানে মুজাহিদ ও কাতাদার মতে العدل। 'সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফ'। আর তা হচ্ছে এমন এক 'সত্য, যা সুস্থ, অনাবিল ও দৃঢ় জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক থেকে প্রমাণিত।" আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে 'আল-হাদীদ'। 'হাদীদ' মানে চলতি কথায় 'লৌহ'। আর এর শাব্দিক অর্থ ইমাম রাগেবের ভাষায় ধারালো, তীক্ষ্ম, শক্তভাবে প্রভাব বিস্তারকারী জিনিস।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এসব বিভিন্ন অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এর অর্থ আমরা বুঝতে পারি প্রথমত লৌহ ধাতু, দ্বিতীয়ত এক শক্ত শানিত ও অমোঘ প্রভাব বিস্তারকারী ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী জিনিস। আর নবী-রাসূলের প্রসঙ্গে এর অর্থ অনায়াসেই বুঝতে পারি ঃ "জবরদস্ত শক্তি।" ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Coercive power অন্য কথায় 'রাষ্ট্রশক্তি।' নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র বিধানের ভিত্তিতে অত্যন্ত তীব্র তীক্ষ্ণ শক্তিসম্পন্ন ও অমোঘ কার্যকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতেন, তারই সাহায্যে লৌহ-নির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করে সমস্ত অন্যায় ও জুলুমের পথ বন্ধ করতেন, আর নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ওপর নিরপেক্ষ ইনসাফ কায়েম করতেন। কাজেই নবী-রাসূলগণকে যে ইনসাফ কায়েমের উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিল, খতমে নবুয়্যাতের পর সে ইনসাফ কায়েম করা এবং তারই জন্যে তীব্র শক্তি প্রভাবশালী রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত করা নবীর উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এ শক্তি অর্জন করতে চেষ্টা করা, এ শক্তি অর্জন করে তার সাহায্যে ইনসাফ কায়েম করাকেই আধুনিক ভাষায় বলা হয় রাজনীতি। এ কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে রাসূলে করীমের এক বাণীতে তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَيَزِعُ بِالسُّلْطٰنِ مَا لَا يَزِعُ بِالْقُرْاٰنِ –

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে এমন অনেক কাজই সম্পন্ন করেন, যা কুরআন দ্বারা তিনি করান না।[১]

তার মানে আল্লাহ্‌র চরম লক্ষ্য হাসিলের জন্যে কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র শক্তি অপরিহার্য। কুরআনকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তিকে প্রয়োগ না করলে কুরআন আপন শক্তির বলে মানব-সমাজে কার্যকর হতে পারবে না।

এ ছাড়া কুরআন মজীদে নির্দেশ রয়েছে ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ – (الشورى : ١٣)

১. কোনো কোনো মনীষীর মতে একথাটি হলো হযরত উসমান (রা)-এর, নবী করীম (স) এর নয়। হযরত উসমানের কথা হলেও হতে পারে, তিনি কথাটি রাসূলের নিকটই শুনেছিলেন হয়ত। আর তা না হলেও সাহাবীর কথারও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাও হাদীস হিসেবে গণ্য। সাহাবীগণ রাসূলে করীম (স)-এর নিকট থেকেই দ্বীন সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই পন্থাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার হুকুম তিনি দিয়েছিলেন নূহকে, আর অহীর সাহায্যে— হে মুহাম্মাদ— এখন তোমার দিকে পাঠিয়েছি, আর যার হেদায়েত আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছি এ তাগিদ করে যে, কায়েম করো এই দ্বীনকে এবং এ ব্যাপারে তোমরা বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন পন্থী হয়ে যেও না। হে নবী, তুমি যে জিনিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছ তা মুশরিকদের নিকট বড়ই দুঃসহ ও অসহ্য হয়ে উঠেছে। আল্লাহ্ যাকে চান যাচাই করে আপনার বানিয়ে নেন এবং তাঁর নিজের দিকে যাওয়ার ও পৌঁছার পথ তাকেই দেখান, যে তাঁর দিক রুজু হবে।

এ আয়াত স্পষ্ট বলছে যে, হযরত নূহ (আ) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কেও এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র দেয়া এ দ্বীনকে পুরোপুরি কায়েম করো। হযরত মুহাম্মদ (স) সব বাতিল আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা চূর্ণ করে এ দ্বীনকে কায়েম করার এবং এ দ্বীনের ভিত্তিতে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলারই দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখনকার সময়ের লোকদেরকে। আর এ জিনিসই ছিল মুশরিকদের পক্ষে বড় দুঃসহ। দ্বীন কায়েমের দাওয়াত ও চেষ্টা মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করে নেয়া এ জন্য দুঃসহ ছিল যে, তার ফলে মানুষের জীবন থেকে শির্কের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে যাবে। আর শির্কই যদি না থাকল, তাহলে মুশরিকদের তো অস্তিত্বই নিঃশেষ হয়ে গেল। তার আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে দ্বীনকে কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দেয়া হয়েছে রাসূলে করীমের নবুয়্যতী জিন্দেগীর প্রথম দিকেই। দ্বীনকে শুধু প্রচার করার নির্দেশ কুরআন মজীদে কোথাও নেই। আর দ্বীন কায়েমের মানে হলো মানুষের মন, জীবন, আকীদা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পলিসি ও ব্যবস্থাকে দ্বীনের ভিত্তিতে গড়ে তোলা এবং আল্লাহ্র দেয়া আইন বিধানকে বাস্তবভাবে জারী ও কার্যকর করা, তারই ভিত্তিতে শাসন, বিচার, শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পূর্ণ মাত্রায় রূপায়িত করা।[১] অতএব দ্বীন

---

১. কুরআন মজীদে আল্লাহ নির্ধারিত ফৌজদারী আইনকে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্র দ্বীন'। সূরা আন-নূর-এর আয়াতে যিনাকারী পুরুষ ও নারীকে শরীয়তী দণ্ড হিসেবে কোড়া মারার নির্দেশ দেয়ার পর বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

আল্লাহ্র দ্বীন জারী ও কার্যকর করার ব্যাপারে সে দু'জনের প্রতি দয়া ও মায়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এ আয়াতে কোড়া মারা ফৌজদারী আইনকে 'আল্লাহ্র দ্বীন' বলা হয়েছে।

কায়েম করা, কায়েম করতে চেষ্টা করা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি ঈমানদার মুসলমান মাত্রেরই দ্বীনী ফরয, যেমন ফরয নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া ইত্যাদি। হাদীসেও দিন কায়েম করার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি হাদীসে নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

فَاِنْ اَبْدٰى لَنَا سَفْحَتَهٗ اَقَمْنَا عَلَيْهِ كِتٰبَ اللّٰهِ - (احكام القران الجصاص)

কেউ যদি তার যিনার অপরাধ আমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়, তাহলে আমরা তার ওপর আল্লাহ্‌র কিতাব কায়েম করে দেবো।

'আল্লাহ্‌র কিতাব কায়েম করে দেবো' কথার অর্থ আল্লাহ্‌র কিতাবে লিখিত যিনার শাস্তি তার ওপর কার্যকর করে দেবো, তাকে সেই শাস্তি দেবো, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে লিখিত রয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌র কিতাব কায়েম করার মানে হলো আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী আইন জারী করা। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েম করার মানে হলো দ্বীন অনুযায়ী পূর্ণ জীবন পুনর্গঠিত করা। রাসূলে করীম (স) এ নির্দেশ পেয়েছিলেন তাঁর নবুয়্যতের প্রাথমিক পর্যায়ে-ই। পূর্বোক্ত আয়াতটি হলো সূরা আশ্-শুরার। আর তা মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়েছিল। উক্ত সূরায় পূর্বোদ্ধৃত আয়াতের একটু পূর্বেই রয়েছে এ আয়াতটি ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَ تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ - (الشورى : ٧)

এমনিভাবে হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতি এই আরবী ভাষার কিতাব কুরআনকে ওহী করে পাঠিয়েছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি এ কিতাবের মাধ্যমে মক্কাবাসী ও তার আশেপাশের লোকদের ভয় দেখাবে, ভয় দেখাবে একত্রিত হওয়ার সেই দিনটি সম্পর্কে, যে দিনের উপস্থিতির ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই।

এ আয়াতে নবী করীম (স)-কে 'ভয় দেখাবার' কাজ করতে বলা হয়েছে, আর তারই ভিত্তিতে পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে দ্বীন কায়েম করার নির্দেশ। তার মানে দ্বীন কায়েম বা সে জন্যে চেষ্টা করা পরকালের প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবি। তা করা না হলে সে দিন আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আর এ-ই ছিল নবী করীম (স) এর নবুয়্যতের প্রাথমিক পর্যায়ের দাওয়াত ও সাধনা। এ ছিল সে জিহাদ, যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল নবী করীম (স)-কে মক্কার জীবনেই এ আয়াতে ঃ

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا - (الفرقان : ٥٢)

হে নবী, কাফির লোকদের আনুগত্য স্বীকার করবে না কখনোই এবং কিছুতেই। বরং এ কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী কাফিরদের সাথে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে ও সর্বাত্মকভাবে জিহাদ করবে।

কাফিরদের আনুগত্য স্বীকার না করার— তা অস্বীকার ও অমান্য করার এবং এ বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করার সাধনাই ছিল প্রথম দিন থেকে বিশ্বনবীর সাধনা[১] আর আজকের ভাষায় এই হচ্ছে দ্বীন কায়েমের রাজনীতি। নবীর এ সাধনারই বাস্তব ফল পাওয়া গেছে হিজরতের পরে মদীনা কেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থারূপে।

এ দৃষ্টিতে তাঁদের কথা ভুল প্রমাণিত হয়, যাঁরা বলে বেড়ান যে, 'নবী করীম (স) দ্বীন কায়েম করার— ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার— কোনো দাওয়াত দেননি বা সে জন্যে কোনো চেষ্টা করেননি।' মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র তো ছিল আল্লাহ্‌র দান মাত্র। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে কায়েম করার দাওয়াত সব নবীরই মৌলিক দাওয়াত ছিল, সর্বশেষ নবীর সাধনাও ছিল তারই জন্যে।

একথা আজকের দিনে কুরআন হাদীসের কেবল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই জানা যাচ্ছে তা-ই নয়; খোদ সাহাবীগণ একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে, রাসূলে করীম (স)-কে দ্বীন কায়েমের এ মহান উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় পাঠান হয়েছে এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) ছিলেন এ কাজের জন্যেই তাঁর সঙ্গী ও সাথী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদের কথা পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

---

১. এ পর্যায়ে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন ঃ

وَ اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِالْجِهَادِ مِنْ حِيْنَ بَعَثَهٗ -

যেদিন প্রথম তাঁকে নবী রূপে নিয়োগ করলেন, সে দিনই আল্লাহ তাঁকে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আর কুরআনের পূর্বোক্ত আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

فَهٰذِهٖ سُوْرَةٌ مَكِّيَّةٌ اُمِرَ فِيْهَا بِجِهَادِ الْكُفَّارِ - (زادالمعاد : ج -٣، ص - ٥٢)

এ সূরাটি মক্কায়ই অবতীর্ণ। এতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে কাফির (এবং মুনাফিকদের) সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَ لِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ -

আল্লাহ তা'আলা তাদের বাছাই করে মনোনীত করে নিয়েছেন তাঁর নবীর সঙ্গী-সাথী হওয়ার জন্যে এবং তাঁর দ্বীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্যে।

এখানে দু'টো কথা বলা হয়েছে। প্রথম কথাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত ও মর্যাদা-শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি হলো রাসূলে করীমের সোহবত লাভ করা, তাঁর সঙ্গী ও সাথী হওয়া। তাঁরা কি কাজে রাসূলের সঙ্গী ও সাথী ছিলেন ? সকলেই জানেন, রাসূলে করীমের রিসালাতের মূল দায়িত্ব পালনের ব্যাপারেই তাঁরা ছিলেন রাসূলের সঙ্গী ও সাথী। আর এ এত বড় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপার যে ঈমান, আমল এবং তাকওয়া-তাহারাতের উচ্চতম মর্যাদাও তার সমতুল্য হতে পারে না।

আর দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্যেই রাসূলের সাহাবীদেরকে মনোনীত করেছেন। সাহাবীদের ব্যাপারে এ হলো আল্লাহ্র দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্য প্রথম উদ্দেশ্যের-ই পরিপূরক। বরং বলা যায়, তাদের নবীর সঙ্গী ও সাথী বানিয়ে দেবার মূল লক্ষ্য-ই ছিল আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম করা। একথা থেকে স্বয়ং নবী করীম (স)-এর আগমনের উদ্দেশ্যও স্পষ্টভাবে বোঝা গেল। জানা গেল যে, নবীর জীবন লক্ষ্যও ছিল আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম করা এবং সাহাবীদেরও উদ্দেশ্য ছিল তা-ই। নবীর আগমন, লক্ষ্য এবং সাহাবীদের জীবন উদ্দেশ্য দু'রকমের ছিল, কিংবা পরস্পর বিপরীত ছিল— তার ধারণাও করা যায় না। যে মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে নবী করীম (স) এর সঙ্গী ও সাথী বানিয়ে দিয়েছেন, তা হলো আল্লাহ্র দ্বীনকে কায়েম করা আর এ কারণেই নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীদের এ দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। বরং তা ছিল তাঁদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তকার জন্যে শাশ্বত কর্তব্য। এ থেকে একথাও বোঝা গেল যে, আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে সাহাবীদের বাছাই ও মনোনীত করেছিলেন, তা কেবল মদীনাতেই করণীয় ছিল না, করণীয় ছিল মক্কায়ও। বরং মক্কী জীবন থেকেই যাঁরা রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবী হয়েছিলেন, সাহাবীদের মধ্যে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা ছিল সর্বাধিক। এ থেকে একথাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, নবী করীম (স) ও সাহাবীদের জীবন উদ্দেশ্য মক্কী জীবনেও তা-ই ছিল, যা ছিল মাদানী পর্যায়ে। মদীনায় গিয়ে যেমন কোনো নতুন লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি, তেমনি মদীনায় যাওয়ার পর মক্কী পর্যায়ে লক্ষ্য বদলেও যায়নি। এমন হয়নি যে, নবী করীম (স) সাহাবায়ে কিরাম মক্কায় এক ধরনের উদ্দেশ্যে কাজ করেছিলেন আর মদীনায় গিয়ে ভিন্ন রকমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গ্রহণ করে কাজ করেছিলেন।

অতএব গোটা মুসলিম উম্মতের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব তা-ই যা ছিল স্বয়ং রাসূলে করীম (স) এবং সাহাবায়ে কিরামের। তাঁদের পদাংক অনুসরণ করা, শুধু 'দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে কওম ও হুকুমাতকে রাহনুমায়ী' করে এ কর্তব্য পালন হতে পারে না। বরং সে জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দ্বীন কায়েমের রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়া ইসলামের বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।[১]

এ যদি রাজনীতি হয়ে থাকে, তবে এ রাজনীতি তো দ্বীন-ইসলামের হাড়মজ্জার সাথে মিশ্রিত, ইসলামের মূলের সাথে সম্পৃক্ত। সব নবী এ দ্বীনই নিয়ে এসেছিলেন এবং সব নবীর প্রতি এ রাজনীতি করারই নির্দেশ ছিল আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে। আজ যাঁরা এ রাজনীতিকে 'ক্ষমতার লোভ' বলে দোষারোপ ও ঘৃণা প্রকাশ করছেন, তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, এ দোষারোপ কার্যত রাসূলে করীম (স)-এর ওপরই বর্তে, বর্তে মহান আদর্শস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের ওপর, বর্তে দুনিয়ার মুজাদ্দিদীন ও ইসলামের মুজাহিদীনের ওপর। এ রাজনীতি ছাড়া দ্বীন, তা কোনক্রমেই দ্বীন ইসলাম নয়, সে দ্বীন নয়, যা নিয়ে এসেছিলেন আখেরী নবী। এ রাজনীতি পরিহার করে চলা এবং একে 'ক্ষমতার লোভ' বলে ঘৃণা করা ও গালাগালি করাই হলো এক অতি বড় বিদয়াত। এ বিদয়াত খতম না হলে ইসলাম রক্ষা পেতে পারে না। এহেন রাজনীতিকে অস্বীকার করা, তাকে পাশ কাটিয়ে চলা এবং "দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে জনগণ ও সরকারকে শুধু রাহ্নুমায়ী করা কিংবা রাজনীতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকে ধর্মের কিছু অংশ প্রচার করাকে যে নিঃসন্দেহে কুরআন হাদীসের মূল ঘোষণা তথা ইসলামের প্রাণ শক্তিকেই অস্বীকার করার শামিল, তা কে অস্বীকার করতে পারে?"

নবী করীম (স)-এর প্রতি ঈমান এনেই আমরা মুসলিম হতে পেরেছি। তিনিই আমাদের একমাত্র আদর্শ। আর তাঁর সাহাবী সে আদর্শানুসারী লোকদের প্রথম কাফেলা, আমাদেরও অগ্রপথিক। তাঁরা কি রাজনীতি চর্চা করেছেন? না তাঁরা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে শুধু রাহ্নুমায়ী-ই (?) করে গেছেন, না নিজেরাই রাজনীতির মাঝদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে মানুষকে গায়রুল্লাহ্র গোলামী

---

১. এখানে মনে করতে হবে, যারা শুধু কলেমার তাবলীগ করেন এবং বলেন, আমরা নবীর মক্কী পর্যায়ের কাজ করছি, তারা কিন্তু মোটেই সত্য কথা বলছেন না। বরং নবীর মক্কী পর্যায়ের কাজকে এরূপ বিকৃত রূপে পেশ করে তারা বড় অপরাধ করছেন। মক্কী পর্যায়ে রাসূল (স) ইসলামী রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে আদর্শ পেশ করেছেন, মাদানী পর্যায়ে তা-ই কায়েম করেছেন। কাজেই তাঁর কাজ এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য আদর্শ, তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় না। বিভক্ত করা হলে তা নিঃসন্দেহে বিদয়াত হবে।

থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্‌র বন্দেগীর পথে নিয়ে গেছেন ? যে কেউ রাসূলের জীবন কাহিনী ও সাহাবীদের দিন রাতের ব্যস্ততার কথা জানেন, তাঁদের মনে এ ব্যাপারে কোনোরূপ অস্পষ্টতা থাকতে পারেনা। তারা নিঃসন্দেহে জানেন রাসূল করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরাম রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করেছেন, তার সাহায্যে ইসলামী জীবন বিধানকে বাস্তবায়িত করেছেন, অন্যায় ও জুলুমের প্রতিরোধ করেছেন এবং ন্যায় এর প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই আল্লাহ্‌র দ্বীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক ও রাসূলের দেখানো পথে ও নিয়মে যে রাজনীতি, সে রাজনীতি করা প্রকৃতই সুন্নাহ এবং তা বাদ দিয়ে চলা, আর এ রাজনীতিকে বাদ দিয়ে চলার নীতিকে সুন্নাত বা 'ইসলামী রীতি বলে বিশ্বাস করা' সুস্পষ্টভাবে বিদয়াত। এ বিদয়াত ইসলামকে এক বৈরাগ্যবাদী ধর্মে পরিণত করেছে। শুধু তা-ই নয়, মুসলিমদের ওপর ফাসিক-ফাজিরদের কর্তৃত্ব, জুলুম ও শোষণ চলার স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বস্তুত নবী করীম (স) যদি এদের মতো নীতি অনুসরণ করতেন, যদি তদানীন্তন আরব সমাজের প্রধান আবু জেহেল ও আবু লাহাবের প্রতি তাদের শুধু 'রাহনুমায়ী' করার নীতিই গ্রহণ করতেন, তাহলে মুশরিক কাফিরদের তরফ থেকে এত বিরুদ্ধতা হতো না, রাসূলকে হিজরত করতে, জিহাদে দাঁত ভাঙতে ও সাহাবীদের শহীদ হতে হতো না কখনো। বরং তাঁরা এ ধরনের নীতি গ্রহণ করে লাখ লাখ টাকা পেতে পারতেন, যেমন এ কালের আলিম ও পীরেরা পাচ্ছে এ যুগের আবু জেহেল আবু লাহাবের কাছ থেকে। আর তা-ই যদি তাঁরা করতেন তাহলে এ দুনিয়ায় ইসলামের কোনো অস্তিত্বই থাকত না, হতো না ইসলামের কোনো ইতিহাস— কোনো গৌরবোজ্জ্বল জীবন্ত কাহিনী।

প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের রাজনীতি করা ইমাম মুজতাহিদগণের মতে এবং ফিকাহ ও আকায়েদের দৃষ্টিতেও ঈমানেরই তাগিদ— একান্তই কর্তব্য। আল্লামা মুল্লা আলী আল-কারী ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর ইসলামী আকায়েদের বড় ব্যাখাতা। তিনি লিখেছেন :

فَقَدْ اَجْمَعُوْا عَلٰى وُجُوْبِ نَصْبِ الْاِمَامِ - (شرح فقه اكبر : ص - ١٧٩)

ইমাম— ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালক— নিয়োগ করা যে ওয়াজিব, এ বিষয়ে সব বিশেষজ্ঞই সম্পূর্ণ একমত।

ইমাম নিয়োগের কাজ যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝাতে গিয়ে তিনি আরো লিখেছেন :

وَلاَنَّ لِصَّحَابَةَ جَعَلُوْا اَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ نَصْبَ الْاِمَامِ حَتّٰى قَدَّمُوْهُ عَلٰى دَفْنِهٖ صلعم -

সাহাবায়ে কিরামও ইমাম নিয়োগকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এমন কি নবী করীম (স)-কে দাফন করার পূর্বেই ইমাম নিয়োগের কাজ সুসম্পন্ন করেছেন। কিন্তু কেন ?

وَلاَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْ اِمَامٍ يَقُوْمُ بِتَنْفِيْذِ اَحْكَامِهِمْ - وَ اِقَامَةِ حُدُوْدِهِمْ وَسَدِّ ثُغُوْرِهِمْ وَ تَجْهِيْزِ جُيُوْشِهِمْ وَ اَخْذِ عِرْضِهِمْ وَ صَدِّ اَوْ قَاتِهِمْ وَقَهْرِ الْمُتَغَلِّبَةِ الْمُتَلَبِّبَةِ وَقُطَّاعِ الطَّارِيْقِ وَاِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْاَ عْيَادِ وَتَزْوِيْجِ الصِّغْرِ وَالصَّغَائِرِ الَّذِيْنَ لاَ اَوْلِيَاءَ لَهُمْ وَقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَ نَحْوِ ذٰلِكَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ -

(شرح فقه البرص : ١٧٩)

তাঁর কারণ এই যে, মুসলমানদের জন্য এমন একজন ইমাম— রাষ্ট্রচালক— একান্তই আবশ্যক, যে তাদের আইনসমূহ কার্যকর করবে, হদ্দসমূহ কায়েম করবে, তাদের ফাঁক ও ফাটলসমূহ বন্ধ করবে, তাদের সৈন্যদের সদাপ্রস্তুত ও সজ্জিত করে রাখবে, তাদের সম্মান ও সময় সংরক্ষণ করবে, তাদের বিদ্রোহী আক্রমণকারীদের শক্তিবলে দমন করবে, ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের শাসন করবে, জুম'আ, হজ্জ ও ঈদ কায়েম রাখবে, অবিভাবকহীন ছোট ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করবে, গনীমতের মাল ও জাতীয় সম্পদ বন্টন করবে এবং এই ধরনের আরও শরীয়ত মুতাবিক যে সব কাজ করা জরুরী তা সুসম্পন্ন করবে। (শরহে ফিক্‌হ আকবর, ১৭৯ পৃ.)

এই পর্যায়ে সর্বশেষ ও অত্যন্ত জরুরী কথা হলো, 'রাজনীতি না করা বিদয়াত' পর্যায়ে এখানে যা কিছু বলা হয়েছে, তা শুধু দ্বীন কায়েমের রাজনীতি না করা সম্পর্কে কিন্তু রাজনীতির নামে দ্বীন-ইসলাম পরিপন্থী মতাদর্শ কায়েমের রাজনীতি, তা না করা নয়, তা করাই একালের একটি অতি বড় বিদয়াত। বড়ই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়, মুসলমানরা এ 'ইসলামী পরিচিত ধারণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী, দল জামা'আত বর্তমানে সাধারণভাবে যে রাজনীতি করছে, তা দ্বীন কায়েমের রাজনীতি নয়; এবং দ্বীন-ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র বা পুঁজিতন্ত্র কায়েম করার রাজনীতি করছে— তা সম্পর্ণ বিদয়াত, তা হারাম। মুসলমান বা ইসলামী পরিচিতি দিয়ে কুফর কায়েম

করার রাজনীতি করা কুরআনের ভাষায় চরম মুনাফিকী, তা আল্লাহ্‌র এই প্রশ্নের সম্মুখীন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ - (الصف)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা মুখে কেন বলো সেই কথা যা কাজে তোমরা করছো না ?

যা করছো না তাই বলছো, অতএব যা বলছো তা করছো না— নিজেদের নাম ও পরিচিতির আলোকে যা তোমাদের করা উচিত, তা করছো না, যা করা উচিত নয় তা করছো। তোমাদের নাম ও পরিচিত দেখে লোকেরা তোমাদের নিকট যে রাজনীতির আশা করে স্বাভাবিকভাবে তোমরা সে রাজনীতি করছো না, করছো যা তা হলো ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রী বা পুঁজিবাদী রাজনীতি। ফলে তোমাদের গোটা অস্তিত্বই একটা প্রচণ্ড মুনাফিকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমরা হচ্ছ মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ।

তোমাদের এই রাজনীতি স্পষ্ট বিদয়াত, তা অবিলম্বে পরিহার করে সরাসরি আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের রাজনীতি করা তোমাদের কর্তব্য। তোমাদের নাম ও পরিচিত ঐকান্তিক দাবিও তাই। গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করার কথা বলা সুস্পষ্ট বিদয়াত। কেননা গণতন্ত্র কুফরি মতবাদ। কুফর দ্বারা ইসলাম কায়েম হতে পারে না। ইসলাম সরাসরি আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুলের দাওয়াতের মাধ্যমেই কায়েম হতে পারে, এছাড়া মধ্যম পন্থা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়, অতএব তা ত্যাগ করতে হবে।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে অসীলা'র বিদয়াত

কুরআন ও হাদীস যে সর্বাত্মক তওহীদী আকীদা পেশ করেছে, তদানুযায়ী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই হলেন সমগ্র বিশ্বলোকের নিরংকুশ অধিকারী কর্তা ও পরিচালক। মানুষ কেবল এক আল্লাহ্‌রই বন্দেগী দাসত্ব ও আনুগত্য করবে, জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে এক আল্লাহ্‌রই দেয়া আইন-বিধান পালন করে চলবে এবং এই সব ব্যাপারেই অনুসরণ করবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র রাসূলের। হেদায়েত লাভ করবে রাসূলের নিকট থেকে। তিনি যে পথ, পন্থা ও উপায় এবং কর্মনীতি উপস্থাপিত করেছেন, মানুষ তাদের সমগ্র কাজ সেই অনুযায়ীই সম্পন্ন করবে। কোনো কিছু চাইতে হলে কেবল তাঁরই নিকট চাইবে এবং কিছু পাওয়ার আশা করলেও কেবল তাঁরই নিকট থেকে পেতে আশা করবে।

কুরআন মজীদে উদাত্ত ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (ال عمران - ٣١)

তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাস, তবে তোমরা আমার (নবীর) অনুসরণ করে চলো। তা হলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন।

এই আয়াত অনুসারে আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার, আল্লাহ্‌র বন্দেগী করবার ইচ্ছা বান্দার মনে জাগাবার অনিবার্য ফলশ্রুতি যেমন রাসূলের অনুসরণ করা; তেমনি বাস্তব ক্ষেত্রে রাসূলের অনুসরণ করা ছাড়া আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার কোনো দাবিই অর্থবহ হতে পারে না। উপরন্তু আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পাওয়ার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে রাসূলের অনুসরণ। আল্লামা আলূসী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

اَىْ مَنْ تَحَبَّبَ اِلَيْهِ بِطَاعَتِهٖ وَتَقَرَّبَ اِلَيْهِ بِاتِّبَاعِ نَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(روح المعانى ج -٣، ص - ١٦)

যে লোক আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে তাঁর প্রতি ভালোবাসা দেখাল এবং তাঁর নবীর অনুসরণ করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করলো, আল্লাহ্ তার জন্যে ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

রাসূলে করীম (স)-কে মুসলমানদের জন্যে একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে কুরআন মজীদে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَا اللّٰهَ كَثِيْرًا - (الاحزاب- ٢١)

নিশ্চিতই তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূলের চরিত্রে উত্তম অনুসরণীয় নমুনা ও আদর্শ রয়েছে। তাদের জন্যে তা ফলপ্রসূ হবে, যারা আল্লাহ্কে পেতে চায়, পরকালে মুক্তি চায় এবং আল্লাহ্কে খুব বেশি করে স্মরণ করে।

এ আয়াত অনুযায়ীও যে লোক আল্লাহ্কে পেতে চায়, পরকালের মুক্তি চায় এবং আল্লাহ্র যিকির করে বেশি বেশি করে, তার জন্যে বাস্তব অনুসরণযোগ্য আদর্শ চরিত্র হচ্ছে রাসূলে করীম (স)। যে লোক তাঁকে অনুসরণ করবে সর্বতোভাবে, সে যেমন আল্লাহ্কে পাবে, পাবে পরকালীন মুক্তি, তেমনি তার আল্লাহ্র যিকির বাস্তব রূপ লাভ করবে নবীর অনুসরণের মাধ্যমে, তারই মাঝে তা রূপায়িত ও প্রতিফলতি হয়ে উঠবে।

কুরআনের এসব উদাত্ত ঘোষণা অনুযায়ী মানুষ মানতে বাধ্য একমাত্র আল্লাহ্কে এবং অনুসরণ করতে বাধ্য একমাত্র রাসূলকে। বস্তুত ইসলামের তওহীদী আকীদা অনুযায়ী আল্লাহ্কে পাওয়ার উপায় রাসূলের বাস্তব অনুসরণ ছাড়া আর কিছু নেই। রাসূলের জামানায়, সাহাবীদের সময়ে এবং তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীনের সময়ও এই ছিল ইসলামী সমাজের বাস্তব রূপ। আল্লাহ্কে পাওয়ার এ ছাড়া অন্য কোনো পথ-ই তাঁদের জানা ছিল না, তাঁরা অন্য কোনো উপায়ই গ্রহণ করতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালের মানুষের ওপর চেপে বসে পীরত্বের বিদয়াত। সমাজে এক শ্রেণীর লোক 'পীর' হয়ে বসে এবং দাবি করে যে, তারা আল্লাহ্র নিকট বান্দাদের পৌঁছার অসীলা বা মাধ্যম। তাদের গ্রহণ করলে আল্লাহ্কে পাওয়া যাবে, আর তাদের গ্রহণ না করলে আল্লাহ্কে পাওয়া যাবে না।

অথচ কুরআন থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্যে রাসূলের অনুসরণে শরীয়ত পালন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাধ্যমের কোনো অবকাশই নেই, তার কোনো প্রয়োজনও নেই। বান্দার দো'আ আল্লাহ্র নিকট সরাসরি পৌঁছে যায়, আল্লাহ্ সরাসরিভাবে বান্দার দো'আ কবুল করে থাকেন, সে তিনি কোনো মাধ্যম গ্রহণ করতে বলেন নি, দো'আ কবুল হওয়ার জন্যে

তিনি কোনো মাধ্যম গ্রহণের শর্তও আরোপ করেননি। বরং এ পর্যায়ের যাবতীয় বিভ্রান্তি ও ভুল আকীদা দূর করে দিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ - (البقرة - ١٨٦)

হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার বিষয় জিজ্ঞেস করে, তবে বলে দাও আমি অতি নিকটে, কোনো দো'আকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার দো'আর জবাব দেই— দো'আ কবুল করি। অতএব আমারই নিকট জবাব পেতে চাওয়া তাদের কর্তব্য এবং আমার প্রতিই তাদের ঈমান রাখা উচিত। তাহলে সম্ভবত তারা সঠিক পথে চলতে পারবে।

আল্লাহ্-ই সব দো'আ প্রার্থনাকারীর দো'আ কবুল করেন, কেবল তাঁরই নিকট দো'আ করে তাঁরই নিকট থেকে তাঁর জবাব পেতে চেষ্টা করা উচিত, এ কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতে। আল্লাহ্ নিকট কোনো মাধ্যম ছাড়া পৌঁছা যায় না বলে বিদয়াতীরা যে ধারণা সৃষ্টি করেছে তার মূলোৎপাটন করা হয়েছে এ আয়াতে। "দো'আকারীর দো'আ আমিই কবুল করি" বলে আল্লাহ্ তা'আলার স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্র নিকট দো'আ করতে এবং দো'আ কবুল করাতে কোনো অসীলার প্রয়োজন নেই। সঠিকভাবে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করতে পারলে আল্লাহ্ সরাসরিভাবেই তা কবুল করে থাকেন। 'আমারই জবাব পেতে চাওয়া কর্তব্য' বলে আল্লাহ্ বুঝিয়ে দিলেন যে, যে লোক দো'আ করবে তার মনে এ দো'আ কবুলের জন্যে বিশেষ আগ্রহ, উৎসাহ ও আবেগ থাকা বাঞ্ছনীয়। এ জিনিস অপরের দ্বারা হয় না, অসীলা কিছুই করতে পারে না। আর 'আমার প্রতিই ঈমান রাখা উচিত' বাক্য দ্বারা বলে দিলেন যে, আমার এই ঘোষণাকে মনে রেখে আল্লাহ্কে অতি আপনার— অতি নিকটে বলে বিশ্বাস করা কর্তব্য। কোনো মাধ্যমে ধোঁকায় পড়ে গিয়ে সরাসরি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করার পরিবর্তে কোনো মাধ্যমে আশ্রয় গ্রহণের বিভ্রান্তিতে পড়া উচিত নয়। আয়াতের শেষ শব্দটিও এ পথকেই সত্যিকার বিদয়াতের পথ বলে ঘোষণা করেছেন এবং বলেছে যে, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ হলো, আল্লাহ্র নিকট কাতরভাবে দো'আ করা ও এই বিশ্বাস মনে রাখা যে, আল্লাহ্-ই আমার দো'আ কবুল করবেন।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো জোরালো ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ط إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ - (المؤمن - ٦٠)

তোমাদের আল্লাহ্ বলেছেন : তোমরা আমাকেই ডাকো, আমারই নিকট দো'আ করো, আমিই তোমাদের জবাব দেবো— দো'আ কবুল করবো। যে সব লোক আমার 'ইবাদত' করার ব্যাপারে অহংকার করবে, তাদের সকলকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।

এখানেও আল্লাহ্কে সরাসরি ডাকার— সরাসরিভাবে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করার নির্দেশ। আর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে এই দো'আকেই আল্লাহ্র ইবাদত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সরাসরিভাবে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে না, অসীলা ধরে অগ্রসর হতে চায়, তারা একান্তভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে প্রস্তুত নয়, তারা যে জাহান্নামে যাবে তাতে আর কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। মক্কার কাফিরদের তো এই অপরাধই ছিল, যার জন্যে তারা জাহান্নামী হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের এসব আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্যে নিজেদের দো'আ কবুল করবার জন্যে এবং ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগী করার জন্যে কোনো 'অসীলার' আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই এবং আল্লাহ্র নিকট তা পছন্দনীয়ও নয়। বরং আল্লাহ তো চান বান্দা সরাসরিভাবে তাঁরই দিকে রুজু হোক, তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করুক; তাঁর পরিবর্তে অন্য কারো দরবারে কপাল লুটানো ত্যাগ করুক। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে ইসলামেরই দোহাই দিয়ে প্রবর্তন করা হয়েছে 'অসীলা'। অসীলা ছাড়া আল্লাহ্কে পাওয়া কোনো উপায়ই নাকি নেই বলে প্রচারণা চালান হয়েছে। ইসলামের তওহীদী ব্যবস্থায় এই 'অসীলা'র প্রচলন এক অতি বড় বিদয়াত এবং এ বিদয়াত তওহীদবাদিদের কঠিন শিরক-এ নিমজ্জিত করে ছেড়েছে। বিদয়াতীদের দরবার থেকে ফতোয়া জারী করা হয়েছে : **আল্লাহ প্রাপ্তির জন্যে অথবা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে অসীলা অবলম্বন করা কেবলমাত্র জায়েযই নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফরয ও ওয়াজিবও বটে।**

বস্তুত যা কুরআন থেকে প্রমাণিত নয়, যা রাসূলের কথা, কাজ ও অনুমোদন দ্বারা প্রমাণিত নয় তাকেই ফরয ওয়াজিব বলা-ই হলো বিদয়াত। উপরোল্লিখিত অংশ এই বিদয়াতেরই স্বপক্ষে এক বিশেষ ফতোয়া। এই বিদয়াত এখন

জনগণের একাংশকে গ্রাস করে রয়েছে। তাদের মধ্যে কারো ধারণা ঃ "আমরা নামায-রোযা করি না, কেননা আমরা পীরকে ধান দিয়ে থাকি।"

তার মানে 'পীরকে' ধান দিলে পীর তো খুশী হবে। আর পীর খুশী হলে আল্লাহ্ও খুশী হবেন। তাহলে আল্লাহ্র ইবাদাত-বন্দেগী করার আর প্রয়োজন কি ? আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্যে পীরকে ধান দেয়া— ভেট দেয়াই— নাকি যথেষ্ট।

আবার অন্য কিছু লোকের ধারণা যে, 'পীরের' হাতে হাত দিতে পারলে বেহেশতে যাওয়া অবধারিত। কেননা পীর সাহেব নিশ্চয়ই আমাদেরকে বাইরে রেখে বেহেশতে যাবেননা।

এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পীর সাহেব যে বেহেশতে যাবেনই একথা তো নিশ্চিত— যেন তারা আল্লাহ্র কাছ থেকে জানতে পেরেছে যে, পীর সাহেব একজন বেহেশতি হয়েই আছেন। অথচ এ ধারণা চরম বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। কেননা যাকে এরূপ মর্যাদা দিয়ে তার হাতে হাত দেয়া হচ্ছে, তার পক্ষে অন্যদের বেহেশতে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, সে নিজেই যে বেহেশতে যাবে তারই নেই কোনো ঠিক ঠিকানা।

অসীলাবাদীরা তাদের মতের সমর্থনে কুরআন মজীদের একটি আয়াতের অংশও পেশ করে থাকে। সে আয়াতাংশ হচ্ছে এই ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ - (المائدة -٣٥)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ভয় করো আল্লাহ্কে এবং তাঁর নিকট অসীলার সন্ধান করো।

আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ্কে ভয় করে তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে। কিন্তু কুরআনের আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য কথার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে এভাবে এ আয়াতকে ব্যবহার করে। প্রথম কথা, অসীলাবাদীরা এ আয়াতটিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেনি, আয়াতটির শুধু একটি অংশকে নিজেদের কথা প্রমাণের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ পূর্ণ আয়াতের অর্থ হয় এক, আর আয়াতের একটি অংশ পেশ করে নিজেদের মতলব মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন কথাও বলতে চেষ্টা করা যেতে পারে। এখানে ঠিক তাই হয়েছে। সম্পূর্ণ আয়াতটি এই ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - (المائده - ٣٥)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তাঁর নিকট 'অসীলা'র সন্ধান করো এবং জিহাদ করো তাঁর পথে, সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

প্রথমে প্রমাণ করতে হবে 'অসীলা' শব্দের অর্থ কি, কুরআনের এ আয়াতে কোন অর্থে 'অসীলা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তারপরই এ আয়াতের যথার্থ বক্তব্য বুঝতে পারা যাবে। আমরা তাই দেখছি, কুরআন মজীদে এই 'অসীলা' শব্দটি এ আয়াত ছাড়া আরো একটি আয়াতে— মোট দুই জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। অপর আয়াতটি হলো এই ঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لَا تَحْوِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ط اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا - (بنى اسرائيل : ٥٦ -٥٧)

বলো! তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের মা'বুদ বলে মনে করো তাদের একবার ডাকো, তারা তোমাদের থেকে বিপদ ও কষ্ট দূর করতে কিংবা তা বদলে দেবার কোনো ক্ষমতা রাখে না। এই লোকেরা যাদের ডাকে, তারাই তাদের পরোয়ারদিগারের নিকট নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র অধিক নিকটবর্তী, তাঁর রহমতের তারা আশা করে, তাঁর আযাবকে তারা ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র আযাব ভয় করার যোগ্য।

এ দু'জায়গায় যে الوسيلة শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে তার অর্থ কি ? কুরআন মজীদের শব্দ ব্যাখ্যাকারী লেখক সর্বজনমান্য মনীষী আল্লামা রাগেব ইসফাহানী এ শব্দের অর্থ লিখেছেন নিম্নোক্তভাবে ঃ

اَلْوَسِيْلَةُ التَّوَصُّلُ اِلَى الشَّيْءِ بِرُغْبَةٍ وَهِيَ اَخَصُّ مِنَ الْوَسِيْلَةِ لِتَضَمُّنِهَا لِمَعْنَى الرُّغْبَةِ -

অসীলা মানে, কোনো জিনিসের নিকটে আগ্রহ সহকারে পৌঁছা। এর মধ্যে আগ্রহের ভাব আছে বলে তা অসীলা বা পৌঁছা অপেক্ষা একটু বিশেষ অর্থ জ্ঞাপক।

খতীব السراج নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

الوسيلة। বিশেষ্য, অর্থাৎ নৈকট্য, নিকটবর্তী হওয়া, নৈকট্য লাভের উপায় অর্থাৎ আনুগত্য।

আল্লামা কুরতুবী তার তাফসীর الجامع لاحكام القران এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ اَلْوَسِيْلَةُ هِىَ الْقُرْبَةُ 'অসীলা শব্দের অর্থ হলো নৈকট্য।' আর এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে আবূ অয়েল, হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাহ্, আতা, সুদ্দী, ইবনে যায়দ ও আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর প্রমুখ তাবেয়ী ও কুরআনবিদ মনীষী থেকে। তিনি আরো লিখেছেন ঃ

اَلْوَسِيْلَةُ الْقُرْبَةُ الَّتِى يَنْبَغِىْ اَنْ يُّطْلَبَ بِهَا - (احكام القران ج - ٦ ص - ١٧٩)

অসীলা হলো এমন নৈকট্য যার দরুন কোনো কিছু চাওয়া বাঞ্ছনীয় হয়।

চাওয়া যেতে পারে আল্লাহ্র নিকট, কাজেই এ নৈকট্যও আল্লাহ্রই হতে হবে।

ইমাম রাযী তাফসীরে কবীর-এ লিখেছেন ঃ

اَلْوَ سِيْلَةُ فَعِيْلَةٌ مِّنْ وَسَلَ اِلَيْهِ اِذَا تَقَرَّبَ اِلَيْهِ -

অর্থাৎ অসীলা গুণবাচক শব্দ وَسَلَ اِلَيْهِ থেকে গৃহীত। আর وسل অর্থ تقرب নিকটবর্তী হলো।

ইমাম সুয়ূতী প্রথমোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

اَلْوَسِيْلَةُ مَا يُقَرِّبُكُمْ اِلَيْهِ مِنَ الطَّاعَةِ -

অসীলা হচ্ছে সেই আনুগত্য— ইবাদাত, যা তোমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেয়।

আর পরবর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

اَلْقُرْبَةُ بِالطَّاعَةِ ইবাদতের সাহায্যে নৈকট্য লাভ।

মওলানা আবদুর রশীদ নুমানী 'লাগাতুল কুরআন'-এ লিখেছেন ঃ শব্দটি সম্পর্কে দু'ধরনের মত রয়েছে। খতীব ও ইমাম রাযীর মতে وسلية অর্থ হচ্ছে নৈকট্য লাভের উপায়। আর ইমাম সুয়ূতী এর দু'প্রকারের অর্থ করেছেন। একটি হলো নৈকট্যের উপায়, মানে ইবাদত। আর অপরটি হলো, খোদ নৈকট্য যা ইবাদতের সাহায্যে লাভ করা যায়।

'কামুস' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে ঃ وسيلة, মানে বাদশাহর নৈকট্য, নিকটবর্তী মর্যাদা। —সেই কাজ করা যার ফলে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়।

ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

اَلْوَسِيْلَةُ الْقُرْبَةُ الَّتِىْ يَنْبَغِىْ اَنْ تُطْلَبَ - (تفسير فتح القدير :ج -٢، ص -٣٦)

অসীলা মানে নৈকট্য, যা সন্ধান করা উচিত।

আবু ওয়ায়েল, হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী, ইবনে জায়দ প্রমুখ মনীষী এই মতই প্রকাশ করেছেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস, আতা ও আবদুল্লাহ্ ইবনে কাসীর থেকেও এই মতই বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল মুক্‌রী তাঁর اَلْمِصْبَاحُ الْمُنِيْرُ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ اَلْوَسِيْلَةُ هِىَ مَايَتَقَرَّبُ بِه اِلَى الشَّىْءِ অসীলা তা-ই যার দ্বারা অন্য জিনিসের নিকটবর্তী হওয়া যায়। আর تَوَسَّلَ اِلَى رَبِّه وَسِيْلَةً এর অর্থ تَقَرَّبَ اِلَيْهِ بِعَمَلٍ কোনো কাজের সাহায্যে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হলো।

তাফসীরে ফতহুল বয়ানেও এ কথাই লেখা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

اَلْوَسِيْلَةُ اَيْضًا دَرَجَةٌ فِى الْجَنَّةِ مُخْتَصَّةٌ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অসীলা জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদা, যা রাসূলের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।

বুখারী শরীফে হযরত জাবির থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেনঃ

مَنْ قَالَ حِيْنَ سَمِعَ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اِلَّاحَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

আযান শুনে যে লোক বলবে ঃ হে আল্লাহ এই পূর্ণ দাওয়াতের ও কায়েম করা নামাযের রব্ব তুমি মুহাম্মদকে 'অসীলা' দান করো, মর্যাদা দান করো এবং তাঁকে সেই মাকামে মাহমুদে পাঠাও, যার ওয়াদা তুমি তাঁকে করেছ, কিয়ামতের দিন এই লোকের শাফাআত অনিবার্য হবে।

মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ

اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوْلِى الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ - اخ

তোমরা মুয়াযযিনের আযান শুনতে পেলে সে যা যা বলে তোমরাও তাই বলতে থাকো। পরে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করো। বস্তুত যে লোক আমার প্রতি এক দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি দশ দরূদ পাঠাবেন।

অতঃপর তোমরা আমার জন্যে 'অসীলা'র সওয়াল করো। কেননা এ হচ্ছে জান্নাতের একটি বিশেষ মনজিল ...।

'ফতহুল বয়ান' গ্রন্থে 'অসীলা' শব্দের প্রথম অর্থের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে ঃ

وَالظَّاهِرُ اَنَّ الْوَسِيْلَةَ الَّتِىْ هِىَ الْقُرْبَةُ تَصْدِقُ عَلَى التَّقْوٰى وَعَلٰى غَيْرِهَا مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ الَّتِى يَتَقَرَّبُ بِهَا الْعِبَادُ اِلٰى رَبِّهِمْ وَقِيْلَ مَعْنَى الْوَسِيْلَةِ الْمُحَبَّةُ اَىْ تَحَبَّبُوْا اِلَى اللّٰهِ وَالْاَوَّلُ اَوْلٰى -

এ কথা সুস্পষ্ট যে, অসীলা— যার মানে নৈকট্য— তাক্ওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, তাক্ওয়া ছাড়াও এমন সব গুণাবলী যার সাহায্যে বান্দাগণ তাদের আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে বোঝায়। কেউ কেউ বলেছেন ঃ অসীলা মানে প্রেম-ভালোবাসা অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো। কিন্তু প্রথম অর্থ-ই উত্তম।

আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তার তরজমা এই ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর প্রতি তাক্ওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাক্ওয়াকে যদি তাঁর আনুগত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া যায় তাহলে তার অর্থ হবে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করা। আর তারই পর বলেছেন ঃ তাঁর নিকট অসীলা সন্ধান করো।

অতঃপর লিখেছেন ঃ সুফিয়ান সওরী তালহা থেকে, তালহা আতা থেকে এবং আতা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই 'অসীলা' মানে قرابة নৈকট্য। মুজাহিদ, আবু ওয়েল, হাসান, কাতাদাহ, আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর, সুদ্দী, ইবনে জায়দ প্রমুখ প্রখ্যাত প্রাচীন মনীষী এই কথাই বলেছেন। আর কাতাদাহ এ আয়াতের তরজমা করেছেন এভাবে ঃ

اَىْ تَقَرَّبُوْا اِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يَرْضِيْهِ -

অর্থাৎ তাঁর দিকে তোমরা নৈকট্য লাভ করো, তাঁর আনুগত্য করো এবং যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তা করো।

তারপরই আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ

وَهٰذَا الَّذِىْ قَالَهُ هٰؤُلاَءِ الْاَئِمَّةُ لاَخِلاَفَ بَيْنَ الْمُفَسِّرِيْنَ -

ইলমে কুরআনের এই ইমামগণ 'অসীলা' শব্দের অর্থে যা কিছু বলেছেন, সে বিষয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

তিনি 'অসীলা' শব্দের আরো দুটো অর্থ লিখেছেন। একটি হলো ঃ

اَلْوَسِيْلَةُ هِىَ الَّتِىْ يَتَوَصَّلُ بِهَا اِلٰى تَحْصِيْلِ الْمَقْصُوْدِ -

অসীলাতা, যার সাহায্যে মূল লক্ষ্যে পৌঁছা যায়।

আর দ্বিতীয় ঃ

اَلْوَسِيْلَةُ اَيْضًا عَلَمٌ عَلٰى اَعْلٰى مَنْزِلَةٍ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ مَنْزِلَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ -

অসীলা জান্নাতের এক উচ্চতর মনজিলের নামও। আর তা হচ্ছে রাসূলের করীম (স)-এর মরতবা।

অসীলার এই অর্থের সমর্থনে ইমাম ইবনে কাসীর বহু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হযরত আলী (রা) বর্ণিত এই পর্যায়ের একটি হাদীসের ভাষা হলো ঃ

فِى الْجَنَّةِ دَرَجَةٌ تُدْعٰى اَلْوَسِيْلَةُ فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهُ فَسْئَلُوْا اِلَى الْوَسِيْلَةَ -

জান্নাতে একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান আছে যাকে বলা হয় 'অসীলা'। তোমরা যখন আল্লাহ্‌র নিকট কিছু চাইবে তখন তোমরা আমার জন্য 'অসীলার' প্রার্থনা করবে।

আর এ আয়াতের শেষাংশের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

لَمَّا اَمَرَهُمْ بِتَرْكِ الْمَحَارِمِ وَفِعْلِ الطَّاعَاتِ اَمَرَهُمْ بِقِتَالِ الْاَعْدَاءِ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ الْخَارِجِيْنَ عَنِ الطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ -

(تفسير ابن كثير :ج- ٢، ص ٥٢ - ٥٣)

আল্লাহ্ যখন হারাম কাজ ত্যাগ করার ও ইবাদত আনুগত্যের কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেন, তখন সিরাতুল মুস্তাকীম— বহির্ভূত কাফির মুশরিক শত্রু বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন।

ইমাম বায়জাবী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ اَىْ مَا تَتَوَسَّلُوْنَ بِهٖ اِلٰى ثَوَبِهٖ وَالزُّلْفٰى مِنْهُ مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمَعَاصِىْ - تفسير البيضاوى ج-٢، ص - ٢٣)

অর্থাৎ সন্ধান করো সেই জিনিস যার সাহায্যে তোমরা তাঁর সওয়াব এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পার। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র আনুগত্যমূলক কাজ করা এবং নাফরমানীর কাজ ত্যাগ করা।

তিনি وسيلة শব্দের অপর অর্থেরও উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা যামাখশারী লিখেছেন ঃ

اَلْوَسِيْلَةُ كُلُّ مَا يَتَوَسَّلُ بِهٖ اَىْ يَتَقَرَّبُ مِنْ قَرَابَةٍ اَوْ مَنِيْحَةٍ اَوْ غَيْرُ ذَالِكَ فَاسْتُعِيْرَتْ لِمَا يَتَوَسَّلُ بِهٖ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمَعَا صِىْ- (الكشاف :ج -١،ص -٣٣٢)

অসীলা হচ্ছে এমন জিনিস, যার দ্বারা কোনোরূপ নৈকট্য লাভ করা যায় বা এমন কোনো কাজ কিংবা অন্য কিছু। পরে তা ব্যবহার করা হয়েছে সেই জিনিস বোঝাবার জন্যে, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছা যায়। তা হচ্ছে ইবাদত ও আনুগত্যের কাজ করা এবং নাফরমানী ত্যাগ করা। আল্লামা আবুস সয়ূদও এ আয়াতের তাফসীরে এরূপ কথাই লিখেছেন নিজস্ব ভাষায়। তাতে اَلْوَسِيْلَةُ এর মানে বলা হয়েছে ঃ

مَا يَتَوَسَّلُ بِهٖ وَ يَتَقَرَّبُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمَعَا صِىْ -

অসীলা তা, যার দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায়— আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। আর তা হচ্ছে ইবাদাত-আনুগত্যের কাজ করা এবং নাফরমানী ত্যাগ করা।

তিনি আরো লিখেছেন ঃ

قِيْلَ الْجَمْلَةُ الْاُوْلٰى اَمْرٌ بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ وَالثَّانِيَةُ اَمْرٌ بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ وَحَيْثُ كَانَ فِىْ كُلٍّ مِّنْ تَرَاكِ الْمَعَا صِىَّ الْمُشْتَهَاةَ لِلنَّفْسِ وَ فَعَلَ الْمَكْرُوْهَةَ لَهَا كُلْفَةٌ وَ مُشَقَّةٌ عَقَّبَ الْاَمْرَ بِهَا بَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ بِمُحَارِبَةِ اَعْدَائِهٖ الْبَارِزَةِ وَالْكَامِنَةِ - (ارشاد العقل السليم الى مزايا القرا اذكريم :ج-٢، ص- ٢٤)

আয়াতের এরূপ অর্থও করা হয়েছে ঃ প্রথম বাক্যে আল্লাহ্কে ভয় করো বলে গুনাহ ও নাফরমানী ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করো বলে আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর যে লোকই নাফরমানীর কাজ ত্যাগ করবে এবং মনের পক্ষে দুঃসহজনক কাজ সম্পন্ন করবে তার কিছু না-কিছু কষ্ট ও শ্রম অবশ্যই হবে। তাই এ দু'টি আদেশের পরেপরে আল্লাহ্র আদেশ হলো ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো আল্লাহ্র প্রকাশ্য ও শক্ত দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করে।

আল্লামা সাইয়েদ মাহমুদ আলুসীও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক কথা বিস্তারিতরূপে আলোচনা করেছেন। তিনি সূরা আল-মায়েদার আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ اَىْ اُطْلُبُوْا لِاَنْفُسِكُمْ اِلٰى ثَوَابِهٖ وَالزُّلْفٰى مِنْهُ -

এবং তালাশ করো— সন্ধান করো তোমাদের নিজেদের জন্যে তাঁর সওয়াব এবং তাঁর নৈকট্য।

আর 'অসীলার' অর্থ লিখেছেন ঃ

اَلْوَسِيْلَةُ بِمَعْنٰى مَا يَتَوَسَّلُ وَ يَتَقَرَّبُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمَعَاصِىْ -

অসীলা তা, যার সাহায্যে পৌঁছা যায় এবং আল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়া যায়, তা হলো ইবাদত বন্দেগীর কাজ করা ও নাফরমানী ত্যাগ করা।

তিনি বলেন ঃ 'এই শব্দটি বানানো হয়েছে وَسَلَ اِلٰى كَذَا থেকে এবং তার অর্থ হল ঃ تَقَرَّبَ اِلَيْهِ তাঁর নিকটবর্তী হলো।

প্রখ্যাত আরবী অভিধান القموس এ লিখিত হয়েছে ঃ

اَلْوَسِيْلَةُ وَالْوَاسِلَةُ الْمَنْزِلَةُ عِنْدَا الْمَلِكِ وَالدَّرَجَةُ وَالْقُرْبَةُ -

অসীলা ও ওয়াসিলা, অর্থাৎ বাদশাহ্র নিকট মর্যাদা, মান-সম্মান ও নৈকট্য লাভ।

وَوَسَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى تَوْسِيْلًا -

একথার অর্থ

عَمِلَ عَمَلاً تَقَرَّبَ بِهِ اِلَى اللّٰهِ -

সে এমন এক কাজ করলো, যার দ্বারা সে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হয়ে গেল।

এ হলো 'অসীলা' শব্দের শাব্দিক অর্থ।

আল্লামা ইবনে জরীর তারাবী লিখেছেন ঃ

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ يَقُوْلُ اُطْلُبُوْا الْقُرْبَةَ اِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا يَرْضَهُ وَالْوَسِيْلَةُ الْفَعِيْلَةُ عَنْ قَوْلِ قَائِلٍ تَوَسَّلْتُ اِلَيْهِ بِكَذَ بِمَعْنِىْ تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ -

আল্লাহ্‌র নিকট আমল সহকার নৈকট্য পেতে চাও, যা তাঁর সন্তোষের কারণ হবে, 'অসীলা' 'ফাযীলা' ওজনের শব্দে। যেমন কেউ বলে, 'আমি তার নিকটবর্তী হলাম' এতে তাওয়াসসূল 'তাকাররুব' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'তাওয়াস্‌লালতু ইলাইহি' মানে আমি তার নিকটবর্তী হলাম।

তিনি আরও লিখেছেন ঃ

وَبِمَعْنَى الَّذِىْ قُلْنَا قَالَ بَعْضُ اَهْلِ التَّاوِيْلِ ذكر من قَالَ ذٰالِكَ حَدَّثَنَا بَشَّارٌ وَسُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ اِبْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ الْقُرْبَةُ فِى الْاَعْمَالِ وَحَدَّثَنِىْ سُفْيَانُ وَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَعَطَاءٌ اَلْاٰيَةُ فِى الْمَسْئَلَةِ الْقُرْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اَىْ تَقَرَّبُوْا اِلَيْهِ بِطَاعَةِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيْهِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَشِيْدٌ عَنْ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ قَالَ الْقُرْبَةُ - (تفسير ابن جريرطبرى)

আমরা যেমন বলেছি, শব্দের ব্যাখ্যাকার ও তাৎপর্যবিদগণ এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। বাশ্‌শার ও সুফিয়ান আবু ওয়েল থেকে বর্ণনা করেছেন, 'ওয়াবতাগু ইলাইহিল অসীলাতা' বলে আমলের মাধ্যমে নৈকট্য লাভের হুকুম করা হয়েছে। সুফিয়ান, আবু তালহা, আতা প্রমুখও এ ব্যাপারে অর্থ করেছেন 'নৈকট্য'। কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের তরজমা করেছেন এভাবে ঃ 'আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁর পছন্দমত কাজ করে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হও।' হুযায়ফা থেকে বর্ণিত, মাশীদ আবু নজীহ বলেছেন যে, মুজাহিদ 'ওয়াবতাগু ইলাইহিল অসীলাতা'র অর্থ করেছেন নৈকট্য।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেন ঃ

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ اَىِ الْقُرْبَةَ بِالْعَمَلِ -

আল্লাহ্‌র নিকট 'অসীলা' তালাশ করো অর্থঃ আমলের সাহায্যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য তালাশ করো।

আল্লামা আলুসী বলেছেন ঃ ইবনুল আন্‌বারী ইবনে আব্বাসের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ

اَلْوَسِيْلَةُ الْحَاجَةُ -

অসীলা মানে প্রয়োজন, আবশ্যকতা।

এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের অর্থ হবে ঃ

اُطْلُبُوْا مُتَوَجِّهِيْنَ اِلَيْهِ حَاجَتُكُمْ فَاِنَّ بِيَدِهٖ عَزَّ شَانُهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا تَطْلُبُوْا مُتَوَجِّهِيْنَ اِلٰى غَيْرِهٖ الخ -

তোমরা আল্লাহ্‌মুখী হয়ে তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে চাও। কেননা আসমান জমিনের সব চাবিই তাঁর হস্তে এবং আর কারো প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে তোমরা প্রয়োজন পূরণ করতে চেও না।

'অসীলা' শব্দের এ অর্থটি— বলা যায়— নতুন। অর্থাৎ অপর কোনো মুফাস্‌সির তার উল্লেখ করেননি। তবু বলা যায়, মূল আরবী অভিধান, সব সাহাবী, তাবেয়ী এবং প্রামাণ্য সব কয়খানি তাফসীরই 'অসীলা' শব্দের অর্থ এই হতে পারে, অন্য কিছু নয়। অন্য কিছু অর্থ করা হলে তা হবে পরবর্তীকালে লোকদের মনগড়া। মূল কুরআন হাদীস ও আরবী ভাষায় সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ আয়াতের ভিত্তিতে জানা গেল যে, এ আয়াতে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের জন্যে 'অসীলা' সন্ধানের যে নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, তার মানে হলো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করা, কেবল তাঁরই ইবাদাত-বন্দেগী করা এবং তাঁর নাফরমানী না করা। কিংবা নিজেদের প্রয়োজন কেবল আল্লাহ্‌র নৈকট্যের থেকে পূরণ করতে চাওয়া অন্য কারো নিকট থেকে নয়। অপর কাউকে অসীলা বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না, করা হলে তা হবে শির্‌ক এর বিদয়াত। এই শির্‌ক এর পথ চিরতরে বন্ধ করার জন্যেই আল্লাহ্‌র এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই আয়াতকেই পেশ করা হচ্ছে অসীলার

শির্ককে সুষ্ঠু জায়েয-ওয়াজিব-ফরয প্রমাণ করার কুমতলবে। আর এই পর্যায়ে 'হেসনে হাসীন' আল-মুহান্নাদ' আর 'শেফাউস-সেকাম' ধরনের কিতাবাদিতে লিখিত কথা পেশ করে তওহীদের এই চিরন্তন শাশ্বত আকীদাকে বিকৃত ও বিনষ্ট করতে চেষ্টা করা হচ্ছে।

বস্তুত تَوَسُّلٍ শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلتَّقَرُّبُ নৈকট্য, আর وسلة হচ্ছে : مَاتُقُرِّبُ بِهٖ اِلٰى شَيْءٍ তা 'যার সাহায্যে অপর জিনিসের নিকটবর্তী হওয়া যায়।' শরীয়তে توسل এর এই আভিধানিক তত্ত্বই গৃহীত হয়েছে। কুরআনের যে দুটো আয়াতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সমস্ত মুফাস্সির এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমাত যে, উভয় জায়গায়ই এ শব্দের এই অর্থই লক্ষ্যভূত হয়েছে, অন্য কোনো অর্থ নয়। আর বিস্তারিত আলোচনার দৃষ্টিতে গোটা আয়াতের অর্থ হলো : 'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো, ভয় করে আল্লাহ্র নৈকট্য বা নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করো এবং এ জন্যেই আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো।'[১]

আর হাদীসে ব্যবহৃত وسيلة শব্দের অর্থ জান্নাতের এক বিশেষ মন্যিল। শরীয়তে এ অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এখন দেখতে হবে, আল্লাহ্র নিকট وسلية বানানোর শরীয়তসম্মত পন্থা ও পদ্ধতি কি ? এ পর্যায়ে কয়েকটি জিনিস পেশ করা যাচ্ছে :

প্রথম : আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্যে অসীলা গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে কুরআন হাদীসসম্মত। আল্লাহ নিজেই ইরশাদ করেছেন :

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا - (الاعراف ۱۸۰)

আল্লাহ্র জন্যে রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, অতএব তোমরা সে নাম ধরে ধরে তাঁকে ডাকো।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ তাঁর পিতা বরিদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন : নবী করীম (স) এক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত ভাষায় দো'আ করতে শুনতে পেলেন :

---

১. ইমাম কুরতুবী তাঁর الجامع لاحكام القران নামক তাফসীরে, ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর تفسير القران العظيم নামক তাফসীরে এবং ইমাম শাওকানী তাঁর فتح القدير নামক তাফসীরে এই একই কথা লিখেছেন, যার বাংলা তরজমা ওপরে দেয়া হয়েছে। যাঁর ইচ্ছা এসব তাফসীর খুলে দেখতে পারেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এ দিক দিয়ে যে, তুমিই আল্লাহ্, তুমি ছাড়া কেউ মাবুদ নেই, তুমি পরমুখাপেক্ষীহীন, যিনি নিজে পয়দা হন নি, জন্মও দেননি এবং কেউ তাঁর সমান সমকক্ষ নেই।

তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

دَعَااللّٰهُ بِاِسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهٖ اَجَابَ -

(ترمذى، ابوداؤد)

এই লোকটি আল্লাহ্র নিকট তাঁর এমন বিরাট মহান নাম নিয়ে দো'আ করলো যে, এভাবে কিছু প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই কিছু দেয়া হবে, আর দো'আ করা হলে তা অবশ্যই কবুল করা হবে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকেও এরই সমর্থন পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ঃ নেক আমলের অসীলা। এ পর্যায়েও কুরআন হাদীসের দলীল বর্তমান। কুরআনের দলীল হচ্ছে, সে দুটো আয়াত যাতে অসীলা শব্দের উল্লেখ রয়েছে। কেননা দুটো আয়াতেই 'অসীলা' শব্দের মানে "নৈকট্য' হওয়া সম্পর্কে সমস্ত মুফাস্সিরের ইজমা রয়েছে। এ পর্যায়ের তৃতীয় দলীল হচ্ছে সূরা ফাতিহার আয়াত اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ। কেবল তোমারই বন্দেগী করি আমরা হে আল্লাহ, আমরা কেবল তোমারই নিকট সাহায্য চাই হে আল্লাহ। এতে সাহায্য প্রার্থনা استعانت। এর পূর্বে ইবাদাত-এর উল্লেখ করাই হয়েছে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির অসীলা বানাবার জন্যে।

হাদীসে এর দলীল হলো বুখারী শরীফে উল্লিখিত সেই কাহিনী, যাতে বলা হয়েছে ঃ তিনজন লোক বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে পর্বত-গুহায় আশ্রয় নেয়। অমনি এক বিরাট শিলাখণ্ড এসে পর্বতগুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। মুক্তির কোনো পথ নেই মনে করে তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের নেক আমলের উল্লেখ করে আল্লাহ্র নিকট মুক্তির প্রার্থনা করতে লাগল। পরে তাদের দো'আ আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় এবং তারা মুক্তি লাভ করে। নবী করীম (স) এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন প্রশংসাচ্ছলে এবং গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে। এ হাদীস সম্পর্কে বলা যায় ঃ

জুম'আর দিন যখন সূর্য যথেষ্ট পশ্চিমে ঢলে পড়বে, তখন দু'রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করো। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, জুম'আর নামায পড়লেও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়।

হাদীসে আরো বলা হয়েছে ঃ

لٰكِنِ الثَّابِتُ مِنْهُ اِنَّمَا هُوَ تَوَسُّلُ الشَّخْصِ بِاَعْمَالِ نَفْسِهٖ لَابِاَعْمَالِ غَيْرِهٖ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ -

এ কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আমলকে অসীলা বানাতে পারে; কিন্তু অপরের— নবী ও অলী-আল্লাহ্‌দের আমলের অসীলা গ্রহণের কোনো প্রমাণ এতে নেই।

বিশেষত বান্দার নিজের নেক আমলকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করলে তাতে বান্দা আল্লাহ্‌র আরো নিকটতর হয়। আর এ কাজ কুরআন ও ইজমা উভয় দলীলের ভিত্তিতেই শরীয়তসম্মত। এতে ব্যক্তির নফস পবিত্র হয় এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের যোগ্য হয়ে গড়ে উঠে।

তৃতীয় ঃ নবী করীম (স)-কে তাঁর নবুয়্যত ও রিসালাতের ব্যাপারে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে 'অসীলা' বানান। তিনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি ঈমান এনে তাকে অসীলা ধরা। নবীর আদেশ নিষেধ মান্য করা এবং তাঁর সাহায্য করাকে অসীলা বানানো। তাঁর সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করা, তাঁর দাওয়াতকে জারী রাখা, সে বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা প্রভৃতিও অসীলা হতে পারে।

এসব জিনিসকে অসীলা বানানো মূল দ্বীনের মুতাবিক কাজ। কেননা এ অসীলা বানানো ঠিক নেক আমলকে অসীলা বানানোর পর্যায়ভুক্ত।

চতুর্থ ঃ নবীর জীবদ্দশায় তাঁর দো'আকে অসীলা বানানো, দো'আর কাজে তাঁকে শরীক করা, তাঁকে দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করানো এবং তাঁর ইন্তেকালের পরে সময়ের যে কোনো নেক লোকের দ্বারা দো'আ করানো বা দো'আয় তাঁকে শরীক করা এবং তাঁর দো'আকে অসীলা মনে করা।

হাদীসে এর দলীল এই যে, হযরত উমর (রা) একবার দুর্ভিক্ষের সময় হযরত আব্বাস (রা)-কে অসীলাস্বরূপ শামিল করে দো'আ করেছিলেন এই বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِيْنَا

(تحفة الحوذی :ج -١٠، ص- ٣٨)

হে আল্লাহ, আমরা পূর্বে আমাদের নবীকে তোমার নিকট অসীলা বানাতাম। তখন তুমি আমাদের পানি দিয়ে সিক্ত করেছিলে। এখন আমরা তোমার নিকট দো'আ কবুল হবার জন্যে তাঁর চাচাকে অসীলা বানাচ্ছি। অতএব তুমি আমাদের পানি দিয়ে সিক্ত করে দাও।

এখানে সুস্পষ্ট যে, এতদুপলক্ষে যে সামষ্টিক দো'আ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে হযরত আব্বাসই দো'আকারীদের মধ্যে শরীক ও শামিল ছিলেন। তাঁকে দো'আয় অসীলা বানিয়েছিলেন, কেননা তখন সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর মর্যাদা ছিল সকলের ওপর। হযরত মুআবিয়া (রা) ও তাঁর সঙ্গীরা ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল-জরকীকে অসীলা বানিয়েছিলেন তাঁর নেক আমল ও তাক্ওয়া পরহেযগারীর জন্য। তাঁদের সকলের পক্ষে রওযায়ে পাকে যাওয়া ও রাসূল (স)-কে অসীলা বানানো কঠিন ছিল না কিন্তু বানাননি। কাজেই এরূপ দো'আর কোনোরূপ দোষ হতে পারে না তওহীদী সুন্নাতের দৃষ্টিতে, তা হতে পারে না কোনো বিদয়াত। আরো কথা এই যে, নবী করীম (স)-এর ইন্তিকালের পরে সাহাবায়ে কিরাম স্বয়ং রাসূল (স)-কে দো'আর ক্ষেত্রে অসীলা বানাননি। কেননা মৃত লোককে সে নবীই হোন না কেন অসীলা বানানোকে তাঁরা বিদয়াত ও শির্ক মনে করতেন। হযরত উমরের দো'আয় রাসূলে করীম (স)-কে অসীলা না বানিয়ে তাঁর চাচা হযরত আব্বাসকে— যিনি জীবীত থেকে দো'আয় উপস্থিত ছিলেন। আর তাঁকে অসীলা বানানো থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ দো'আর বড় বড় সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাঁরা কেউই এর প্রতিবাদ করেননি। তখনো যদি রাসূলকে অসীলা বানানো জায়েয হতো, তাহলে অন্যান্য সাহাবীরা তাঁকে তা-ই করতে বলতেন। কিন্তু তা কেউই বলেননি; বরং এ দো'আয় তাঁরা সকলেই শরীক রয়েছেন। আর রাসূলকেই যদি মৃত্যুর পর অসীলা বানানো বিদয়াত হয়ে থাকে, তাহলে অলী আল্লাহ্ কথিত মরে যাওয়া লোকদের কাউকে অসীলা বানানো তো একশবার বিদয়াত হবে। কেননা মরে যাওয়ার পরও কাউকে বিশেষ ক্ষেত্রে দো'আয় অসীলা বানানোর মানে এই যে, তার সম্পর্কে ধারণা করা হচ্ছে যে, সে মরে গিয়েও এতদূর ক্ষমতা রাখে যে, সে বিপদগ্রস্ত লোকদের উদ্ধার করতে পারে বা উদ্ধার কাজে আল্লাহ্র সাথে শরীক হতে পারে। আর এরূপ আকীদাই তওহীদী শরীয়তের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট শির্ক।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক বেদুঈন এক কঠিন দুর্ভিক্ষের সময় রাসূলে করীম (স)-কে লক্ষ্য করে বলেছিল ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا -

হে আল্লাহ্র রাসূল, ধন-মাল ধ্বংস হয়ে গেছে; পরিবার-পরিজন অভুক্ত হয়ে আছে। অতএব আপনি আমাদের জন্যে দো'আ করুন।

আল্লাহ্র কুরআন মজীদেও এর দলীল রয়েছে। আল্লাহ নিজেই ইরশাদ করলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَّلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ وااللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُ وااللّٰهَ تَوَّ بَارَّحِيْمًا - (النساء : ٦٤)

তারা যখন নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল তখন যদি তারা হে নবী! তোমার নিকট আসত এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো আর রাসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা চাইত, তাহলে তারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্কে তওবা কবুলকারী ও দয়াবান হিসেবে পেত।

এ আয়াতে লোকদের জন্য রাসূলের ক্ষমা চাওয়ার পূর্বে তাদের নিজেদের ক্ষমা চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তার অর্থ, তারা নিজেরা ক্ষমা না চাইলে তাদের জন্য রাসূলের ক্ষমা চাওয়ার কোনো মূল্য আল্লাহ্র নিকট নেই।

এ ধরনের 'অসীলা' গ্রহণের ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই— থাকতে পারে না, কিন্তু নবী করীমের মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিত্বকে আল্লাহ্র নৈকট্যের জন্যে অসীলা বানানো স্পষ্টত বিদয়াত।

পঞ্চম ঃ আল্লাহ্র নিকট তাঁর নেক বান্দাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দেখিয়ে দো'আ করা। যেমন হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ -

হে আমাদের আল্লাহ, যিনি জিবরাইল, মিকাইল ও ইসরাফীলের রব্ব।

এরূপ দো'আ করা জায়েয মনে করা হলেও অনেকেই একে নাজায়েয বলেছেন।

ষষ্ঠ ঃ নবী করীমের প্রতি দরূদ পাঠনোকে অসীলা বানানো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَتْ لَهُ اِلَى اللّٰهِ حَاجَةٌ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ ثُمَّ لِيَقُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ - (ترمذى، ابن ماجه)

আল্লাহ্‌র নিকট যার কোনো প্রয়োজন দেখা দেবে কিংবা কোনো মানুষের নিকট, সে যেন খুব ভালো করে অযূ করে এবং দু'রাকাআত নামায পড়ে, আল্লাহ্‌র ভালো প্রশংসা করে এবং নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করে, তারপর বলে আল্লাহ ধৈর্যশীল ও অনুগ্রহ সম্পন্ন, তিনি ছাড়া কেউ-ই মা'বুদ নেই।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করার এগুলোই হলো ইসলাম ও সুন্নাত মুস্তাহাব নিয়ম। এছাড়া অন্য কোনো নিয়মে ও পন্থায় দো'আ করা ঈমানদার লোকদের পক্ষে জায়েয নয়।

হারাম : এরূপ দো'আ করা :

হে আল্লাহ্, আমি তোমার নিকট তোমার অমুক নেক বান্দার দোহাই দিচ্ছি বা তার সম্মানের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট দো'আ করছি।

কিন্তু এ ধরনের দো'আ শরীয়তে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। ইজ্জ ইবনে আবদুস সালাম ও তাঁর অনুসারীদের মতে কেবল নবীর নামেই এরূপ দোহাই দেয়া জায়েয হতে পারে, অন্য কারো নামে জায়েয নয়। হাম্বলী মাযহাবে এরূপ দো'আ করা মাকরূহ তাহরীম। 'কুদূরী' প্রমুখ হানাফী মাযহাবের ফকীহ্‌গণ ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন :

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ لَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّدْعُوَ اللّٰهَ اِلَّا بِهٖ وَاَكْرَهُ اَنْ يَّقُوْلَ اَسْئَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ بِعَرْشِكَ وَاَنْ يَّقُوْلَ بِحَقِّ فُلَانٍ وَبِحَقِّ اَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَبِحَقِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ -

ইমাম আবু হানীফা (রা) বলেছেন : আল্লাহ্‌র নিকট, আল্লাহ্‌র নামে ছাড়া অন্য কারো দোহাই দিয়ে দো'আ করা কারো পক্ষেই উচিত হতে পারে না। 'হে আল্লাহ, তোমার আরশের মর্যাদা বন্ধনের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করি; অমুকের দোহাইতে দো'আ করি, তোমার নবী ও রাসূলগণের দোহাই দিয়ে দো'আ করি বা তোমার মহান ঘরের দোহাই দিয়ে দো'আ করি', এরূপ বলে দো'আ করাকেও আমি মাকরূহ মনে করি। (قال ابو الحسن القدورى فى شرح كتاب الكرخى)

ইমাম আবু হানীফা (রহ) থেকে তাতারখানিয়া এবং তাঁর থেকে شرح التزير কিতাবে আল-আলায়ী উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ

لَا يَنْبَغِى لِاَحَدٍ اَنْ يَّدْعُوَ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَا لٰى اِلَّابِهٖ -

আল্লাহ সুবহানাহুর নিকট তাঁর নিজের দোহাই ছাড়া অপর কারো দোহাই দিয়ে (অসীলা বানিয়ে) দো'আ করা কিছুতেই উচিত নয়।

ইবনে বদলজী বলেছেন ঃ

وَيَكْرَهُ اَنْ يَّدْعُوَ اللّٰهَ اِلَّابِهٖ وَ لَا يَقُوْلُ : اَسْئَلُكَ بِمَلَائِكَتِكَ وَ اَنْبِيَائِكَ -

(شرح المختار)

আল্লাহর নিকট আল্লাহ ছাড়া অপর কারো অসীলায় দো'আ করা মাকরূহ। আর 'হে আল্লাহ তোমার নিকট তোমার ফেরেশতা ও নবীগণের অসীলায় প্রার্থনা করি' বলবে না কখনো।

হানাফী মাযহাবের সব কিতাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী-রাসূল ও অলী-পীর বা আল্লাহর ঘর ইত্যাদিকে অসীলা করে দো'আ করা মাকরূহ তাহরীম। আর জাহান্নামের আযাবের দিক দিয়ে মাকরূহ তাহরীম হারামের সমান।

আল্লাহর নিকট অপর কারো দোহাই দিয়ে দো'আ করা বা অন্য কাউকে অসীলা বানানো হারাম কেন? .... হারাম এ জন্যে যে ঃ

لِاَنَّهٗ لَاحَقَّ لِاَحَدٍ مِّنَ الْمَخْلُوْقِ عَلَى الْخَالِقِ -

কেননা মাখলুকের মধ্যে কারোই কোনো হক্ নেই সৃষ্টিকর্তার ওপর। তাই এ দোহাই চলতে পারে না। দোহাই দিলে বা কাউকে অসীলা বানালে তা হবে অর্থহীন।

কাজেই মুসলিম সমাজে এরূপ করা সুস্পষ্টরূপে বিদয়াত।

মক্কার কাফির-মুশরিকগণ যে সব মূর্তি দেব-দেবী পূজা উপাসনা করতো আল্লাহ আছেন— তিনি এক ও একক— একথা জানা থাকা ও তার স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও। তাদেরও তো মূল লক্ষ্য সেগুলোর পূজা-উপাসনা ইবাদত ছিল না, মূল লক্ষ্য ছিল একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য লাভ, আল্লাহর নিকট ঘনিষ্ট হওয়া, উচ্চতর মর্যাদা পাওয়া। মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা-উপাসনাকে তারা সেই লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যমে বা অসীলা রূপেই তো গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের

এই কাজকে আল্লাহ্ শির্ক বলেছেন, তাদেরকে হেদায়েত-বঞ্চিত ও মিথ্যাবাদী কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিতে এই কথাই বলা হয়েছে ঃ

اَ لَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِىْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ - (الزمر ٣)

জেনে রাখো, আল্লাহ্র জন্যে তো খালিস অবিমিশ্র আনুগত্য হতে হবে। আর যারা আল্লাহ্রকে বাদ দিয়ে অন্যান্যদের বন্ধু-পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করে এই বিশ্বাস পোষণের দাবি নিয়ে যে, আমরা তো আসলে ওদের ইবাদত করি না— ওদের প্রতি যা কিছু করি, তা তো এই উদ্দেশ্যে যে, ওরাই আমাদেরকে আল্লাহ্র অতী ঘনিষ্ট নৈকট্যে পৌঁছে দেবে (তাদের এই কথা অসত্য, অযথার্থ) আল্লাহ্ই তাদের পারস্পরিক মত-পার্থক্যের ব্যাপারাদির চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন। মনে রেখো আল্লাহ্ কখনোই মিথ্যাবাদী চরম মাত্রার কাফিরকে হেদায়েত দেন না।

এ আয়াতের আলোকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, সেকালের আরব জনগণ আল্লাহ্কে পাওয়ার, তাঁর নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে মূর্তি ও দেব-দেবীর প্রতি যে আচরণ করতো, আজকের দিনের সেই প্রকৃতির লোক আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের লক্ষ্যে পীর-দরবেশদের প্রতি ঠিক সেই আচরণই গ্রহণ করছে। এ দু'টির মধ্যে মৌলিক কোনোই পার্থক্য নেই। তাহলে আবরদের সেই কাজ যদি শির্ক গণ্য হয়ে থাকে এবং তাদের মৌলিক দাবিকে আল্লাহ্ অসত্য ধরে নিয়ে তাদের স্পষ্ট ভাষায় মিথ্যাবাদী বলে থাকেন। তাহলে আজকের দিনের এই অসীলা গ্রহণকারী লোকেরা আল্লাহ্র নিকট 'মিথ্যাবাদী' আখ্যায়িত হবে না কেন ? আর তাদেরকে যদি কেবল এজন্যই কাফির হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তাহলে আজকের দিনের এই সব বড় বড় অসীলা গ্রহণকারীরা 'কাফির' বলে অভিহিত হবে না কেন ?

আল্লাহ্র নিকট কি সেকাল ও একাল এবং আরব ও এদেশের লোকদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য বা তারতম্য আছে ?

سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

অত্যন্ত খারাপ কথা, যা তারা বলছে বা মনে করছে।

পীর-মুরীদীর বিদয়াত

ইসলামের সুন্নাতী আদর্শে আর একটি মারাত্মক ধরনের বিদয়াত দেখা দিয়েছে— তা হলো পীর-মুরীদী। পীর-মুরীদীর যে 'সিলসিলা' বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে, এ জিনিস সম্পূর্ণ নতুন ও মনগড়াভাবে উদ্ভাবিত। এ জিনিস রাসূলে করীম (স)-এর যুগে ছিল না, তিনি পীর-মুরীদী করেননি কখনো। তিনি নিজে বর্তমান অর্থে না ছিলেন পীর আব না ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর মুরীদ। সাহাবায়ে কিরামও এ পীর-মুরীদী করেননি কখনো। তাঁদের কেউই কারো পীর ছিলেন না এবং কেউ ছিল না তাঁদের মুরীদ। তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের যুগেও এ পীর-মুরীদীর নাম-চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

শুধু তা-ই নয়। কুরআন-হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এ পীর-মুরীদীর কোনো দলীলের সন্ধান পাওয়া যাবে না। অথচ বর্তমানকালের এক শ্রেণীর পীর নামে কথিত জাহিল লোক ও তাদের ততোধিক জাহিল মুরীদ এ পীর-মুরীদীকে দীন-ইসলামের অন্যতম ভিত্তিগত জিনিস বলে প্রচারণা চালাচ্ছে। আর এর মাধ্যমে অজ্ঞ মূর্খ লোকদের মুরীদ বানিয়ে এক একটি বড় আকারের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। যদিও তাতে কোনো মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় নি এবং বিপুল লাভজনক ব্যবসায়ে সঞ্চিত মূলধনে কোনো আয়করও দিতে হয় না। আর সঞ্চিত নগদ বিপুল অর্থের যাকাতও দেয়া হয় না কখনও।

শরীয়ত মারিফাত

এ পর্যায়ে সবেচেয় মৌলিক বিদয়াত হলো শরীয়ত ও তরীকতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পর সম্পর্কহীন দুই স্বতন্ত্র জনিস মনে করা। এতোদূর পতন ঘটেছে যে, শরীয়তকে 'ইল্‌মে জাহের' এবং 'তরীকত বা মরিফাতকে ইল্‌মে বাতেন বলে অভিহিত করে দীন-ইসলামকেই দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর জাহিল তরীকতপন্থী বলতে শুরু করেছে যে, ইসলামের আসলই হলো তরীকত মারিফাত, আর এ-ই হাকীকত। এ হাকীকত কেউ যদি লাভ করতে পারল, তাহলে তাকে শরীয়ত পালন করতে হয় না, সেতো আল্লাহ্‌কে পেয়েই গেছে। তাদের মতে শরীয়তের আলিম এক আর মারিফাত বা তরীকতের আলিম অন্য। এই তরীকতের আলিমরাই উপমহাদেশে পীর নামে

অভিহিত হয়ে থাকেন। ধারণা প্রচার করা হয় যে, কেউ যদি শরীয়তের আলিম হয় আর সে তরীকতের ইল্‌ম না জানে— কোনো পীরের নিকট মুরীদ না হয়, তবে সে ফাসিক।

তাসাউফকে সাধারণ বলা হয় মারিফাত (معرفت) প্রখ্যাত অলী-আল্লাহ হযরত জুনাইদ বাগদাদী এ মারিফাত-এর মূল্যহীনতা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ

اَلْعِلْمُ اَرْفَعُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَ اَتَمُّ وَ اَكْمَلُ تُسَمَّى اللّٰهُ بِالْعِلْمِ وَلَمْ تُسَمَّى بِالْمَعْرِفَةِ وَ قَالَ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ لَمَّا خَاطَبَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاطَبَهُ بِاَتَمِّ الْاَوْصَافِ وَ اَكْمَلِهَا وَ اَشْمَلِهَا لِلْخَيْرَتِ فَقَالَ فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يَقُلْ فَاعْرِفْ لِاَنَّ الْاِنْسَانَ قَدْ يَعْرِفُ الشَّيْئَ وَ لَا تُحِيْطُ بِهِ عِلْمًا وَ اِذَا عَلِمَهُ وَ اَحَاطَ بِهِ عِلْمًا فَقَدْ عَرَفَهُ - (كتاب الميثاق، كتاب الطلرسين : ص - ١٩٠)

মারিফাতের তুলনায় ইল্‌ম অনেক উন্নত, সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। আল্লাহ্ নিজে ইল্‌ম এর নামে অভিহিত হয়েছে, মারিফাতের নামে নয়।[১] আর তিনি বলেছেন ঃ যারা ইল্‌ম লাভ করেছেন, তাদেরই উচ্চ মর্যাদা। এ ছাড়া তিনি যখন নবী করীম (স)-কে সম্বোধন করলেন, সম্বোধন করলেন সর্বোত্তম, অধিকতর ব্যাপক কল্যাণময় ও পূর্ণাঙ্গ এক গুণ উল্লেখ করে।

আর বলেছেন ঃ

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - (محمد : ١٩)

'তুমি জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া কোনোই মা'বুদ নেই'। কিংবা

فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاءَ هُمْ ط وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هدى مِّنَ اللّٰهِ - (القصص ٥٠)

অতঃপর জানবে যে, এই লোকেরা নিজেদের কামনা-বাসনাকে অনুসরণ করে চলছে। আর যারাই নিজেদের কামনা-বাসনা অনুসরণ করে চলে, তাদের চাইতে অধিক গোমরাহ্ আর কে হতে পারে।

---

১. অর্থাৎ কুরআনে আল্লাহ عالم عليم কে বলা হয়েছে, কিন্তু عارف বা عريف বলা হয়নি। এ নিশ্চয়ই অর্থহীন নয়।

পীর-মুরীদী সম্পর্কে এই আয়াত খুবই প্রযোজ্য। কিন্তু تَعَرَّفْ 'মারিফাত হাসিল করো' একথা কোথাওই বলেননি। কেননা মানুষ একটা জিনিসকে চিনতে পারে; কিন্তু তার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। আর যখন সে জিনিস সম্পর্কে ইল্ম হলো, সম্যকভাবে সে সম্পর্কে জানতে পারল, তখন তাকে চিনতেও পারল।

হযরত জুনাইদের একথার সারমর্ম হলো এই যে, মারিফাতের চাইতে 'ইলম' বড়। অতএব আল্লাহ্র মারিফাত নয়, আল্লাহ সম্পর্কে ইল্ম হাসিল করতে হবে। 'ইল্ম' হাসিল হলেই 'মারিফাত' লাভ হতে পারে। আর যার ইল্ম নেই, সে মারিফাতও পেতে পারে না। এ ইল্ম-এর একমাত্র উৎস হলো আল্লাহ্র কুরআন এবং রাসূলের হাদীস। কুরআন-হাদীসের মাধ্যমেই আল্লাহ্কে জানতে হবে এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ফলেই মানুষ পারে আল্লাহ্কে জানতে ও চিনতে— অন্য কোনো উপায়ে নয়।

কিন্তু তাসাউফবাদীরা এ মারিফাতকে কেন্দ্র করে গোলক ধাঁধার এক প্রাসাদ রচনা করেছে। তাদের মতে মারিফাত বা ইল্মে বাতেন এক সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত কর্মপন্থা, ইসলামী শরীয়ত থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জিনিস। তাদের মতে রাসূলে করীম (স) নাকি এ মারিফাত তাঁর কোনো কোনো সাহাবীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর অনেককে দেন নি। তাঁরা আরো মনে করেন, ইল্মে বাতেন হযরত আলী (রা) থেকে হাসান বসরী পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর তাঁরই থেকে সীনায় সীনায় এ জিনিস চলে এসেছে এ কালের পীরদের পর্যন্ত।

এই সমস্ত কথাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা রাসূলে করীম (স) কাউকেই এ জিনিস শিখিয়ে যান নি, যা এখনকার পীর তার মুরীদকে শিখিয়ে থাকে। তিনি এরূপ করতে কাউকে বলেও যান নি। কোনো দরকারী ইল্ম তিনি কোনো কোনো সাহাবীকে শিখিয়ে দেবেন, আর অনেক সাহাবীকেই তা থেকে বঞ্চিত রাখবেন— এরূপ করা নবী করীমের নীতি ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাছাড়া হাসান বসরী হযরত আলী (রা)-এর সাক্ষাৎ পাননি, তাঁর নিকট থেকে মারিফাত শিক্ষা করা ও খিলাফতের 'খিরকা' লাভ করা তো দূরের কথা। আল্লামা মুল্লা আলী আল-কারী আল্লামা ইবনে হাযার আল-আসকালানীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ

اِنَّهٗ لَيْسَ فِىْ شَيْءٍ مِّنْ طُرُقِهَا مَايُثَبِّتُ وَلَمْ يَرِدْ فِىْ خَبْرٍ صَحِيْحٍ وَلَاحَسَنٍ وَلَا
ضَعِيْفٍ اَنَّ النَّبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَسَ الْخِرْقَةَ عَلَى الصُّوْرَةِ الْمُتَعَارِفَةِ

بَيْنَ الصُّوفِيَّةِ لِأَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا أَمَرَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِهِ بِفِعْلِ ذٰلِكَ وَكُلُّ مَا يُرْوٰى مِنْ ذٰلِكَ صَرِيْحًا فَبَاطِلٌ - ثُمَّ أَنَّ مِنَ الْكَذِبِ الْمُفْتَرٰى قَوْلُ مَنْ قَالَ أَنَّ عَلِيًّا أَلْبَسَ الْخِرْقَةَ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيْثِ لَمْ يُثْبِتُوْا لِلْحَسَنِ مِنْ عَلِيٍّ سِمَاعًا فَضْلًا عَنْ أَنْ يُّلْبِسَهُ الْخِرْقَةَ - (الموضوعات الكبير : ص - ٩٥)

সূফী ও মারিফাতপন্থীরা যে সব তরীকা ও নিয়ম-নীতি প্রমাণ করতে চায়, তা প্রমাণ হওয়ার মতো কোনো জিনিস-ই নয়। সহীহ, হাসান বা যয়ীফ কোনো প্রকার হাদীসেই এ কথা বলা হয়নি যে, নবী করীম (স) তাঁর কোনো সাহাবীকে তাসাউফপন্থীদের প্রচলিত ধরনের খিলাফতের 'খিরকা' (বিশেষ ধরনের জামা বা পোষাক) পরিয়ে দিয়েছেন। সেরূপ করতে তিনি কাউকে হুকুমও করেননি। এ পর্যায়ে যা কিছু বর্ণনা করা হয়, তা সবই সুস্পষ্টরূপে বাতিল। তাছাড়া হযরত আলী হাসান বসরীকে 'খিরকা' পরিয়েছেন (মারিফাতের খিলাফত দিয়েছেন) বলে যে দাবি করা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে মনগড়া মিথ্যা কথা। কেননা হাদীসের ইমামগণ প্রমাণ করতে পারেন নি যে, হাসান বসরী হযরত আলীর নিকট থেকে কিছু শুনেছেন— তাঁকে হযরত আলীর 'খিরকা' পরিয়ে দেয়া তো দূরের কথা।

মুল্লা আলী আল-কারী আরও লিখেছেন ঃ

وَكَذَا نِسْبَةُ التَّلْقِيْنِ الْمُتَعَارِفِ بَيْنَ الصُّوْفِيَّةِ لَا أَصْلَ لَهُ - (ايضا)

এমনিভাবে তাসাউফপন্থীদের মাঝে মুরীদকে তালকীন করা— রূহানী ফায়েয দেবার যে ব্যাপারটি চালু করেছে, তাকে হাসান বসরীর সূত্রে হযরত আলীর সাথে সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়ারও শরীয়তে কোনোই ভিত্তি নেই।

বস্তুত তাসাউফপন্থী লোকদের এ একটা অমূলক ধারণা মাত্র। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহ্লভী এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

جواب قوله ہمه این سلا سل متو جه اند به مرتضی کرّم الله وجہہ اتصال سلاسل به حضرت مرتضی امرے است مشهور برالسنه صوفیه ونزدیك تفتیش آن را اصلے ظاہر نمی شود - (قرة العینین ص -٢٩٩)

সূফী বা তাসাউফপন্থীদের কথা যে, এসব তরীকতের সিলসিলা হযরত আলী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে— এর জবাব এই যে, এটি পীর-মুরীদের মুখে ধ্বনিত ও প্রসিদ্ধ একটি কথা, কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, এ কথার মূলে কোনোই ভিত্তি ও সত্য নেই।

এ পর্যায়ে তিনি আরও লিখেছেন যে, প্রসিদ্ধ দু'রকমের হয়ে থাকে। এক রকমের প্রসিদ্ধ কথা যা সব জ্ঞানী-মনীষীদের নিকটই প্রসিদ্ধ। আর এক প্রকারের প্রসিদ্ধ কথা হলো, যা কেবল মাত্র একদল লোকের নিকট প্রসিদ্ধ। হযরত আলীর নিকট থেকে মারিফাতের ইল্‌ম শুরু এ কথাটা কেবল এই সূফী-পীরদের নিকটই প্রসিদ্ধ; অন্য কারোরই একথা জানা নেই। আসলে এ কথাটাই বাতিল। কিংবা বলা যায়, একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। শেষের জামানার লোকেরা এটাকে রচনা করেছে ও কবুল করেছে। আর এ ধরনের কথা আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। (ঐ ৩৯৯ পৃ.)

মারিফাতের যেসব তরীকা, মুরাকাবা-মুশাহিদা ও যিকির এখনকার পীরেরা তাদের মুরীদদের শিখিয়ে থাকে, তা যে রাসূলে করীম (স) বা সাহাবায়ে কিরামের জামানায় ছিল না, শাহ্ দেহলভী সে কথাও ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

باید دانست که رسوم صوفیا ، ورسم تصوف درزمان صحابه وتابعین نه بوده ترک اکتساب ولباس مر قع وترک نکاح ونشتن درخانقاہات دران زمان عادت نه داشتند –
(قره العینین ص- ٣٠٣ ، مطبع مجتبائی ، دهلی ١٣١٠ هجر)

জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে, সূফী-পীরদের তাসাউফের রীতিনীতি সাহাবা ও তাবেয়ীদের জামানায় ছিল না। উপায়-উপার্জন ত্যাগ করা, তালিযুক্ত পোশাক পরা ও বিয়ে ঘর-সংসার না করা ও খানকার মধ্যে বসে থাকা সেকালে প্রচলিত ছিল না।

মারিফাত পন্থীদের বিশ্বাস, মারিফাতের এ কর্মপন্থা পুরোপুরি অনুসরণ করে চললেই পথিক— সালেক— নিগূঢ় তত্ত্ব (হাকীকত)-কে জানতে পারে। আর শেষ পর্যন্ত এ মারিফাত এই তত্ত্ব লাভ করে যে, বাহ্য দৃশ্যমান এ জিনিসগুলো নির্ধারণ হিসেবে যদিও আল্লাহ থেকে ভিন্ন জিনিস; কিন্তু মূল ব্যাপারের দৃষ্টিতে তা-ই হলো মূল আল্লাহ। আল্লাহ ও বাহ্যিক দৃশ্যমান জিনিসগুলোর মাঝে যে পার্থক্য মনে হচ্ছে, তা হলো আমাদের ভ্রম। অর্থাৎ বাইরে দৃশ্যমান বর্তমান জিনিসের বৈচিত্র্য ও বিপুলতা দৃষ্টির ধোঁকা বা মায়া। অন্য কথায় বলা চলে, এ কর্মপন্থা অনুসরণ করলে মানুষ শেষ পর্যন্ত দৃষ্টিভ্রম থেকে মুক্তি পেতে পারে।

আর তখন মনে হয়, এক আল্লাহ্‌কেই এই বিপুলতার রূপে দেখতে পাচ্ছি। এ লোকদের মতে এ-ই হচ্ছে তওহীদের মারিফাত।

কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এসব তত্ত্বকথাই হচ্ছে বেদ-উপনিষদের দর্শন— বেদান্তবাদ। আর এ দর্শনের সঠিক পরিচয় হলো অদ্বৈতবাদ। মানে, আল্লাহ ও জগত কিংবা স্রষ্টা ও সৃষ্টি আসলে এক ও অভিন্ন। যা সৃষ্টি তাই স্রষ্টা এবং যিনি স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টি। অদ্বৈতবাদী মতাদর্শের এই হলো গোড়ার কথা। আর তা-ই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব, যা বর্তমানে পীর-মুরীদী ধারায় ইসলামের মারিফাত নাম ধারণ করে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে এবং এ যে সুস্পষ্ট শির্‌ক তাতে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই।

বস্তুত ইসলাম এক সর্বাত্মক দীন। এতে এক ব্যক্তির মন-হৃদয় অন্তর একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে খালিস করে দেয়ার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের সর্বদিক ও বিভাগ, সব কাজ ও বিষয় সম্পর্কেই বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে। তাতে শরীয়ত ও তরীকত কোনো বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিপরীত জিনিস নয়। যেমন দুই বিপরীত জিনিস নয় ব্যক্তির দেহ ও মন। দেহ ও মনের সমন্বয়েই যেমন মানুষ, তেমনি শরীয়ত-তরীকত বা মারিফাত সবই একই জিনিসের এদিক-ওদিক— বাহির ও ভিতর এবং একই কুরআন হাদীস থেকে উৎসারিত। কুরআন থেকেই পাওয়া যায় আল্লাহ্‌র সঠিক ও সার্বিক পরিচয়, তাঁর যাত ও সিফাত সংক্রান্ত নাম এবং তাঁর কুদরতের বিচিত্র বর্ণনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। কুরআন থেকেই জানা যায় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার, তাঁর বন্দেগী কবুল করার এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে তাঁর আদেশ নিষেধ পালন করার শরীয়তী বিধান। এগুলোর নিগূঢ় তত্ত্ব, মাহাত্ম্য ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যখন মানুষের মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনি তা হয় তরীকত বা মারিফাত। মানুষ যখন শরীয়ত মুতাবিক আমল করে, তখন হয় শরীয়তের আমল। আর এই আমল যদি ইখলাস, আল্লাহ্‌র ভয় ও আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় সিক্ত ও সঞ্জীবিত হয়ে উঠে, আল্লাহ্‌কে সব সময় হাজের-নাজের অনুভব করতে পারে, তখনি তা হয় মারিফাত বা তরীকত। ইল্‌ম ও আমলের মাঝে যদ্দিন দ্বন্দ্ব থাকবে মনে, ততোদিন তা হবে শরীয়ত পর্যায়ের ব্যাপার। আর যখন এ দ্বন্দ্বে মন অন্তর মুতমায়িন হবে, পুরোপরিভাবে আত্মসমর্পণ করবে আমলের নিকট, আমলময় হয়ে উঠবে জীবন, তখন তরীকত বা মারিফাত অর্জিত হলো বলা যাবে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী লিখেছেন ঃ

"হাকীকতকে শরীয়ত থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন জিনিস মনে করে নিও না।" আসলে 'হাকীকত' শরীয়তেরই আসল জাওহার ও মূল প্রাণ-বস্তু। আর শরীয়ত হচ্ছে হাকীকতেরই বাহ্য রূপ ও অবয়ব।

শরীয়ত হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম (স) যা কিছু বলেছেন তা বিশ্বাস করতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। আর 'হাকীকত' হচ্ছে এই যে, যেসব বিষয়ে ইয়াকীন রয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাসটা যেন সর্বাধিক দৃঢ় ও প্রত্যক্ষ عين اليقين হয়ে ওঠে।

শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী কুদ্দেসা সিররুহুশ বলেছেন ঃ "যে হাকীকত শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করবে, তাই 'জান্দাকা'— "দ্বীন বিরোধিতা" এ বাক্যের অর্থ হলো, কেউ যদি এমন কাশফ লাভ করে, যা দ্বীন ও শরীয়ত মুতাবিক নয়, আর সে যদি তাকেই নিজের আকীদা বানিয়ে নেয়, তাহলে সে কাফির ও জিন্দীক হয়ে যাবে।

আবু সালমান দুররানী বলেন ঃ "অনেক সময় সলুক— পথের 'অজুদ' ও শোকর-এর কোনো তত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়; কিন্তু আমি তা কবুল করি না। আমি বলি, দু'জন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য সাক্ষী তোমার সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে যতক্ষণ না সাক্ষ্য দেবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারিনে। আর এ দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী কে ? তাহলো আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত।" (শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী, মকতুব নং ১৩)

বস্তুত এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, নেই কোনো বিরোধ বা দ্বন্দ্ব, নেই কোনোরূপ দ্বৈততা। বরং সত্য কথা এই যে, এখানে তরীকত বা মারিফাতের যে পরিচয় দেয়া হলো, তা-ই হলো প্রকৃতপক্ষে দ্বীন-ইসলাম। এই অখণ্ড ইসলামই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, কুরআন এই দ্বীন ইসলামই পেশ করেছে, নবী করীম (স) তাঁর জীবন, চরিত্র, আমল ও যাবতীয় কাজের মাধ্যমে এই অবিচ্ছিন্ন দ্বীনকেই দুনিয়ার সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন এবং এ সম্পূর্ণ জিনিসেরই নাম হলো কুরআনের ভাষায় শরীয়ত شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنَ আয়াত অনুযায়ী। কাজেই না এ শরীয়তকে অস্বীকার করতে পারে কোনো মুসলমান, না এ তরীকত বা মারিফাতকে। তাসাউফের বিশেষজ্ঞ মনীষীদের মতে তাসাউফ হলো ঃ اَلتَّصَوُّفُ خُلُقٌ حَسَنٌ —উত্তম চরিত্রই তাসাউফ (كشف المحجوب)। কিন্তু উত্তরকালে শরীয়ত আর তরীকত দুটো বিচ্ছিন্ন জিনিস হয়ে গিয়ে দুই বিপরীত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। শরীয়ত তো কুরআন ও সুন্নাতের ভিত্তিতে অবিকৃত অপরিবর্তিত রয়েছে— থাকবে চিরদিন; কিন্তু তরীকত আর মারিফাতের নামে যে অলিখিত ও 'সীনা-বা-সীনা' চলে আসা স্বতন্ত্র জিনিসটি মথাচাড়া দিয়ে উঠল, তাতে উত্তম নির্মল চরিত্রের কোনো গুরুত্বই থাকল না; তাতে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল নানাবিধ শিরকের আবর্জনা। আর এ ক্ষেত্রে এ-ই হলো বিদয়াত।

মারিফাত বা তরীকত শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে যখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় বইতে লাগল, তখন তাতে এসে জমলো এমন সব জিনিস যা শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাত থেকে গৃহীত নয়। তাতে শামিল হলো গ্রীক দর্শন, প্রাচীন মিসরীয় দর্শন এবং ভারতীয় বেদান্ত দর্শন। এ সবের সমন্বয়ে মারিফাত বা তরীকতের এই স্বতন্ত্র ইল্‌ম গড়ে উঠল; যার নাম রাখা হলো 'ইল্‌মে তাসাউফ' বা শুধু তাসাউফ (تصوف)। অথচ পূর্বে কোনো যুগেই এ নামের কোনো ইল্‌ম ইসলামে ছিল না, তাই মুসলমানরা জানত না যে, ইসলামে শরীয়ত ও মারিফাতের দ্বৈততার ধারণা এক অতি বড় বিদয়াত। যেমন অতি বড় বিদয়াত হচ্ছে ইসলামে ধর্ম আর রাজনীতিকে দুই বিচ্ছিন্ন জিনিস মনে করা। ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন করে রাজনীতির ক্ষেত্রে ফাসিক-কাফির-জালিম লোকদের কর্তৃত্ব কায়েম করা হয়েছে। আর দ্বীনকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে শুধু নামায-রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যে। অনুরূপভাবে শরীয়ত আর তরীকতকে বিচ্ছিন্ন করে সৃষ্টি হয়েছে এক শ্রেণীর জাহেল পীর। মুসলিম সমাজে চলেছে পীরবাদ নামে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মুশরিকী প্রতিষ্ঠান। এ পীরবাদ চিরদিনই ফাসিক-ফাজির-জালিম শাসকদের— রাজা বাদশাদের— আশ্রয়ে লালিত-পালিত ও শাখায় পাতায় সুশোভিত হয়েছে। সাধারণত পীরেরা চিরদিনই এ ধরনের শাসকদের সমর্থন দিয়েছে। তারা কোনো দিনই জালিম-ফাসিক শাসকদের বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি করেনি। বরং সব সময়ই "আল্লাহ্ আপকা হায়াত দারাজ করে" বলে দুহাত তুলে তাদের জন্য দো'আ করেছে।

তাসউফের গতি ইসলামের বিপরীত দিকে

ইসলামী অধ্যাত্মবাদের মূল উৎস যদিও শুরুতে কুরআন ও সুন্নাতই ছিল; কিন্তু উত্তরকালে বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে গিয়ে তা তাসাউফের নাম ধারণ করে এবং তার আদর্শ ও লক্ষ্য কুরআন সুন্নাতের আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। দু'টোর তুলনামূলক অধ্যয়নে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তাসাউফের আদর্শের ক্ষেত্রে এসে ইসলামের কোনো কোনো মৌল আদর্শ ও লক্ষ্য ম্লান এবং উপেক্ষিত হয়ে পড়েছে, আর কোনো কোনো খুটিনাটি বিষয় মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। কোনো কোনো ভাবধারা তাসাউফে এসে অধিক তীব্র ও প্রকট এবং কোনো-কোনোটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। কোনো কোনো ইসলামী ধারণা তাসাউফের ক্ষেত্রে এসে সম্পূর্ণ নতুন অর্থ ধারণ করেছে। আর কোনো কোনোটির অর্থ ও তাৎপর্য আংশিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আবার ইসলামের অনেকগুলো জরুরী দিককে তাসাউফ

সম্পূর্ণ উপক্ষোই করেছে এবং কোনো কোনো দিক দিয়ে বাইরের অনেক জিনিসই শমিল হয়ে পড়েছে তাসাউফের মধ্যে।

এখানে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ না থাকলেও সংক্ষেপে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করছি— যেন কেউ ধারণা না করে বসেন যে, তাসাউফের প্রতি শত্রুতা পোষণের কারণেই এসব কথা বলা হচ্ছে। কেননা তা আদৌ সত্য নয়। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যাচ্ছে।

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে 'আমল' ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু তাসাউফে এসে তার ক্ষেত্র হয়ে যায় একেবারে সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ। মানুষের সামাজিক জীবন, সামাজিক সমস্যা, প্রয়োজন জটিলতার সুষ্ঠু ও কার্যকর সমাধান বের করা ইসলামের লক্ষ্য; কিন্তু এসব জিনিসের প্রতি তাসাউফ পন্থীদের কোনো আগ্রহ ও কৌতুহলই নেই। এসব জিনিস তাদের তৎপরতার সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থিত। ইসলামের প্রাথমিককালে 'ফিকির', 'জযবা' ও 'আমল'— এ তিনটির মাঝে পরস্পর গভীর সম্পর্ক ও পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষিত ছিল; কিন্তু তাসাউফপন্থীরা আবেগ ও কলবী-কাইফিয়াতের (قلبی کیفیات) ওপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করে যে, তদ্দরুন আমল— বিশেষ করে চিন্তা বা 'ফিকির' এর গুরুত্ব কম হয়ে গেছে কিংবা আদৌ থাকেনি। আল্লাহর ভালোবাসা (محبت) দ্বীন-ইসলামের মৌল ভাবধারা। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে এ ভালবাসা 'আমল' থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা কোনো জিনিস ছিল না, তেমন কিছু হবারও স্বীকৃতি পায়নি কোনো দিন বরং আল্লাহর ভালোবাসা ছিল এমন এক প্রাণ উদ্দীপক ভাবধারা, যা সে সব আমলের মধ্যেই প্রবাহিত ও সঞ্চারিত হয়েছিল, যা জমিনের বুকে আল্লাহর খলীফা হওয়ার কারণে বাস্তবায়িত করা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাসাউফপন্থীদের আদর্শ ও লক্ষ্য আমল-এর ক্ষেত্রে কেবল সংকীর্ণই হয়ে যায়নি, 'আমলে'র সাথে 'মুহাব্বাত' (محبت)-এর জোরদার করনের জন্যে তাসাউফপন্থীরা নানা উপায় অবলম্বন করেছে। যেমন : سماع —সঙ্গীত চর্চা এবং গানের মজলিস করা ইত্যাদির দ্বারা ঈমান মজবুত হয়ে থাকে বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক যুগে 'আল্লাহর মুহাব্বত' মানুষের দ্বারা এই ধরনের কাজ করিয়েছিল— তাসাউফপন্থীরা তার কোনো প্রমাণ দিতে পারবে কি?

'যিকির'কেও এখানে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। মাথা নীচু করে বসে মুখে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' কিংবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা নিম্নস্বরে অথবা উচ্চস্বরে উচ্চারণ করাকেই 'যিকির' বলে ধরে নেয়া হচ্ছে এবং তা করলেই

আল্লাহ্র 'যিকির' করার কর্তব্য আদায় হয়ে গেল বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু এ যে কতো সংকীর্ণ ধারণা এবং ইসলামী আদর্শের একটি মৌল বিষয়কে বিকৃত করা, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কুরআন মজীদে আল্লাহ্র 'যিকির' করার জন্যে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ - (البقرة : ١٥٢)

তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো, তোমরা আমার শোকর করো, আমার অকৃতজ্ঞতা করো না।

আল্লামা রাগেব ইসফাহানী 'যিকির' শব্দের অর্থ লিখেছেন ঃ

هَيْئَةٌ لِلنَّفْسِ بِمَا يُمْكِنُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْفَظَ مَا يَقْتَنِيهِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ كَالْحِفْظِ -

যিকির হচ্ছে মনের এমন একটা অবস্থা, যার দ্বারা মানুষ যে জ্ঞান সংরক্ষণ করতে চায় তা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। ইয়াদ রাখা বা স্মরণে রাখা কিংবা সংরক্ষণ (Keeping) যেমন, এ-ও তেমনি।

অপর অর্থে বলা হয়েছে ঃ حُضُورُ الشَّيْءِ الْقَلْبَ —'যিকির অর্থ অন্তরে কোনো জিনিসের উপস্থিতি।' তিনি আরও লিখেছেন, 'যিকির' দু'ভাবে সম্ভব, একটা অন্তরের যিকির, অপরটি মুখের যিকির। তার ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ করা ও ভুলে না গিয়ে স্মরণে রাখা, সব সময় স্মৃতিপটে জাগ্রত রাখা, সংরক্ষণ করা, এই উভয় অবস্থারই 'যিকির' শব্দটি প্রযোজ্য।

আল্লামা কুরতুবী লিখেছেন ঃ

اَلذِّكْرُ التَّنَبُّهُ بِالْقَلْبِ لِلْمَذْكُورِ وَالتَّيَقُّظُ لَهُ -

কোন জিনিস সম্পর্কে দিলের সদা সচেতন ও অবহিত হওয়া, সে বিষয়ে মনের জাগৃতি।

আর আয়াতটির অর্থ লিখছেন ঃ

اُذْكُرُونِي بِالطَّاعَةِ أَذْكُرْكُمْ بِالثَّوَابِ وَالْمَغْفِرَةِ -

তোমরা আমার আনুগত্য করে আমাকে স্মরণে রাখো। তাহলে আমি তোমাদের স্মরণে রাখব সওয়াব দিয়ে, গুনাহ মাফ করে।

অন্য কথায় যিকির হচ্ছে আল্লাহ্কে স্মরণ রেখে তাঁর ইবাদত করা, আনুগত্য ও হুকুম পালন করা মনের আগ্রহ সহকারে।

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ - (انفال : ٢)

প্রকৃত মুমিন তারাই, আল্লাহ্‌র উল্লেখ বা স্মরণ হলেই যাদের দিল কেঁপে উঠে।

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ فَأَدُّوْا فَرَائِضَهٗ —অতএব তোমরা হে মু'মিনরা— "আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফরযসমূহ যথাযথভাবে পালন করো।

পরে এ তাফসীরকার লিখছেন ঃ

حَقُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَ قَلْبُهٗ أَيْ خَافَ مِنْهُ فَفَعَلَ أَوَامِرَهٗ وَتَرَكَ زَوَاجِرَهٗ - (تفسير القرآن العظيم : ج -٣، ص-٢٧٨)

মুমিনের— আল্লাহ্‌র যিকির হলেই যার দিল কেঁপে উঠে— কর্তব্য হচ্ছে সে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং তার আদেশসমূহ পালন করবে ও নিষেধসমূহ তরক করে চলবে।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আল্লাহ্‌র যিকির করতে বলার অর্থ আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, সর্বক্ষণ তাঁকে মেনে চলা, তাঁকেই নিজের একমাত্র মা'বুদ মনে করা এবং নিজেকে মনে করা একমাত্র তাঁরই দাস এবং এ বিষয়ে কখনই গাফিল হয়ে না যাওয়া, সব সময়ই আল্লাহ্‌কে স্মরণে রাখা, কোনো সময়ই তাঁকে ভুলে না যাওয়া।

তাছাড়া কুরআনের ঘোষণানুযায়ী শুধু 'যিকির'ই একমাত্র করণীয় কাজ নয়। সেই সঙ্গে ফিকিরও অপরিহার্য। এই যিকির ও ফিকির— উভয়ের গুরুত্ব ও সার্বক্ষণিকতা বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ - (ال عمران : ١٩١)

যারাই আল্লাহ্‌র 'যিকির' করে দাঁড়ানো, বসা ও পার্শ্বনির্ভর শয়ন অবস্থায় এবং নভোমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা করে (বস্তুত তারাই বুদ্ধিমান লোক)।

আয়াতটিতে আল্লাহ্‌র 'যিকির' করতে বলা হয়েছে বসা, দাঁড়ানো ও শয়ন অবস্থায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায়। কেননা এই তিনটি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটি অবস্থায়ই মানুষ থাকে। কোনো সময়ই এই তিনটির কোনো একটি ভিন্ন অন্য কোনো অবস্থায়ই তার হয় না, হয় সে বসে আছে, নয় দাঁড়িয়ে আছে কিংবা সে শুয়ে আছে। অতএব সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌র 'যিকির' করতে হবে। অর্থাৎ স্মরণে রাখতে হবে, কোনো অবস্থায়ই আল্লাহ্‌কে ভুলে যাওয়া চলবে না।

দ্বিতীয়ত আয়াতটিতে শুধু যিক্‌র-এর কথাই বলা হয়নি, সেই সঙ্গে ফিকির-এর اَلْفِكْرُ কথাও বলা হয়েছে। আর ফিকির বলতে বোঝায় ইমাম রাগেবের ভাষায় ঃ قُوَّةٌ مُطْرِقَةٌ لِلْعِلْمِ اِلَى الْمَعْلُوْمِ — কোনো বিষয়ে জানবার জন্য নিয়োজিত শক্তি।" বলা হয়েছে, এই শব্দটির আসল রূপ ছিল فَرْكٌ অর্থাৎ—

فَرْكُ الْاُمُوْرِ وَبَحْثُهَا طَلَبًا لِلْوُصُوْلِ اِلَى حَقِيْقَتِهَا -

বিষয়াদি ঘর্ষণ করা তার নিগুঢ় তত্ত্ব ও গভীর নিহিত সত্য জানবার উদ্দেশ্য।

এক কথায় নিছকই যিকির আল্লাহ্‌র কাম্য নয়, বুদ্ধিমান লোকেরও কর্ম নয়। সেই সঙ্গে ফিকিরও আবশ্যক। ফিকিরবিহীন যিকির নির্বোধ লোকদের কাজ। আর 'যিকির'হীন 'ফিকির' কাজ হচ্ছে নাস্তিক ও আল্লাহ্‌দ্রোহী লোকদের।

কিন্তু আজকালকার 'তাসাউফে' শুধু 'যিকির' আছে, 'ফিকির' নেই। যিকির-এর সঙ্গে 'ফিকির' করলে প্রচলিত ভাষায় আর তাসাউফ হলো না। কোনো পীরের মুরীদ তা করতে চাইলে তার মুরীদগিরীই চলে যাবে, শুধু তা-ই নয়, এই 'যিকির'কেও তথায় খুবই ভালো অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে ও নির্দিষ্ট সময়ে চোখ বন্ধ করে মুখে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, চলে সেই নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে অন্যান্য সময়ে। এবং সেই বিশেষ প্রক্রিয়ার বাইরে জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে কোথাও তাদের জীবনে আল্লাহ্‌র যিকির এর কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। 'যিকির'-এর এই প্রক্রিয়া ও সময় নির্ধারণ ইসলামের এক মারাত্মক বিদয়াত। এই 'বিদয়াত' ইসলামকে সর্বাত্মক বিপ্লবী আদর্শ হতে না দিয়ে একটা যোগ-সাধনার বৈরাগ্য ধর্মে পরিণত করে রেখেছে।

মৌখিক যিকিরও যিকির বটে, যদি তার সাথে অন্তরের যিকির যুক্ত হয়। তাই ইমাম কুরতুবী লিখেছেন ঃ

وَسُمِّيَ الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ ذِكْرًا لِاَنَّهُ دَلَالَةٌ عَلَى الذِّكْرِ الْقَلْبِى -

মৌখিক যিকিরকেও যিকির বলা হয়েছে। কেননা তা অন্তরের যিকির-এর নিদর্শন।

অর্থাৎ অন্তরের যিকিরের যিকিরই মৌলিক যিকির-এর রূপ লাভ করে। কিন্তু তাসাউফে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের যিকির প্রবর্তিত। সেখানে অন্তরের যিকির-এর কোনো স্থান নেই। অন্তরের যিকির-এর যে লক্ষ্য, তাও এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। এখানে মৌখিক যিকিরই প্রধানত মুখ্য। তার আঘাতে 'কলব' সাফ করা ও ছয় লতীফা জারী করাই যে যিকির-এর উদ্দেশ্য। তাই বলতে হয়, সে 'যিকির' কুরআনের বলা যিকির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর জিনিস। যার কোনো দলীল কুরআন হাদীসে নেই। লতীফাও একটা বিদয়াতী ধারণা মাত্র। কুরআন হাদীসে তা স্বীকৃত নয়, তা থেকে পাওয়া যায় নি।

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا -

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা আল্লাহ্‌কে খুব বেশি বেশি স্মরণ করো।

আল্লামা কুরতুবী এর তাফসীরে লিখেছেন ঃ

اِنَّ الْمُرَادَ ذِكْرُ الْقَلْبِ الَّذِىْ يَجِبُ اِسْتِقَا مَتُهُ فِىْ عُمُوْمِ الْحَالَاتِ -

(الجامع لاحكام القران :ج -٢، ص -١٧١)

আয়াতটিতে যে যিকির করার নির্দেশ, তার অর্থ দিল দিয়ে এমনভাবে আল্লাহ্‌র যিকির করা, যা সর্বাবস্তায় ও স্থায়ীভাবে রক্ষা করা সম্ভব হবে। কোনো সময়ই তা হারিয়ে ফেলবে না বা ভুলে যাবে না।

এই পর্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিও প্রণিধানযোগ্য ঃ

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ - (فاطر - ١٠)

আল্লাহ্‌র দিকে উত্থিত হয় সব পাক-পবিত্র কথাবার্তা। আর নেক আমলই তাকে উত্থিত করে।

অর্থাৎ ভালোভালো ও পবিত্র কথা— তওহীদ বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি সবই আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায়, তবে তা পৌঁছিয়ে দেয় নেক আমল। নেক আমলবিহীন শুধু কথা, শুধু যিকির বা তওহীদ বিশ্বাস অর্থহীন। তা আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে না।

এই কারণে হাদীসে যিকির-এর বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে তার বাস্তব রূপ কি হলে আল্লাহ্‌র যিকির হয় বা আল্লাহ্‌র যিকির এর বাস্তব পন্থা কি, তা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَطَاعَ اللّٰهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللّٰهَ وَاِنْ قَلَّ صَلٰوتُهٗ وَصَوْمُهٗ وَضَعِيْفُهٗ لِلْخَيْرِ -

(الجامع لاحكام القران :ج -٢، ص -١٧١)

যে লোক আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো সে-ই আল্লাহ্‌র 'যিকির' করলো, যদিও তার (নফল) নামায-রোযা ও কল্যাণময় কাজ খুব কমই হলো।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যিকির এর সঠিক বাস্তবরূপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, তাঁর হুকুম-আহকাম পালন করা। কেননা আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করলে আল্লাহ্‌র যিকির স্বতঃই হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ্ স্বরণে না থাকলে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন সম্ভব হতে পারে না। অতএব আল্লাহর 'যিকির' বিশেষ একটা ধরনে ও নির্দিষ্ট সময় ও সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই হচ্ছে বিদয়াত। তাসাউফে— তথা পীর-মুরীদীতে এই বিদয়াতই মূল উপজীব্য। এরূপ যিকির-এর অনুষ্ঠান করেই পীরেরা বোকা লোকদের ভেড়া বানিয়ে রাখে ও হাদীয়া-তোহফা আকারে ঘোষণা করে। বস্তুত যিকির-এর এই ধরন হিন্দু বৈরাগ্যবাদী ও বৈষ্ণবদের মধ্যেই প্রচলিত। পীরদের এই পদ্ধতিটি হিন্দু বৈরাগ্যবাদী থেকে গৃহীত হয়েছে বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না।

বৈরাগ্যবাদের বিরুদ্ধে কুরআন মজীদ চিরদিনই সোচ্চার। নবী করীম (স) সারা জীবনের সাধনা দিয়ে এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন, মানুষের বৈরাগ্যবাদী ঝোঁক ও প্রবণতাকে দূর করেছেন। কিন্তু তাসাউফ এ জিনিসটিকে শক্তিশালী করে তুলেছে, তাসাউফের প্রধান হোতাদের মধ্যে বৈষয়িক স্বাদ-আস্বাদন ও সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এক প্রবল নেতিবাচক ভাবধারা বর্তমান দেখতে পাওয়া যায়। অথচ ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে এ জিনিস ছিল না। রাসূলের জামানায় সাহাবীদের এরূপ ভাবধারা কখনো দেখা দিলে নবী করীম (স) কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন। কুরআন হাদীসে 'তাজকিয়া'র ব্যাপারে যিকিরে-ইলাহী— আল্লাহ্‌র যিকির-এর ওপর এক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তা-ই একমাত্র উপায় ছিল না। যিকিরে ইলাহীর সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক উপায় ও উকরণ ছিল, যা মুসলমানদের তাজকীয়ায়ে নফ্স হাসিলের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হতো। এ পর্যায়ে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'-র কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত 'তাজকীয়ায়ে নফ্স' সবর, তাওয়াক্কুল, আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমপর্ণ, আল্লাহ্‌র ব্যবস্থায়ই রাজি হওয়া প্রভৃতি

অতি উঁচুদরের মহান গুণাবলী অর্জনের জন্য জিহাদের গুরুত্ব সর্বাধিক। কুরআন ও হাদীসে তাকে এ মর্যাদাই দেয়া হয়েছে (বিশেষভাবে কুরআন মজীদের সূরা আল-বাকারা ১৫২, ১৫৩ ও ১৫৪ আয়াত এবং সূরা আল-আহ্‌যাবের ২২ ও ২৩ আয়াত দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাসাউফপন্থীগণ জিহাদ পরিহার করেছে, জিহাদের প্রাণান্তকর ময়দান ত্যাগ করেছে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব শয়তান লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে খানকার নিরাপদ আশ্রয়ে যিকিরে-ইলাহী ও মুরাকাবা মুশাহাদায় মশগুল হয়ে রয়েছে। আর এ কাজকেই তাজকীয়ায়ে নফসের একমাত্র উপায় রূপে নিজেরাও গ্রহণ করেছে, অন্যান্য মানুষকেও তা করতে দাওয়াত দিয়েছে। এরই ফলে যিকিরের নতুন নতুন পন্থা ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। মুরাকাবা-মুশাহাদার সম্পূর্ণ নতুন পরিভাষা ও অভিনব পন্থা ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার কোনো নাম নিশানা রাসূলে করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরামের আমলে ছিল না।

তাসাউফপন্থীদের মুজাহিদা নফসের খাহেশের বিরুদ্ধে এক প্রবল ও নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ বিশেষ। কিন্তু আল্লাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সাথে এর দূরতম সম্বন্ধও নেই। তাসাউফপন্থীরা এ পর্যায়ে একটা 'হাদীস'কে দলীল হিসেবে পেশ করে। তা হচ্ছে ঃ

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ قَالُوْا وَمَا الْجِهَادُ لْاَكْبَرُ قَالَ جِهَادُ الْقَلْبِ اَوْجِهَادُ النَّفْسِ –

আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে ফিরে এলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ বড় জিহাদ কি ? বললেন ঃ দিল বা নফসের সাথে জিহাদ করা।

এ কথাটিকে রাসূলের কথা বা হাদীস হিসেবেই প্রচার করা হয়। আর এর ওপর নির্ভর করে তাসাউফপন্থীরা প্রথমে দ্বীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ বা তাদের মুকাবিলা করার তুলনায় নিজের নফসের সাথে মুজাহিদা করাকে উত্তম ও বড় জিহাদরূপে গ্রহণ করে। পরে এটাকেই একমাত্র কাজরূপে নির্ধারণ করে নেয়। আর দ্বীনের শত্রুদের সাথে জিহাদ করাকে দুনিয়াদারী বা রাজনীতি ইত্যাদি বলে সম্পূর্ণ বর্জন করে। কিন্তু আসলে এ একটা মস্ত বড় ধোঁকা। উপরোক্ত কথাটি সম্পর্কে হাদীস বিশারদ ও বুখারী শরীফের ব্যাখাকার ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী বলেছেন ঃ 'ওটি হাদীস নয়।' বরং ঃ

هُوَ مَشْهُوْرٌ عَلَى الْاَلْسِنَةِ وَهُوَ مِنْ كَلَامِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَيْلَةَ –

ওটি খুবই প্রসিদ্ধ কথা, লোকদের মুখে মুখে উচ্চারিত। কিন্তু আসলে ওটি ইবরাহীম ইবনে আইলার কথা, রাসূলের হাদীস নয়।

উক্ত কথাটি বায়হাকী ও খতীব বাগদাদী কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে বটে; কিন্তু তা অত্যন্ত দুর্বল সনদের। তাই এর ওপর ভিত্তি করে ইসলামের এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। এ কারণে আল্লাহ্‌র দুশমনদের মুকাবিলায় যুদ্ধ ও সংগ্রামে দৃঢ়তা মজবুতী ও অচল অটল হয়ে থাকার যে সবর কুরআন মজীদে যার উচ্চ মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে তাসাউফপন্থীদের নিকট এর কোনোই গুরুত্ব নেই। 'তাওয়াক্কুল' এবং অন্যান্য দ্বীনী ফযীলতপূর্ণ কাজ-কর্মের অবস্থা তা-ই ঘটেছে।

জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শের ক্ষেত্রে তাসাউফপন্থীরা যে পরিবর্তন সূচিত করেছেন তা কি করে জায়েয হতে পারে ? এ একটি কঠিন প্রশ্ন তাঁদের তরফ থেকে এর জবাব দিতে চেষ্টা করা হয়েছে বটে; কিন্তু সে জবাব কুরআন ও সুন্নাতের দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য এবং অর্থহীন। তাঁরা নিজেদের আমলের বৈধতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে 'ইন্তেখাব' ও 'ইখতিয়ার'— 'ছাঁটাই বাচাই ও গ্রহণের' নীতি অবলম্বন করেছেন। যেমন নবী করীমের সহস্র লক্ষ সাহাবীদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র সুফ্‌ফাবাসী সাহাবীদেরকে নিজেদের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছন। কেননা তাঁদের জীবনের সাথে তারা তাদের সামগ্রিক আদর্শের মিল দেখতে পেয়েছিল। (كتاب التعرف، كلابازى) আর অন্যান্য সাহাবীদের জীবনের সেসব খুটিনাটি দিকগুলোই উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন যেগুলো থেকে তাদের মনের ভাবধারার সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত জুনাইদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ 'তাসাউফ' কি ? তিনি বললেন ঃ তাসাউফের ভিত্তি আটটি জিনিসের ওপর স্থাপিত। এ আটটি জিনিস সতন্ত্রভাবে আটজন নবী পয়গম্বরের জীবনে স্পষ্ট প্রতিভাত। তা হলো ঃ হযরত ইবরাহীমের বদান্যতা, দানশীলতা, মেহমানদারী, হযরত ইসমাঈলের আল্লাহ সন্তুটি অর্জনের চেষ্টা ও আত্মসমর্পণ, হযরত ইয়াকুবের 'সবর', হযরত যাকারিয়ার 'ইশারাত', হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার অপরিচিত (اجنبيت) , হযরত ঈসার 'দেশ সফর', হযরত মূসার 'খিরকা পরিধান' এবং হযরত মুহাম্মদ (স) এর ফাকর— দারিদ্র্য। (كشف المحجوب ص ٨٥)

সহজেই বুঝতে পারা যায়, এক-একজন নবীর বিরাট বিশাল ও সম্পূর্ণ জীবনের বিপুল গুণরাশির মধ্য থেকে আলাদা করে একটি মাত্র গুণকেই 'আদর্শ' রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও তা করার অনুমতি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল দেননি। আল্লাহ তা'আলা তো সম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবেই হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আদর্শরূপে গ্রহণ করার— তার একটি মাত্র গুণ নয়, সবগুলো গুণই ধারণ করার— নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - (الاحزاب : ٢١)

তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের সত্তায় অতীব উত্তম অনুসরণযোগ্য আদর্শ রয়েছে।

আর রাসূলে করীম (স) নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ -

আমি যে দ্বীন নিয়ে এসেছি তোমাদের মন ও মানসিকতা যতক্ষণে তার সম্পূর্ণ অধীন না হবে, ততক্ষণে তোমাদের কেউ-ই ঈমানদার হতে পারবে না।

তার অর্থ রাসূলের একটি কথা বা একটি নীতিই নয়, তাঁর নিকট থেকে পাওয়া সম্পূর্ণ দ্বীন— পুরোপুরি আদর্শই গ্রহণ করতে হবে।

'খুলাফায়ে রাশেদুন'- এর ক্ষেত্রেও তাঁদের এই নীতিই অনুসৃত হয়েছে। তারা তাঁদের জীবনের জুহ্‌দ, সাখাওয়াত ও রিয়াজত পর্যায়ে ভাবধারা সমূহকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তাদের জিহাদী কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতাকে এরা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চেয়েছে। অথচ তাঁদের সমগ্র জীবনই অতিবাহিত হয়েছে বাতিল শক্তির সাথে লড়াই সংগ্রাম, ইসলামী সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সাধনা, সমাজে শরীয়তের আইন জারী ও কার্যকর করা, ইনসাফ কায়েম করা এবং আল্লাহ্‌র দুশমনদের মস্তক চূর্ণ করার কাজের মধ্য দিয়ে। কিন্তু বর্তমান তাসাউফপন্থীদের নিকট তাঁদের এসব মহান গুণের কোনোই গুরুত্ব নেই। এরই ফলে মুসলিম সমাজ আজ বৈরাগ্যবাদের স্রোতে ভেসে গিয়ে জীবনের বৈশিষ্ট্য ও প্রাণ— মনের শক্তি প্রতিভা হারিয়ে ফেলেছে, হয়েছে সর্বহারা।

ইল্‌মে শরীয়ত ও ইল্‌মে মারিফাত দু'টি আলাদা জিনিস হওয়ার দাবির সমর্থনে একটি হাদীসও পেশ করা হয়। হাদীসটি মিশকাত শরীফে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِىْ الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اِبْنِ اٰدَمَ - (رواه الدرمى)

হাসান বসরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ ইল্‌ম দু'প্রকার; একটি ইল্‌ম কলবের অভ্যন্তরে প্রতিফলিত। আর এ-ই হচ্ছে সত্যিকার কল্যাণকর ইল্‌ম। আর একটি ইল্‌ম শুধু মুখে মুখে বলে। আর তা-ই হচ্ছে মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র অকাট্য দলীল।

কিন্তু এটা এ পর্যায়ের কোনো দলীলই হতে পারে না। কেননা একে তো এটা রাসূলের কথা নয়, কথা নয় কোনো সাহাবীর। এটি হচ্ছে হাসান বসরীর কথা এবং তিনি তাবেয়ী মাত্র।

দ্বিতীয়ত, এখানে যে দুই ইল্‌মের কথা বলা হয়েছে, তা আসলে দু'টি স্বতন্ত্র ইল্‌ম নয়। একটি ইল্‌মেরই দুটো দিক— বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। এর একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যেটিকে মুখে 'ইল্‌ম' বলা হয়েছে, তা-ই হলো কুরআন ও সুন্নাতের ইল্‌ম; তা মুখে পড়ে শিখতে হয়। আর এই পড়ার যে প্রতিফলন ঘটে অন্তরের ওপর তা-ই হলো 'ইল্‌মুন ফিল কালব'— দিলের ইল্‌ম। কাজেই এর দুয়ের মাঝে কোনো দ্বৈততা নেই এবং তা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে হাসিল করা যায় না; বরং একই কুরআন-হাদীস থেকেই তা শিখতে হবে। প্রদীপ জ্বালালে তা একটি হয় আগুন ও অপরটি সেই আগুনেরই আলো ও তাপ। এই আলোর তাপকে কি আগুন থেকে আলাদা করা যায় ? এ-ও তেমনি। আবূ তালিব মক্কী উপরোক্ত কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

هُمَا عِلْمَانِ اَصْلِيَانِ لَايَسْتَغْنِىْ اَحَدُ هُمَا عَنِ الْاٰخِرِ بِمَنْزِلَةِ الْاِسْلَامِ وَالْاِيْمَانِ مُرْتَبِطٌ كُلٌّ مِّنْهُمَا بِالْاٰخِرِ كَالْجِسْمِ وَالْقَلْبِ لَا يَنْفَكُّ اَحَدُ هُمَا صَاحِبَهٗ -

(مرقة ج-١، ص-٣١٣)

এ দুটিই মৌলিক ইল্‌ম, একটি অপরটি ছাড়া নয়, ঠিক যেমন ঈমান ও ইসলাম। আর এ দু'টো পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ঠিক যেমন দেহ ও মন। একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

'ইলমে বাতেন' বা 'বাতেনী ইল্‌ম' বলতেও কোনো জিনিস ইসলামে স্বীকৃত নয়। যদিও এ ইল্‌ম-এর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে আর একটি হাদীস 'মুসালসাল' (مسلسل) বর্ণনা করা হয়! হাদীসটি এরূপ ঃ

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُذَيْفَةَ سَأَلْتُ النَّبِىْ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ عِلْمِ الْبَاطِنِ مَا هُوَ فَقَالَ سَأَلْتُ جِبْرَائِيْلَ عَنْهُ فَقَالَ عَنِ اللّٰهِ هُوَ سِرٌّ بَيْنِى وَ بَيْنَ اَحِبَّائِىْ وَ اَوْلِيَائِىْ وَ اَصْفِيَائِىْ اُوْدِعُهٗ فِىْ قُلُوْبِهِمْ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِىٌّ مُرْسَلٌ -

হাসান বসরী থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত হুয়াযফা বলেন ঃ আমি নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইল্‌মে বাতেন কি ? রাসূল (স) বললেন ঃ আমি এ বিষয়ে জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস

করলে তিনি বললেন; আল্লাহ্ বলেছেন ঃ ইল্‌মে বাতেন হলো আমার ও আমার বন্ধু প্রিয়জন, আমার অলী ও আমার খাঁটি দোস্তদার লোকদের মধ্যবর্তী এক বিশেষ জিনিস, আমি তা তাদের কলবের ভিতরে আমানত রেখে দেই, তা আমার কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতাও জানতে পারে না, জানতে পারে না কোনো নবী রাসূল-ও।

কিন্তু হায় আফসোস! এটা কোনো হাদীসই নয়। ফাতহুল বারীর গ্রন্থকার ইমাম ইবনুল হাযার আসকালানী এটিকে হাদীস বলে মানতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন ঃ

هُوَ مَوْضُوْعٌ وَالْحَسَنُ مَالَقِيَ حُذَ يْفَةَ – (الموضوعات الكبير لملاعلى القارى)

এ কথাটি মনগড়াভাবে রচিত, রাসূল (স)-এর কথা নয়। হাসান বসরী হযরত হুযায়ফার সাক্ষাৎ লাভ করেননি। তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করার কোনো সুযোগই তাঁর হয়নি।

কাজেই এখানে হযরত হুযায়ফা থেকে হাদীসটি হাসান বসরী বর্ণনা করেছেন বলে যা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, নবী করীম (স) ও পরবর্তী ইসলামের স্বর্ণযুগের অনেক পরে 'ইল্‌মে বাতেন' নামে পীর-মুরীদীর ব্যবসায় চালাবার উদ্দেশ্যে এসব মিথ্যা কথা-বার্তার ব্যাপক রচনা ও হাদীস নামে প্রচার করা হয়েছে। আসলে এ হলো বাতেনীয়া ফিরকার আকীদা। তারাই শরীয়তকে বাতেনী ও জাহেরী এ দু'ভাগে ভাগ করেছে। আর বাতেনীয়া ফিরকা সুন্নাত আল-জামায়াতের মধ্যে গণ্য নয়। এ এক বাতিল ফিরকা, তারা নবুয়্যত ও শরীয়তকে মানত না। সব হারাম জিনিসকে তারা হালাল মনে করতো। (فتح البارى ابن حج مسقلان ج- ۱، كتاب العلم)

বস্তুত কুরআন সুন্নাত থেকে বিচ্ছিন্ন এ মারিফাত মানুষকে ইসলামের তওহীদী ঈমান থেকে সরিয়ে নিয়ে বেদান্তবাদী শির্‌ক-এর মহাপংকে ডুবিয়ে দেয়। আর তা-ই ঘটেছে বর্তমানকালের অনেক পীরবাদী ও তথাকথিত তাসাউফপন্থীদের জীবনে। অতএব ইসলামে এ তাসাউফের কোনো স্থান থাকতে পারে না।

পীর ধরা কি ফরয ?

আরো অগ্রসর হয়ে এক শ্রেণীর অর্ধ আলিম পীর ধরা ফরয বলে দাবি করতে শুরু করেন। এজন্যে তাঁরা দলীল হিসেবে প্রথমে পেশ করেন কুরআন মজীদের সেই 'অসীলা'র আয়াত। তাঁরা বলেন, 'অসীলা' ধরার হুকুম তো আল্লাহ্ই

দিয়েছেন কুরআন মজীদে— আর সে অসীলাই হলো পীর। অতএব পীর ধরা ফরয প্রমাণিত হলো। অথচ ইতিপূর্বে আমরা এই 'অসীলা'র আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি। প্রায় দশ বারো খানা প্রাচীন ও প্রামাণিক তাফসীরের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে 'অসীলা' তালাশ করতে আদেশ করেছেন তার মানে কখনো 'পীর' নয়, পীর ধরলেই সে অসীলা সন্ধানের আদেশ পালন হয়ে যায় না। তাছাড়া প্রখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য আরবী অভিধানের উদ্ধৃতি দিয়েও দেখিয়ে দিয়েছে যে, 'অসীলা' শব্দের অর্থ 'পীর' কেউ করেননি। মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ) মরহুম এ যুগের সর্বজনমান্য বড় তাসাউফপন্থী আলিম। কিন্তু তিনিও 'অসীলা' শব্দের অর্থ 'পীর' করেন নি, করেছেন 'নৈকট্য'। সেজন্য তাঁর লেখা কুরআনের তরজমা দেখা আবশ্যক। বরং তিনি বলেছেন যে, কেবল জাহিল লোকেরাই এ আয়াত থেকে পীর ধরা ফরয প্রমাণ করতে চাইছে, অন্য কেউ নয়।

তাঁদের আর একটি দলীল হলো কুরআনের এ আয়াত ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ - (التوبة -١١٩)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সত্যবাদী লোকদের সঙ্গী হও।

এ আয়াত পেশ করে পীরবাদীরা বলতে চান যে— صادقين বলতে পীরদেরই বোঝান হয়েছে এবং তাদের নিকট মুরীদ হয়ে তাদের সোহবত ইখতিয়ার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ দুনিয়ার কোনো লোকই এবং প্রথমকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকালের তাফসীরকারদের মধ্যে কেউই এ থেকে পীরের নিকট মুরীদ হওয়ার আদেশ বুঝেননি, বুঝতে পারেনও না। যদি কেউ তা বুঝতে চায়, তবে তা হবে নিজের মর্জীমত কুরআনকে ব্যবহার করা, নিজের পক্ষ সমর্থনে খামখেয়ালীভাবে কুরআনকে ব্যবহার করা। আর এ হচ্ছে অতি বড় অপরাধ— এত বড় অপরাধ যে, সুস্পষ্ট কুফরও এর সমতুল্য হতে পারে না।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

اَلْمُرَادُ بِالصّٰادِقِيْنَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا فِىْ اِيْمَانِهِمْ وَمُعَا هَدَتِهِمِ اللّٰهَ تَعَالٰى وَرَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّاعَةِ - (روح المعانى)

'সাদেকীন' বলতে বোঝায় সে সব লোককে, যারা ঈমান এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে করা আনুগত্যের ওয়াদা পূরণে সত্যবাদী প্রমাণিত হয়েছে।

এছাড়া একে সাধারণ অর্থেও ব্যবহার করা যায়। তখন এর অর্থ হবে ঃ

فَيَكُوْنُ الْمُرَادُ بِالصَّادِقِيْنَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا فِى الدِّيْنِ نِيَّةً وَقَوْلاً وَعَمَلاً -

এমন সব লোক, যারা দ্বীন পালনে নিয়্যত, মুখের কথা ও আমল— সব দিক দিয়েই সত্যবাদী প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

اَىِ اصْدُقُوْا وَالْزِمُوْا الصِّدْقَ تَكُوْنُوْا مِنْ اَهْلِهِ وَتَنْجُوْا مِنَ الْمَهَالِكِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ فَرَجًا مِّنْ اُمُوْرِكُمْ وَفَوْجًا - (تفسير القران العظيم :ج - ٣، ص - ٤٧١)

সত্যবাদী হও, সত্যকে অবলম্বন করো, তাহলে তোমরা সত্যের ধারক হতে পারবে এবং ধ্বংস থেকে বাঁচতে পারবে। তা তোমাদের কাজকর্মে সহজতা এনে দেবে।

আল্লামা আলুসীর মতে এর অর্থ হতে পারে বিশেষভাবে তারাও ঃ

مَنْ تَخَلَّفَ وَ رَبَطَ نَفْسَهُ بِالسَّوَارِىْ -

যারা মুসলিম বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদেরকে উচ্চ স্থানে আটকে রেখেছিল।

এতে করে গোটা আয়াতের অর্থ হবে ঃ

তারা তিন জন যেমনভাবে সত্য কথা বলেছিলেন সত্যবাদিতা ও খালিস নিয়তে, তোমরাও তেমনি হও।[১]

কুরআন মজীদের অপর এক আয়াতে صادقين শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আয়াতটি এই ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ -

সেসব ফকীর-গরীব মুহাজিরদের জন্যে, যারা তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত এবং ধন-মাল থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তারা আল্লাহ্র নিকট থেকে অনুগ্রহ ও সন্তোষ পেতে চায়। আর তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে এরাই সাদেকীন, সত্যবাদী।

---

১. ইমামুল মুফাস্সিরীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী তাঁর সুবিখ্যাত তাফসীরে এ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন; কিন্তু তাতে পীর ধরা বোঝায় ও এ আয়াতে পীরের সঙ্গ গ্রহণের নির্দেশ হয়েছে বলে উল্লেখ করেননি।

এখানে 'সাদেকীন' বা সত্যবাদী লোকদের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা দ্বীন-ইসলামের কারণে ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত, ধন-মাল থেকে বঞ্চিত, তারা সব সময় আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তোষ পেতে চায় এবং সে জন্য তারা সব সময় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে দ্বীন কায়েম করার ব্যাপারে। এ তো কোনো পীরের পরিচয় নয়।

আমি মনে করি এ পর্যায়ের লোকই বোঝা যেতে পারে صادقین শব্দ থেকে। নাফে' বলেছেন, যে তিন জন লোক তাবুক যুদ্ধে মুজাহিদীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন তাদের কথাই বলা হয়েছে এখানে। এ ছাড়া নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীগণও এর অর্থ হতে পারেন, বলেছেন ইবনে উমর (রা)। সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেছেন যে, এ আয়াতে 'সাদেকীন' বলতে বোঝানো হয়েছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারুক (রা)-কে (روح المعانى ج ١١) তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, 'সাদেকীন' অর্থ পীর, আর এ আয়াতে পীর ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে— এ কথা বলা হচ্ছে কোন দলীলের ভিত্তিতে ?

পীর-মুরীদী সম্পর্কে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর বক্তব্য

এ সম্পর্কে আমরা বেশি শুনতে চাইব মুজাদ্দিদ আলফেসানী শায়খ আহমদ সরহিন্দীর নিকট থেকে, জানতে চাইব তাঁর মতামত। কেননা পাক-ভারতে তিনি একদিকে যেমন তাসাউফ বা ইলমে মারিফাতের গোড়া তেমনি আকবরী 'দ্বীনে-ইলাহী' ফিতনা ও ইসলামের দুশমনীর সয়লাবের মুখে তিনি প্রকৃত দ্বীন ইসলামকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। কাজেই তাসাউফ সম্পর্কে তাঁর মতামতের গুরুত্ব 'আপনি আমি বা সে'র তুলনায় অনেক বেশি। তাঁর মত পেশ করা এ জন্যেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, এ দেশের পীরেরা সাধারণত তাঁকেই সব পীরের গোড়া বলে দাবি করে থাকেন।

শরীয়ত ও মারিফাত পর্যায়ে তিনি তাঁর 'মকতুবাত'-এ লিখেছেন ঃ

فردا ے قیامت ازشر یعت خواہندیر سید، ازتصوف نه خوا ہندیر سید - دخول جنت وتجنب ازناروابسته باتیان شریعت است، انبیاء علیهم الصلوة والسلام که بهترین کائنات اند بشرائع دعوت کرده اند، دارمدار نجات بران مانده اند ومقصود ازبعثت این اکابر شریعت تبلیغ شرائع است، پس بزرگ ترین خیرات سعی درتر ویج شریعت است احیائے حکمےاز احکام ان، علی الخصوص درزمانیکه شعائر اسلام منهدم شده

باشند، کروڑہا روپیہ درراہ خداعزوجل خرج کردن برابر ان نیست کہ مسئلہ ری از مسائل شرعیہ راارواج دادن -

(مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوبات ٤٧)

কাল কিয়ামতের দিন শরীয়ত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাসাউফ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না। জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া শরীয়তের বিধান পালনের ওপর নির্ভরশীল। নবী-রাসূলগণ — যাঁরা গোটা সৃষ্টিলোকের মাঝে সর্বোত্তম— শরীয়ত কবুল করারই দাওয়াত দিয়েছেন, পরকালীন নাযাতের জন্যে শরীয়তই একমাত্র উপায় বলে ঘোষণা করেছেন। এ মহান মানবদের দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্যই হলো শরীয়তের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ হলো শরীয়তকে চালু করা। এবং শরীয়তের বিধান সমূহের মধ্যে একটি হুকুমকে হলেও জিন্দা করা বিশেষ করে এমন সময় যখন ইসলামের নিদির্শনসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। কোটি কোটি টাকা আল্লাহ্র পথে খরচ করাও শরীয়তের কোনো একটি মাসলাকে রেওয়াজ দেয়ার সমান সওয়াবের কাজ হতে পারে না।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ) এ পর্যায়ে আরো একটি প্রশ্নের বিশদ ও স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন। সাধারণ্যে প্রচলিত মত জাহিল পীর ও তাদের মুরীদেরা প্রচার করে বেড়ায় যে, শরীয়ত হচ্ছে দ্বীনের বাইরের দিকের চামড়া, আর আসল মজগ হচ্ছে তরীকত বা মারিফাত। একথা বলে যারা শরীয়তের আলিম, কিন্তু তরীকত, মারিফাত ইত্যাদির ধার ধারেন না, শরীয়তকেই যথেষ্ট মনে করেন— তাঁদের 'ফাসিক' ও বিদয়াতী ইত্যাদি বলে অভিহিত করে, তাঁদের সমালোচনা করে এবং তাদের দোষ গেয়ে বেড়ায়। এর জবাবে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর— যিনি এ দেশে প্রকৃত মারিফাতেরও গোড়া— দাঁতভাঙ্গা উত্তর শুনুন। তিনি বলেন ঃ

شریعت رأسہ جزاست، علم وعمل واخلاص، پس طریقت وحقیقت خادم شریعت اند درتکمیل جزواوکہ اخلاص است حقیقت کاراین است، امافہم ہرکس این جانرسد اکثرعالم بخواب وخیال آرمیدہ اند وبجور ومویزاکتفا نمودہ، ازکہالت شریعت چہ دانند وبحقیقت طر یقت چہ رسند شریعت راپوست خیال مے کنند وحقیقت رامغز می دانند، نمی دانند کہ حقیقت معاملہ چیست بر ترہات صوفیہ مغرور اند وبہ احوال ومقامات مفتون - ہداہم اللہ تعالی سواء الطریق -

(مکتوبا جلداول مکتوبات - ٤٠)

শরীয়তের তিনটি অংশ রয়েছে ঃ ইল্‌ম (শরীয়তকে জানা), আমল (শরীয়ত অনুযায়ী কাজ) এবং ইখলাস (নিষ্ঠা)। তরীকত ও হাকীকত উভয়ই শরীয়তের এই তৃতীয় অংশ— ইখলাসের পুরিপূরক হিসেবে শরীয়তের খাদেম মাত্র। এটিই আসল কথা, কিন্তু সকলে এতদূর বুঝতে সক্ষম হয় না। অধিকাংশ আলেম লোক কল্পনার সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। আর বেহুদা অর্থহীন ও অকাজের কথাবার্তা বলাই যথেষ্ট মনে করে। এ লোকেরা শরীয়তের প্রতিপালন সম্পর্কে কি জানে, বুঝবে! তরীকতের হাকীকতই বা এরা কি বুঝবে! এরা শরিয়তকে 'চামড়া' অর্থাৎ বাইরের জিনিস মনে করে বসে আছে, আর হাকীকতকে মনে করে নিয়েছে মগজ, মূল ও আসল। আসল ব্যাপার কি, তা এরা আদৌ বুঝতে পারছে না। সুফী লোকদের— পীরদের বেহুদা অর্থহীন কথাবার্তা নিয়ে অহমিকায় নিমগ্ন রয়েছে ও মারিফাতের 'আহওয়াল' ও 'মাকামাত'-এর মধ্যে পাগল হয়ে ঘুরে মরছে তারা। আল্লাহ তা'আলা এ লোকদেরকে সঠিক পথে হেদায়েত করুন এই দোয়া করি।

শরীয়ত আর তরীকতকে যারা দু'টো জিনিস মনে করে নিয়েছে এবং তরীকতের অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় যারা নিমগ্ন হয়েছে, মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ) তাদেরকে জাহিল ও বিভ্রান্ত লোক বলে অভিহিত করেছেন। মুজাদ্দিদে আলফেসানীর একথা যে সম্পূর্ণ সত্য ও একান্তই নির্ভুল, তাতে অন্তত শরীয়তের আলিমদের কোনো দ্বিমত নেই। বস্তুত এ ব্যাপারে শরীয়তের আলিম ও জাহিল পীর ও তাদের অন্ধ মুরীদদের মাঝে মতভেদ শুরু থেকেই চলে এসেছে। শরীয়তের আলিমগণ ইসলামে শরীয়ত আর তরীকতের বিভক্তিকে কোনো দিনই সমর্থন করেননি, চিরদিনই এর বিরোধিতা করেছেন—এ জিনিসকে দ্বীন ইসলামের বাইরে থেকে আমদানী করা এক মারাত্মক বিদয়াত বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আজ জাহিল পীরেরা নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্যে এবং শরীয়ত পালন ও কায়েমের দায়িত্বপূর্ণ কাজ থেকে দূরে খানকা শরীফের চার দেয়ালের মধ্যে সহজ ও সস্তা সুন্নাত পালনের অভিনয় করার জন্যে শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন 'তরীকত' নামের এক নতুন বস্তুর প্রচলন করে চলেছে। এরূপ অবস্থায় কার কথা বিশ্বাস্যরূপে গ্রহণ করা যাবে ? আলিমদের, না সূফী ও পীরদের ? এর জবাব দিয়েছেন মুজাদ্দিদে অলফেসানী (রহ)। তিনি বলেন ঃ

باید دانست که دربر مسئله که علماء وصوفیاء درآن اختلاف دارند چوں نیك ملا حظه
می نماید خق بجانب علماء می یابند سرش أنست که نظر علماء بوا سطۀ متابعت

انبیـا ء علیـهم الصلوة والسـلام بکمـالات نبـوت وعلوم ان نفـوذ کـرده است ونظر صوفیاء مقصور بر کمالات ولایت ومعارف ست -

(مکتوبات جلد اول مکتو بات نمبر ٢٦٦)

জেনে রাখা ভালো, যে বিষয়ে সূফী, পীর এবং শরীয়তের আলিমদের মাঝে মতভেদ হয়, ভালোভাবে চিন্তা ও অধ্যয়ন করে দেখলে দেখা যাবে যে, সে বিষয়ে আলিমদের মত-ই হক। এর কারণ এই যে, আলিমগণ নবী রাসূলগণের অনুসরণ করার কারণে নবুয়্যতের গভীর মাহাত্ম্য এবং তদলব্ধ ইলম লাভ করতে পেরেছেন। আর সূফী-পীরদের দৃষ্টি বেলায়তের কামালিয়াত ও তত্ত্বকথার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

পীরদের মুরীদ বানাবার ব্যবসা সবচেয়ে বড় মূলধন হচ্ছে কাশফ ও ইলহামের দোহাই। পীরেরা যখন বলে ঃ 'আমার কাশফ হয়েছে— 'ইলহাম যোগে আমি একথা জানতে পেরেছি'— তখন জাহিল মুরীদান ভক্তিতে গদগদ হয়ে পীরের কদমবুসি করতে শুরু করে। কিন্তু এসব জিনিস যে পীর-মুরীদীর ব্যবসা চালাবার জন্যে হয়, তা বুঝবার ক্ষমতা এই মূর্খ পীরদের নেই। 'ইলহাম' হতে পারে, কাশফও হয়, হয় আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে। যদি কেউ তা লাভ করে, তবে তা অন্য লোকদের নিকট না বলে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করাই তার কর্তব্য। কিন্তু জাহিল পীরেরা শরীয়তের ধার ধারে না। তারা ইলহামের দোহাই দিয়ে জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারাম ও ফরয-ওয়াজিব ঠিক করে ফেলে। আর অন্ধ মুরীদরা তাই মাথা পেতে মেনে নেয়, শরীয়তের হুকুমের প্রতি তাকাবার খেয়ালও জাগে না। এ সম্পর্কে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর কথাই আমাদেরকে নির্ভুল পথ-নির্দেশ করতে পারে। তিনি বলেছেন ঃ

قیاس واجتهاد اصلی است از اصول شرعیه که مابه تقلیدآں ماموریم، بخلاف کشف والهام که مارابه تقلید اں امر نفرموده اند آالهام بر غیر حجت نیست واجتهاد برمقلد حجت است پس تقلید علماء مجتهدین بایدکرد واصول دین رامو افرالی ایشان باید جست وصوفیه آنچه بگویند وبکنند مخالف ارائے مجتهدین انراتقلید نباید کرد -

(مکتوبات امام ربانی جلد اول، مکتوبات : ٢٧٢)

কিয়াস ও ইজতিহাদ শরীয়তের মূলনীতিসমূহের মধ্যে অন্যতম। তা মেনে চলার জন্যে আমাদের আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু কাশফ ও ইলহাম মেনে নেয়ার কোনো নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়নি। উপরন্তু ইলহাম অপর

লোকের বিরুদ্ধে দলীল নয়। ইজতিহাদ মুকাল্লিদ-এর জন্য দলীল (মেনে চলতে বাধ্য)। অতএব মুজতাহিদ আলিমদের মেনে চলাই উচিত এবং তাঁদের মতের ভিত্তিতে দ্বীনের নীতি তালাশ করা কর্তব্য। আর সূফীরা মুজতাহিদ আলিমদের মতের বিপরীত যা কিছু বলে বা করে, তা মেনে চলা কিছুতেই উচিত নয়।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয়— পীর ও সূফী লোক নিজেরা যেমন সাধারণত জাহিল হয়ে থাকে, মুরীদদেরকেও তেমনি জাহিল করে রাখতে চায় এবং তাদের দ্বীন-ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে কুরআন হাদীস থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্যে কখনো হেদায়েত দেয় না। পীর কিবলা মুরীদকে মুরাকাবা করতে বলবে, আল্লাহ্‌র যিকির করতে বলবে এবং হাজার বার করে 'বানানো দরূদ শরীফের অজীফা' পড়তে বলবে; কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম দ্বীন-ইসলামের মূল উৎস কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে, তার তরজমা ও তাফসীর বুঝতে এবং আল্লাহ্‌র কথার সাথে গভীরভাবে পরিচিত হতে কখনই বলবে না। বস্তুত এ এক আশ্চর্যের ব্যাপার। কিন্তু মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ) স্পষ্ট কণ্ঠে বলেছেন ঃ

ونصحتے کہ لابد است آنست کہ درین علوم بهیچ وجه خود رامعاف ندارند، اگر وقت شما مستغرق بدرین شود ہوس ذکر وفکر نہ کنند -

(مکتوبات، دفردوم مکتوب - ١٤)

অধিক জরুরী নসীহত হলো এই যে, কুরআন হাদীসের অধ্যায়নে ও পড়াশুনায় কোনোরূপ ত্রুটি করবেন না। আপনার সমস্ত সময় যদি এই অধ্যয়নে ব্যয় হয়ে যায় তাহলে ভালো। যিকির ও মুরাকাবার কোনো লোভ করবেন না।

মোগলদের ইসলাম বিরোধী শাসনামলে মুজাদ্দিদে আলফেসানী যখন দ্বীন-ইসলাম প্রচার এবং বাতিলের প্রতিবাদ শুরু করেন, তখন বাতিল পীরেরা তাঁর এ কাজের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ বাতিলপন্থী পীরদের উৎখাত এবং তাসাউফের সংশোধন না হলে দ্বীন-ইসলামকে সঠিকভাবে প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এ জন্যে তিনি তাসাউফের অনেকখানি সংশোধনও করেছেন, মুক্ত করেছেন তাকে বাতিল চিন্তা ও তরীকা থেকে।

আসল কথা হলো, পীরবাদ মোটেই ইসলামী জিনিস নয়। ইসলামের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে তার প্রচলন হয়নি। তার উন্মোষই হয়েছে ইসলামের পতন যুগে। অবশ্য ইসলামের অনেক মনীষীও ইল্‌মে তাসাউফের মাধ্যমে

জনগণকে দ্বীন-ইসলামের দিকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু পীরবাদে যে মূল দোষ-ত্রুটি ছিল, তার বীজ রয়েই গেছে এবং তা সৃষ্টি করে রেখেছে একটি বিষবৃক্ষ। বর্তমানে তাই এক বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়ে জনগণকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করছে, বিষাক্ত করছে জনগণের আকীদা ও আমলকে। দ্বীন-ইসলামের মূল সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এ বাতিল পীরবাদের মূলোৎপাটন আজও অপরিহার্য, যেমন অপরিহার্য ছিল মুজাদ্দিদে আলফেসানীর জীবনকালে।

পীরবাদ ও বায়'আত গ্রহণ রীতি

বর্তমান পীর-মুরীদী ক্ষেত্রে মুরীদকে 'বায়'আত' করা, মুরীদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ এবং মুরীদের পক্ষে পীরের নিকট বায়'আত করা এক মৌলিক ব্যাপার। বস্তুত 'বায়'আত' করা সুন্নাত মুতাবিক কাজ বটে; কিন্তু পীর-মুরীদীর 'বায়'আত' সম্পূর্ণ বিদয়াত, যেমন বিদয়াত স্বয়ং 'পীর-মুরীদী।'।

'বায়'আত' আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো ক্রয় বা বিক্রয় করা। এ শব্দটি বললেই দু'টি পক্ষের কথা মনে জাগে। এক পক্ষ 'বায়'আত' করে আর অপর পক্ষ 'বায়'আত' কবুল করে। একজন বিক্রেতা, অপরজন ক্রেতা। এই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারটি বড়ই সঙ্গীন। ইসলামে এর স্থান কোথায়, কি এর প্রকৃত ব্যাপার এবং সে ক্ষেত্রে সুন্নাত তরীকাই বা কি তা আমাদের বিস্তারিত জানতে হবে।

'বায়'আত', শব্দের ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে ইমাম রাগেব ইসফাহানী লিখেছেনঃ আরবী ব্যবহার وَبَايَعَ السُّلْطَانَ এর অর্থ ঃ

اِذَا تَضَمَّنَ بَذْلُ الطَّعَةِ لَهُ بِمَا رَضَخَ لَهُ وَيُقَالُ لِذٰلِكَ بَيْعَةٌ وَمُبَا يَعَةٌ - (مفردات)

যখন কেউ কোনো সার্বভৌমের আনুগত্য স্বীকার করে তাকে মেনে চলার স্বীকৃতি দেয়, তখন এ কাজকে বলা হয় 'বায়'আত' করা বা পারস্পরিক বায়'আত গ্রহণ। আর এ থেকেই বলা হয়ঃ সে সার্বভৌমের নিকট 'বায়'আত' করেছে বা দুজন পারস্পরিক 'বায়'আত' করেছে।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স)-এর নিকট সাহাবাদের 'বায়'আত' করার কথা উল্লেখ করেছেন নানা জায়গায়। প্রথমত যে সব লোক প্রথম ঈমান এনে ইসলাম কবুল করতো, তারা রাসূলের নিকট 'বায়'আত' করতো, রাসূল তাদের নিকট থেকে 'বায়'আত' কবুল করতেন। সূরা আল -ফতহ্র আয়াতে হুদায়বিয়ায় গৃহীত 'বায়'আতে'র উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ط يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ج فَمَنْ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ج وَمَنْ أَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهُ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا -

(الفتح ١٠)

হে নবী, যারা তোমার হাতে 'বায়'আত' করে, তারা আসলে 'বায়'আত' করে আল্লাহ্‌র নিকটই। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের ওপর সংস্থাপিত। অতঃপর যে-ই এ 'বায়'আত' ভঙ্গ করে, এ 'বায়'আত' ভঙ্গের ক্ষতি তার নিজের ওপরই চাপবে। আর যে তা পুরা করবে, যা সে আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করছে, তাকে অবশ্যই বিরাট প্রতিফল দেয়া হবে।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'বায়'আত' ইসলামী জীবনধারার এক মৌল ব্যাপার। কিন্তু সে 'বায়'আত' রাসূলের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় স্বয়ং আল্লাহ্‌র সাথে এবং সে 'বায়'আত' হলো খালিস ও পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করার 'বায়'আত', আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে চলার 'বায়'আত' এবং আল্লাহ্‌র পথে তাঁর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে আত্মদানের 'বায়'আত', জিহাদে শরীক হওয়ার 'বায়'আত'।

এ হলো সাধারণ পর্যায়ে 'বায়'আত'। এ পর্যায়ের আর এক বায়'আয়াতের উল্লেখ হয়েছে, যা রাসূলে করীম (স) গ্রহণ করতেন মুমিন মহিলাদের নিকট থেকে। সূরা 'মুমতাহিনায়' বলা হয়েছে ঃ

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى أَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

(الممتحنة : ١٢)

হে নবী, মুমিন মহিলারা যদি তোমার নিকট এসে 'বায়'আত' করে এসব কথার ওপর যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে একবিন্দু শির্‌ক করবে না, তারা চুরি করবে না, তারা যিনা-ব্যভিচার করবে না, তারা তাদের সন্তান হত্যা করবে না, তারা প্রকাশ্যভাবে মিথ্যামিথ্যি কোনো অমূলক কাজের দোষ কারো ওপর আরোপ করবে না, আর তারা ভালো পরিচিত কাজে তোমার নাফরমানী করবে না, তাহলে তুমি তাদের নিকট থেকে এ 'বায়'আত' গ্রহণ করো, আর

আল্লাহ্‌র নিকট তাদের জন্যে মাগফিরাতের দো'আ করো, আল্লাহ্ নিশ্চিতই বড় ক্ষমাশীল এবং অতীব করুণাময়।

এ আয়াত স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, নবী করীম (স) কি কি বিষয়ে মুসলিম মেয়েদের নিকট থেকে 'বায়'আত' গ্রহণ করেছেন। বিষয়গুলো যে ইসলামী ঈমান ও আমলের একেবারে মৌলিক,— কবীরা গুনাহ না করার প্রতিশ্রুতিতেই যে 'বায়'আত' গ্রহণ করা হয়েছে— তা স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে। কাজেই সুন্নাত অনুযায়ী 'বায়'আত' হলো শুধু তাই, যা এসব বিষয়ে এবং এ ধরনের মৌলিক বিষয়েই করা হবে বা গ্রহণ করা হবে। এক কথায়, ইসলামের হুকুম-আহকাম পুরোপুরি পালন করার এবং শরীয়তের বরখেলাফ কোনো কাজ না করার ওয়াদা দিয়ে ও নিয়ে-ই যে বায়'আত করা বা গ্রহণ করা হয় তা-ই হলো সুন্নাত মুতাবিক বায়'আত। এরূপ বায়'আত গ্রহণই সুন্নাত হতে পারে অন্য কোনোরূপে বায়'আত নয়।[১]

দ্বিতীয়, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রয়োজন অনুসারে নবী করীম (স) মুসলমানদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। এ পর্যায়েরই বায়'আত হলো বায়'আতে রেজওয়ান। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের বলা হয়েছে

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - (الفتح : ١٨)

যেসব মু'মিন লোক গাছের তলায় বসে হে নবী! তোমার নিকট 'বায়'আত' করেছিল, আল্লাহ তাহাদের প্রতি রাজি ও সুখী হয়েছেন। তাদের মনের আবেগ ও দরদের ভাবধারা তিনি ভালোভাবেই জেনেছিলেন এবং তাদের প্রতি পরম গভীর শান্তি নাযিল করেছিলেন এবং নিকটতর বিজয় দানেও তাদের ভূষিত করেছিলেন।

---

১. হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বলেছেন ঃ

بَايَعْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلٰى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لَا نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهٗ وَعَلٰى اَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِيْ اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ - (بخارى، مسلم)

হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, এরূপ 'বায়'আত' করার জন্যে নবী করীম (স) সমস্ত সাহাবীদের আহবান করেছিলেন। এই বায়'আত সম্পর্কে তখনকার লোকেরা বলতো ঃ

بَايَعَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى الْمَوْتِ -

নবী করীম (স) লোকদের নিকট থেকে তো মৃত্যু কবুল করার 'বায়'আত' গ্রহণ করেছিলেন।

আর হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبَا يِعْهُمْ عَلَى الْمَوْتِ وَلٰكِنْ بَايَعْنَا عَلَى اَنْ لَّا نَفِرَّ فَبَا يَعَ النَّاسُ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَضَرَهَا اِلَّا الْجَدُّ بْنَ قَيْسٍ اَخُوْ بَنِىْ سَلْمَةَ -

নবী করীম (স) ঠিক মৃত্যু কবুলের জন্যে বায়'আত গ্রহণ করেন নি। বরং আমরা বায়'আত করেছি এর ওপর যে, আমরা কেউ-ই যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাব না। ফলে লোকেরা বায়'আত করেছিল এবং উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কেবল বনী সালমা গোত্র সরদার জাদ্দ ইবনে কায়স ছাড়া আর কেউই পালিয়ে যায়নি। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড)

'বায়'আতে' রেজওয়ান' যে কঠিন মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং কি গুরুত্বর ব্যাপার নিয়ে তা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট জানা গেল। অনুরূপভাবে জিহাদের ক্ষেত্রেও নবী করীম (স) বায়'আত গ্রহণ করতেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন ঃ

كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حُيِّيْنَا اَبَدًا - (بخارى)

আনসার লোকেরা বলতো ঃ আমরা খন্দকের দিন নবীর নিকট জিহাদের জন্যে বায়'আত করেছি, যদ্দিন আমরা বেঁচে থাকব তদ্দিনের জন্যে।

আর হাদীস থেকে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নবী করীম (স) সাধারণভাবে আনুগত্যের বায়'আতও গ্রহণ করতেন এবং লোকেরা তা করতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ

كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُ - (مسلم)

আমরা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট শোনা ও মেনে চলার (আনুগত্য করার জন্যে) 'বায়'আত' করতাম। রাসূল (স) সে বায়'আত গ্রহণ করতেন। তবে এ বায়'আতে নবী করীম (স) আমাদেরকে 'যতদূর আমাদের ক্ষমতায় কুলায়' বলে একটি শর্ত আরোপ করতেন।

রাসূল (স)-এর জামানায় বায়'আতের এ-ই ছিল তাৎপর্য এবং ব্যবহার। পরবর্তীকালে সাহাবাদের যুগেও এই 'বায়'আত' ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তা হয়েছে শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে খলীফার আনুগত্য করার শপথ বা প্রতিশ্রুতি দেয়ার জন্যে। যেমন নবী করীম (স)-এর ইন্তিকালের পর খলীফা নির্বাচনী সভায় হযরত উমর ফারুক (রা) সর্বপ্রথম বায়'আত করলেন হযরত আবু বকর (রা)-এর হাতে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

فَقَالَ عُمَرُ بَلْ نُبَايِعُكَ اَنْتَ فَاَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَ اَحَبُّنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهٖ فَبَايَعَهُ وَ بَايَعَهُ النَّاسُ -

(بخاری :ج -۱، ص - ۵۱۸)

হযরত উমর আবু বকরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ না, আমরা তো আপনার হাতে বায়'আত করবো, আপনিই আমাদের সরদার, আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি এবং নবী করীমের নিকট আমাদের অপেক্ষা সর্বাধিক প্রিয় লোক। অতঃপর উমর ফারূক (রা) তাঁর হাত ধরলেন এবং বায়'আত করলেন, আর সেই সঙ্গে উপস্থিত সব লোকই বায়'আত করলো।

এ ঘটনা থেকে এ কথা তো প্রমাণিত হচ্ছে যে, বায়'আত করা ও বায়'আত গ্রহণ করা মুসলিম সমাজে একটি সুন্নাত হিসেবেই চালু রয়েছে। নবী করীম (স)-এর পরেও কিন্তু সে বায়'আত ছিল হয় জিহাদে যোগদান করার জন্যে, না হয় রাষ্ট্রীয় আনুগত্য প্রকাশের জন্যে। কিন্তু পীর-মুরাদীর ক্ষেত্রে ঃ

بیعت کیا میں نے بیچ طریقۂ چشتیہ، قدریہ، نقشبند یہ، مجددیہ اورمحمدیہ کے اوپر ہاتہ فقیر حقیر -

'চিশতীয়া, নকশবন্দীয়া মুজাদ্দিদীয়া ও মুহাম্মাদীয়া তরীকায় ফকীর-হাকীরের' হাতে বায়'আত লওয়ার বর্তমানকালে প্রচলিত এই সিলসিলা এল

কোত্থেকে, এ বায়'আতের সাথে নবী করীম (স) ও সাহাবাদের বায়'আতের সম্পর্ক কি ? —মিল কোথায় ? —আসলে এ হচ্ছে ইসলামের একটি ভালো কাজকে খারাপ ক্ষেত্রে ও খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার মতো ব্যাপার। اَمْرٌ حَقٌّ اُرِيْدَ بِهِ الْبَاطِلُ কাজটা ভালো, কিন্তু তা খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এ কারণেই পীর-মুরীদীর ক্ষেত্রে হাতে হাতে কিংবা পাগড়ী ধরে অথবা পাগড়ী ধরা লোকের গায়ে গা মিলিয়ে বায়'আত করা, বায়'আত করা নানা তরীকায় মুরাকাবা করার জন্যে— সম্পূর্ণ বিদয়াত। আরো বড় বিদয়াত হলো মুরীদ ও পীরের কুরআন বাদ দিয়ে 'দালায়েলুল খায়রাত' নামে এক বানানো দরূদ সম্বলিত কিতাবের তিলাওয়াতে মশগুল হওয়া। মনে হয় এর তিলাওয়াত যেনো একেবারে ফরয। কিন্তু শরীয়তে কুরআন ছাড়া আর কিছু তিলাওয়াত করাকে বড় সওয়াবের কাজ মনে করা, কুরআন অপেক্ষা অন্য কোনো মানবীয় কিতাবকে অধীক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা সুস্পষ্টরূপে এক বড় বিদয়াত।

শুধু তা-ই নয়, বায়'আত শব্দের শাব্দিক অর্থ বিক্রয় করা। যে লোকই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে ও বিশ্বাস করেছে, সে তো নিজেকে আল্লাহ্‌র নিকট বিক্রয় করেই দিয়েছে, সে নতুন করে নিজেকে কোনো পীরের হাতে বিক্রয় করতে পারে কোন অধিকারে ? আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ - (توبه : ١١١)

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের নিকট হতে তাদের জান ও মালকে ক্রয় করে নিয়েছেন এ শর্তে যে, তিনি এর বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন।[১]

কাজেই আল্লাহ্‌র নিকট জান-মাল বিক্রয় করার পর তা যদি কোনো পীরের হাতে পুনরায় বিক্রয় (বায়'আত) করে তবে তা হবে অনধিকার চর্চা, সুস্পষ্ট শির্‌ক।[২]

উপমহাদেশের প্রচলিত পীর-মুরীদীর সব কয়টি সিল্‌সিলা যদিও হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ পর্যন্ত পৌঁছায় এবং তাঁর থেকে ওপরের দিকে চলে যায়,

১. এ আয়াত অনুযায়ী ক্রেতা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্, বিক্রেতা হচ্ছে মুমিন ব্যক্তি। বিক্রয়ের জিনিস হলো মুমিন ব্যক্তির নিজ সত্তা এবং তার মূল্য হচ্ছে জান্নাত দানের ওয়াদা। এ ক্রয়-বিক্রয় যথারীতি সম্পন্ন হয়ে গেছে, যখনই একজন লোক সচেতন মনে পড়েছে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

২. উপরন্তু আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট বায়'আত করার উদ্দেশ্য যে আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য জিহাদ করা, তা আয়াতের পরবর্তী শব্দগুলোতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। অথচ পীরদের নিকট বায়'আত করার উদ্দেশ্য হলো চোখ বন্ধ করে মুরাকাবা-মুশাহিদা করা, যিকির করা, কল্পনার জগতে উড়ে বেড়ানো। এ ধরনের 'বায়'আতের মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সায়্যিদ আহমদ শহীদ কোনো পীর-মুরীদী করেছিলেন তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। বরং তাঁর প্রমাণ্য জীবনীগ্রন্থে এই কথাগুলো বলিষ্ঠভাবে উদ্ধৃত পাওয়া যায়।

তিনি যখন দিল্লীতে অবস্থানকারী শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভীর সুযোগ্য পুত্র এবং কুরআন-হাদীস ও সমসাময়িক যুগের সকল সূক্ষ্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভীর নিকট মৌখিকভাবে কুরআন হাদীসের শিক্ষা লাভ করে বেরেলী ফিরে আসলেন, তখন তিনি নিজের বাসগৃহে বসবস গ্রহণ না করে মজিদে অবস্থান গ্রহণ করলেন ও কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে জনগণকে ওয়াযনসীহত করতে শুরু করলেন। তখন বিপুল সংখ্যক জনতা তাঁর হাতে বায়'আত করে তাঁর মুরীদ হওয়ার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করলো এবং তাঁকে সেজন্য বাধ্য করতে চেষ্টা করতে লাগল। তিনি মুরীদ বানাতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করলেন। বললেন, মুসলমানদের পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর মুরীদ হওয়াই যথেষ্ট। মিথ্যা বলবে না, ধোঁকা দেবে না, নিজের স্বার্থের খাতিরে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে না— এটাই তোমাদের প্রতি নসীহত। তোমরা যদিও কারো মুরীদ হলে আর তারপরও এসব কাজ করতে থাকলে, তাহলে সে মুরীদী তোমাকে কোনো ফায়দা দেবে না। আর যদি নেক নিয়্যতে এসব নেক আমল পাবন্দীর সাথে করলে তাহলে তোমাকে কারো নিকট মুরীদ হওয়ার প্রয়োজন হবে না। তখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের পীর হবে এবং স্বীয় বিদ্রোহী নফ্সকে তোমাদের মুরীদ বানিয়ে নেবে। তোমরা তোমাদের নফ্সের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করো, যেন তা কোনো দিনই শয়তানী ওয়াস্ওয়াসার অনুসরণকারী না হয়। পরকালের নাজাত পাওয়ার এটাই হচ্ছে যথেষ্ট পন্থা। (حيات طيبة ازرزا حيرت دهلوى صفحه نهبر ٥٠)

বস্তুত নবী করীম (স)-এর বায়'আত গ্রহণের অন্তর্নিহিত মৌল ভাবধারার সাথে সায়্যিদ আহমদ শহীদের উপরোদ্ধৃত কথাগুলোর যে মিল রয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। তিনি স্বভাবতই পীর মুরীদী পছন্দ করতেন না। লোকেরা তাঁর সম্মুখে মাথা নত করে বসবে ও তার তা'জীম করবে, তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জাহির করবে তা তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। তাই এ সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে তিনি সেনাবাহিনীতে চাকরী গ্রহণ করে বহু দূরে চলে যান। উত্তরকালে তিনি যে জিহাদের জন্য বায়'আত গ্রহণ করতেন তা অনস্বীকার্য।

গদীনশীন হওয়ার বিদয়াত

এ পর্যায়ে আর একটি বড় প্রশ্ন হলো এই যে, পীর-মুরীদীর ক্ষেত্রে এই যে 'গদীনশীন পীর' হওয়ার প্রথা চালু হয়েছে ইসলামী শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি

আছে কি ? কোনো মতে একজন লোক যদি একবার 'পীর' নামে খ্যাত হতে পারল, অমনি তাঁর বড় পুত্র অবশ্যই তাঁর গদীনশীন হবে। কিন্তু পীরের গদী কোনটি, যার ওপর বড় সাহেব 'নশীন' হন ? পীর কি কোনো জমিদার যে, তার মৃত্যুর পর তার বড় পুত্র বাবার স্থলে জমিদার হয়ে বসবে ? পীর-মুরীদী কি কোনো রাজা-প্রজার ব্যাপার— পীর সাহেব রাজা-বাদশাহ এবং মুরীদরা তাঁর প্রজা, আর সে রাজার অন্তর্ধানের পর অমনি তার বড় পুত্র সিংহাসনে আসিন হয়ে বসবে ? না পীর কোনো বড় দোকানদার যে, তার মরে যাওয়ার পরে সে দোকানদারের গদীর মালিক হয়ে বসবে তার বড় ছেলে ? ... এর কোনটি ? এর মধ্যে যা-ই হোক, এর কোনোটির সাথে যে ইসলামের একবিন্দু সম্পর্ক নেই, তা তো স্পষ্ট কথা। ইসলামে নেই কোনো জমিদারী, বাদশাহী; নেই দ্বীন নিয়ে এখানে কোনো দোকানদারী ব্যবসা চালাবার অবকাশ!

শুধু তা-ই নয়, কেউ পীর নামে খ্যাত হলে অমনি তার ছেলেরা 'শাহ্' বলে অভিহিত হতে শুরু করে। 'শাহ্' মানে বাদশাহ। পীরের ছেলেকে 'শাহ' বা 'বাদশাহ' বলার মানে এ-ই হতে পারে যে, পীর সাহেব নিজে একজন বাদশাহ; আর তাঁর ছেলেরা হলো খুঁদে বাদশাহ— বাদশাহজাদা। বুড়ো বাদশাহর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর ছেলেদের মধ্যে যে বড়, সে অমনি পীর— গদীনশীন হয়ে বসবে, আর অমনি তার পুত্রেরা পূর্বানুরূপ শাহ উপাধিতে ভূষিত হতে শুরু করবে। এই চিরন্তন নিয়ম আবহমানকাল থেকে চলে আসছে, এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি কখনো, কোনো ক্ষেত্রেই।

এ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, পীর-মুরীদীর প্রথাটাই আগাগোড়া একটা জাহিলিয়াতের প্রথা। অন্তত এ কথাটা তো অতি পরিষ্কার যে, এ প্রথার প্রচলন হয়েছে এমন এক যুগে, যখন সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রচণ্ড বাদশাহী প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ সর্বাত্মক ব্যবস্থার প্রভাব নিতান্ত ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এমন প্রচণ্ড হয়ে পড়েছিল যে, ধর্মীয় নেতৃত্বকেও অনুরূপ এক ধরনের বাদশাহী মনে করা হয়েছে, বাদশাহীর ন্যায় 'বাদশাহর ছেলে বাদশাহ হবে' এই নীতি অনুযায়ী 'পীরের ছেলে পীর হবে' এ ধারণাও বদ্ধমূল করে নেয়া হয়েছে। বাদশাহর ছেলেকে বলা হয় 'শাহজাদা'— এ ঠিক শাব্দিক অর্থেই সঠিক প্রয়োগ (ইংরেজীতে বলা হয় prnce) পীরের ছেলেকেও তাই 'শাহ' বলা হতে লাগল— এ হলো কৃত্রিম অর্থে। কেননা পীরও আসলে বাদশাহ নয়। আর তার ছেলেও নয় বাদশাহজাদা। এখানে মজার ব্যাপার এই যে, পীরের ছেলেরাই সব কিছু, তারাই 'শাহ' নামে অভিহিত হয়, তাদের মধ্যে যে বড়, সে-ই হয় গদীনশীন, কিন্তু বেচারী মেয়েদের কোনো অধিকার স্বীকৃত নয়, না মেয়েদের

সন্তানদের কোনো অধিকার সেখানে স্বীকৃত। সব কিছুই চলে পীরের ছেলে পীর, তার ছেলে পীর এই ধারাবাহিকতার অব্যাহত ধারায়। এ ধারা কখনই পীরের কন্যাদের দিকে প্রবাহিত হয় না। ঠিক বাদশাহী সিস্টেমও তাই। সেখানে গদী— তথা রাজ তখতের ওপর একমাত্র অধিকার ছেলেদের, সব ছেলে নয়, কেবল মাত্র বড় ছেলের, আর তার বংশধরদের। মুসলমানদের মাঝে যে বাদশাহী সিস্টেম রয়েছে, তাতে অবশ্য অনেক সময় দেখা যায় বড় ছেলে বাদশাহ হয়ে গেলে ছোট ভাই বা তাদের কেউ— 'অলী আহমদ' হয়। তার মানে এ বাদশাহর পর তার ছেলে নয়, তার এ ভাই হবে গদীনশীন। কিন্তু পীর-মুরীদীর ক্ষেত্রে এ বাদশাহী সিস্টেম এতদূর বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, এখানে বড় ছেলেই সব। বড় ছেলে একবার গদীনশীন হয়ে বসতে পারলে সে-ই সব কিছু হর্তা-কর্তা বিধাতা। সে পিতার কেবল গদীই দখল করে বসে না, পিতার মুরীদরা সব তার মুরীদে পরিণত হয়ে যায় আপনা-আপনিভাবে। যেমন জমিদার বা রাজার প্রজারা আপনা-আপনি তার ছেলেরও প্রজা হয়ে যায়। আর বিত্ত-সম্পত্তি কিছু থাকলে তারও একমাত্র ভোগদখলকারী হয় এই বড় সাহেব, যিনি গদীনশীন হয়ে বসেন। ছোট ভাই কেউ থাকলে তারা হয় চরম অসহায়, উপেক্ষিত, বঞ্চিত এবং পিতার বিশাল মুরীদ মহল থেকে বিতাড়িত।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এসব কথা কি ধর্মীয় ? হতে পারে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এ-ই নীতি। সেখানে ব্রাহ্মণের বড় পুত্র অবশ্যই ব্রাহ্মণ হবে, আর সে আপনা-আপনি পেয়ে যাবে পিতার যজমানদের। এতদিন তারা ছিল 'বুড়ো ব্রাহ্মণের' যজমান, আর এখন হবে তারা এই ব্রাহ্মণ-পুত্র— ব্রাহ্মণের যজমান— পার্থক্য শুধু এতটুকু। তবে কি এ ব্রাহ্মণ প্রথা হরফে হরফে মুসলিম সমাজেও চালু হয়ে গেছে?

এ সম্পর্কে কারোরই একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এ প্রথার সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই। এ প্রথা কিছু মাত্র ইসলামী নয়। ইসলামে গদীনশিনীর কোনো অবকাশ নেই, নেই 'শাহ' হওয়ার কোনো সুযোগ। ছোট ভাই এবং বোনদের অধিকার হরণ করে একাই সব কিছু গ্রাস করে নেয়ার এ ব্যবস্থা ইসলামের আদৌ সমর্থিত হতে পারে না।

ইসলাম আমরা পেয়েছি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকট থেকে। তিনি ইসলামকে শুধু মৌখিক নসীহতের মাধ্যমেই পেশ করেননি, তিনি তাঁর বাস্তব জীবন দিয়ে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শকে বাস্তবায়িত ও সমাজে প্রতিফলিত করে গেছেন। তিনি তেইশ বছরের সাধনা ও সংগ্রামের ফলে কায়েম করে গেছেন বিরাট এক রাষ্ট্র। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর বংশে চললো না নবুয়্যতের ধারা, না হলো কেউ গদীনশীন নবী। তিনি যে রাষ্ট্র কায়েম করে গেলেন,

তাতেও কায়েম হলো না তাঁর বংশের লোকদের কর্তৃত্ব। বরং মুসলমানরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মধ্য থেকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচিত করে নিলেন। সে খলীফা না হলেন তাঁর প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমা, না তাঁর জামাতা, না তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় নাতি দৌহিত্রেরা। নবুয়্যতের ধারাও চললো না তাঁর বংশে। এমনি তাঁর সম্মানিত জামাতাদেরও কেউ এ সূত্রে রাসূল-পরবতী খলীফা হলেন না। উত্তরকালে তাঁদের কেউ খলীফা নিযুক্ত হলেও তা রাসূলের জামাতা হওয়ার কারণে নয়, তা হয়েছেন তদানীন্তন সমাজে তাঁদের নৈতিক ও যোগ্যতার বৈশিষ্ট্যের কারণে। এ-ই ইসলামী ব্যবস্থা। এখানে বংশানুক্রমিকতা সম্পূর্ণ অচল। এ পীর-মুরীদী যদি রাসূলে করীম (স)-এর থেকেই চলে এসে থাকে— যেমন দাবি করা হচ্ছে, তাহলে এখানে এ গদীনশীন, 'শাহ' হওয়ার প্রথা এল কোত্থেকে ? রাসূলের জীবনে এবং তাঁর কায়েম করা সমাজে তো এর নামনিশানাও দেখা যায় না। খুলাফায়ে রাশিদুনের ক্ষেত্রেও ছিল না খলীফার ছেলে খলীফা হয়ে বসার প্রথা। বরং তাঁরা প্রত্যেকেই এ বংশানুক্রমিকতার প্রতিবাদ করেছেন। কোন খলীফার ছেলেই খলীফা হতে পারে নি— না হযরত আবু বকরের, না উমর ফারূকের, না উসমান যিন্নুরাইনের, না আলী হায়দার (রা) এর। তাহলে প্রমাণিত হলো যে, এ প্রথা রাসূলের নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়নি। অতএব তা সুন্নাত নয়, তা স্পষ্ট বিদয়াত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এ বিদয়াতী প্রথায় গদিপ্রাপ্ত লোকেরাই সমাজে নিজেদেরকে পেশ করছে সুন্নাতের একজন বড় পায়রবী করনেওয়ালা— সুন্নাতের বড় ধারক বাহকরূপে। তার দৃষ্টিতে তিনি ছাড়া আর কেউই নাকি হক পথে নেই। অথচ সম্পূর্ণ বিদয়াতী সিস্টেমে 'গদীনশীন' হয়ে নিজেকে 'আহলে সুন্নাত' হিসেবে পেশ করা এবং সুন্নাতের বড় অনুসারী হওয়ার দাবি করা বিদয়াত, বিদয়াতের নির্লজ্জ ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়।

এখানেই শেষ নয়, এ গদীনশিন যদি জনমতের ভিত্তিতে ও উপযুক্ততার কারণে হতো, তাহলেও তার কোনো না-কোনো দৃষ্টান্ত সলফেসালেহীনে হয়ত বা পাওয়া যেত। কিন্তু এখানে কোনো জনমতের স্থান নেই, যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার নেই। ব্যস্ বড় ছেলে হওয়াই গদী পাওয়ার অধিকারী হওয়ার জন্যে বড় দলীল। এর ফলে এ গদীনশিনী হয়ে গেছে এক ন্যক্কারজনক ব্রাহ্মণ্যবাদ পীরের ইন্তিকালের পর তাঁর মুরীদান খুলাফার মাঝে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী কোন্ লোক সত্যি পরবর্তী পীর হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত, সে বিচার করা হয় না এখানে এবং সুন্নাত তরীকা মতো সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী ও যোগ্য ব্যক্তিকে গদীনশীন করার কোনো প্রবণতাই এখানে পরিলক্ষিত হয় না। সে রকম লোককে নিজেদের মধ্য থেকে তালাশ করেও বের করা হয় না। এখানে স্থায়ীভাবে ধরে নেয়া হয়— স্বয়ং

পীর সাহেবও জানেন, জানে মুরীদরা, জানে সাধারণ মানুষ যে, হুযুরের বড় ছেলেই হবে পরবর্তী পীর, গদীনশীন। সে ছেলে লেখাপড়া কিছু জানুক আর না-ই জানুক, নৈতিক চরিত্র তার যতই খারাপ হোক, জ্ঞান-বুদ্ধিতে সে যতই 'বুদ্ধু' হোক, সেই হবে পরবর্তী পীর। আর মরহুম পীরের মতোই যোগ্যতাসম্পন্ন লোক সে দরবারে অন্য কেউ থাকলেও তাকে সেখানে কোনো স্থান দেয়া হবে না। শুধু তা-ই নয়, সেই যোগ্য আলিম ও অধিক মুত্তাকী ব্যক্তিকেও বরং মুরীদ হতে হবে সেই অযোগ্য অ-আলিম— মানে জাহিল, চরিত্রহীন ও বুদ্ধু গদীনশীন পীরের। নতুবা সে দরবারে তার কোনো স্থান হবে না, সেখান থেকে অনতিবিলম্বে বিতাড়িত হতে হবে।

এ যে তথাকথিত জমিদারতন্ত্র, রাজতন্ত্র, আর ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভৃতি জাহিলিয়াতের সব পদ্ধতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এর সাথে ইসলামের সুন্নাতের দূরতম সম্পর্কও থাকতে পারে কি ?

কোনোরূপ সম্পর্ক থাকতে পারে না। শুধু তাই নয়, এই পীর ও তার মুরীদরা— এ পীরের সমর্থকরা, হাদিয়া-তোহ্ফা ও টাকা-পয়সা যারা দেয়, তারা সকলেই রাসূলে করীম (স)-এর ঘোষণানুযায়ী আল্লাহ্র নিকট অভিশপ্ত। হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (স) এর চারটি কথার তৃতীয় কথা হচ্ছে ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِ ثًا - (رواه مسلم)

আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত করেছেন সেই ব্যক্তিকে যে বিদয়াতকারী বা বিদয়াতপন্থীকে আশ্রয় দিয়েছে, সম্মান করেছে এবং সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছে।

পীর-মুরীদী সম্পর্কে আমার চূড়ান্ত কথা।

পীর-মুরীদী সম্পর্কে আমি ওপরে যা কিছু লিখেছি, পাঠক মহোদয় লক্ষ্য করে দেখলেই স্বীকার করবেন যে, আমি নিজস্ব মনগড়া কোনো কথা লিখিনি। তা যেমন কুরআন, সুন্নাত ও সর্বজনমান্য মনীষীবৃন্দের কথার দলীলের ভিত্তিতে লিখেছি তেমনি এ পর্যায়ে আমার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

কিন্তু সে অভিজ্ঞতা শুধু বিদয়াতী পীর সম্পর্কে বা পীর-মুরীদীর বিদয়াত হওয়া সম্পর্কেই নয়, এর বিপরীত এ অভিজ্ঞতাও আমার আছে যে, সিলসিলার ও পীরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হিসেবে গদীনশীন হওয়ার পরও কেউ কেউ এমন আছেন, যিনি পীর-মুরীদকে বিদয়াত ও নিছক ব্যবসায়ীর

কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে তাঁকে ঠিক উস্তাদ-শাগরিদ, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক কার্যত স্থাপন করেছেন। মারিফাত চর্চাকে শরীয়তের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করেছেন। শরীয়তকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে মারিফাত শিক্ষাদানের কাজ করেছেন এবং এই গোটা তৎপরতার সাথে জিহাদের সম্পর্ক স্থাপন করে দ্বীনী বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। তা দেখে দিল খুশিতে ভরে গেছে এবং মনে আশা জেগেছে যে, আল্লাহ্র নাযিল করা ও সর্বশেষ নবী রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রচারিত ও কায়েম করা দ্বীন হয়ত এখানে কায়েম হবে। মূলত খিলাফতে রাশেদার অবসানের পর প্রথম দিকে দ্বীন কায়েমের যেসব চেষ্টা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তা দ্বীনভিত্তিক মারিফাত ও জিহাদের বিপ্লবী ভাবধারা সমন্বিত ছিল, যাঁর ধ্বংসাবশেষ রূপ বর্তমান ব্যবসা মূলক বিদয়াতপন্থী পীর-মুরীদী। বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন করে সেই আসল ও আদর্শবাদভিত্তিক উস্তাদ-শাগরিদমূলক জন-সংগঠনের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের জন্য দ্বীন ও শরীয়তের, মারিফাত ও জিহাদের সমন্বয় নতুন করে কায়েম করাই বর্তমান মরণাপন্ন মুসলিম সমাজকে রক্ষা করা ও দ্বীনের ভবিষ্যৎ-উজ্জ্বল করার একমাত্র উপায়। ধর্মহীন রাজনীতি, রাজনীতিহীন ধর্ম— উপরন্তু দ্বীনের শুষ্ক তাত্ত্বিকতা দ্বীন কায়েমের পথে বড় বাঁধা। দ্বীন-ইসলামের নির্ভুল তত্ত্বকে হৃদয়ের ঈমানী আবেগে সঞ্জীবিত করে জিহাদী কার্যক্রমের মাধ্যমেই পীর-মুরীদীর পুর্নগঠন হওয়া আবশ্যক।

মানত মানায় শির্‌ক-এর বিদয়াত

কোনো কিছুর জন্যে কোনো কাজ করার বা কিছু দেয়ার মানত মানার সুযোগ ইসলামে রয়েছে। এ মানতকে আরবী ভাষায় বলা হয় نذر আর نذر -এর অর্থ ইমাম রাগেব লিখেছেন ঃ

اَلنَّذْرُ اَنْ تُوَا جِبَ عَلٰ نَفْسِكَ مَا لَيْس بِوَاجِبٍ لِحُدُوْثِ اَمْرٍ يُقَالُ نَذَرْتُ لِلّٰهِ اَمْرًا -

মানত বলা হয় এরূপ কাজকে যে, কোনো কিছু ঘটবার জন্যে তুমি নিজের ওপর এমন কোনো কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে— ওয়াজিব করে নেবে— যা আসলে তোমার ওপর ওয়াজিব নয়। যেমন বলা হয় ঃ আমি আল্লাহ্‌র জন্যে একাজ করার মানত মেনেছি।

ইবনুল আরাবী মানত-এর সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

هُوَ اِلْتِزَامُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ مِمَّا يَكُوْنُ طَاعَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الاَ عْمَالِ الْقُرْبَةِ -

(احكام القران :ج- ا، ص - ٢٦٨)

কোনো কাজ করার বাধ্যবাধকতা নিজের ওপর নিজের কথার সাহায্যে চাপিয়ে নেয়া, যে কাজ হবে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র ফরমাবরদারীমূলক এবং যা দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হতে পারে।

তাফসীরে আবুস সউদে লিখিত হয়েছে ঃ

اَلنَّذْرُ عَقْدُ الضَّمِيْرِ عَلٰى شَىْءٍ وَ اِلْتِزَامُهٗ -

মানত হচ্ছে মনকে কোনো কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা এবং তাকে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করা।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

قَالَ اَصْحَابُنَا اِلنَّذْرُ اِيْجَابُ شَىْءٍ عِبَادَةً اَوْ صَدَقَةً اَوْ نَحْوَهُمَا عَلٰى نَفْسِهٖ تَبَرُّعًا -

(عمدة القارى :ج -٢٣، ص- ١٦٣)

আমাদের মতের লোকেরা বলেছেন ঃ ইবাদত কিংবা দান-খয়রাতের কিছু নিজের ওপর অতিরিক্তভাবে ওয়াজিব করে নেয়াকেই মানত বলা হয়।

কুরআন মজীদে এ মানত মানার কথা বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। সূরা আল-বাকারার ২৭০ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ -

তোমরা যা কিছু খরচ করো বা মানত মানো, আল্লাহ্ তার সব কিছুই জানেন। আর জালিমদের জন্যে সাহায্যকারী কেউ নেই।

তাসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা লিখা হয়েছে এভাবে ঃ

اَىْ مَا اَوْجَبْتُمُ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى اَنْفُسِكُمْ مِنَ الطَّاعَاتِ بِشَرْطٍ اَوْ غَيْرِ شَرْطٍ -

মানত হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহ্র জন্যে করবে বলে কোনো কাজ নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নেবে শর্তাধীন কিংবা বিনা শর্তে।

এ আয়াত ও তাফসীরের উদ্ধৃতি স্পষ্ট বলে দেয় যে, মানত হতে হবে কেবল আল্লাহ জন্যে। যে মানত হবে এক মাত্র আল্লাহ্র জন্যে, কুরআনের ঘোষণানুযায়ী কেবল তাই জায়েয; যে মানত খালিসভাবে আল্লাহ্র জন্যে নয়, তা কুরআনের দৃষ্টিতে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কুরআনের যে ধরনের মানত সমর্থিত, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইমরান-স্ত্রীর মানত। সূরা আলে-ইমরানে ৩৫ আয়াতে বলা হয়েছেঃ

اِذْقَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ -

ইমরান-স্ত্রী বললেন ঃ হে আল্লাহ্, আমার গর্ভে সন্তান রয়েছে তা আমি তোমারই জন্যে মানত করলাম, তাকে দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখবে, অতএব তুমি আমার এ মানত কবুল করো।

ইমরান-স্ত্রীর মানত ছিল একান্তভাবে আল্লাহ্রই জন্যে। সে মানত এ দুনিয়ার কোনো স্বার্থলাভ লক্ষ্য ছিল না, তাতে আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক করা হয়নি। মানত যে কেবল আল্লাহ্র জন্যেই মানতে হয়— এ আয়াত তার স্পষ্ট পথ-নির্দেশ করেছে। ইমরান-স্ত্রীর কথা 'তোমারই জন্যে মানত মেনেছি' তা স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে। এর আর একটি দৃষ্টান্ত হলো সূরা মরিয়ামের ২৬ নং আয়াত। আল্লাহ তা'আলা নিজেই মরিয়ামকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا -

অতএব তুমি বলো আমি আল্লাহ্র জন্যেই রোযা মানত করলাম।

আল্লাহ্ নিজেই শিক্ষা দিলেন এ আয়াতের মাধ্যমে যে, মানত কেবল আল্লাহ্র জন্যেই মানতে হবে, অন্য কারো জন্য অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

এ পর্যায়ে কুরআন থেকে আরো দু'টো আয়াতাংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। একটি হলো ঃ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ —এবং তারা যেন তাদের মানতসমূহ পুরা করে। আর রাসূলের সাহাবীদের প্রশংসা করে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ —'তারা মানত পুরা করে।' এ ছাড়া আরো বহু আয়াত রয়েছে কুরআনে, যাতে আল্লাহ্‌র সাথে করা ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর মানত যেহেতু আল্লাহ্‌র সাথেই করা এক বিশেষ ধরনের ওয়াদা, সে জন্যে মানত অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

কুরআন, হাদীস ও ফিকাহর দৃষ্টিতে মানত মানার ব্যাপারে বুনিয়াদী শর্ত হলো এই যে, তা মানতে হবে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে, আল্লাহ্‌র সন্তোষ বিধানের জন্যে। যে মানত আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্যে করা হয়নি, তা মূলতই মানত নয়। তা পূরণ করাও ওয়াজিব নয়। উপরন্তু সে মানত হতে হবে এমন কাজ করার, যে কাজ আল্লাহ্‌র আনুগত্যমূলক যা আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কোনো কাজ নয়। হাদীসে এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, আবূ দাউদের কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন ঃ

রাসূলে করীম (স) কে বলতে শুনেছি ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا نَذْرَ اِلَّا مَا ابْتُغِيَ بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ -

যে মানত দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করতে চাওয়া হয়নি, তা মূলতই মানত নয়।

অথবা এর তরজমা হবে "মানত শুধু তাই, যা থেকে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করতে চাওয়া হয়েছে"।

ইমাম আহমদ মুসনাদে এবং তিবরানী তাঁর الاوسط গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) এক কঠিন গরমের দিনে লোকদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এ সময় তিনি একটি লোককে (সম্ভবত কোনো মরুবাসীকে) রোদের খরতাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন— কি ব্যাপার; তোমাকে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি কেন? লোকটি বললো 'আমি মানত করেছি'— 'আপনার ভাষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি রোদে দাঁড়িয়ে থাকব। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

اِجْلِسْ لَيْسَ هٰذَا بِنَذْرٍ، اِنَّمَا النَّذْرُ مَا اُرِيدَ بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ -

বসো মিয়া, এটা তো কোনো মানত হলো না। মানত তো শুধু তাই, যা করে আল্লাহ্র সন্তোষ হাসিল করা উদ্দেশ্য হবে।

এ মর্মের বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সে সবগুলো থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মানত এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ; ব্যক্তির কোনো বৈষয়িক স্বার্থ লাভ নয়, নয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তোষ লাভ, আর যে মানত সেরূপ হবে না, তা মানতই নয়, তা আদায় করাও কর্তব্য নয়।

মানত কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ করার উদ্দেশ্যে হলেই চলবে না, তা হতে হবে এমন কাজের মানত, যে কাজ মূলতই আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক। যে কাজ আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক নয়, তা করার মানত করা হলে তাও মানত বলে গণ্য হবে না, তা পূরণ করাও হবে না ওয়াজিব। হাদীসে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। হযরত ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلنَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَذٰلِكَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَفِيْهِ الْوَفَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَذٰلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَ لَا وَفَاءَ فِيْهِ - (نسائى)

মানত সাধারণত দু'প্রকারের হয়। যে মানত আল্লাহ্র আনুগত্যের কোনো কাজের হবে, তা আল্লাহ্র জন্যে বটে এবং তাই পূরণ করতে হবে। আর যে মানত আল্লাহ্র নাফরমানীমূলক কাজের মাধ্যমে হবে, তা হবে শয়তানের উদ্দেশ্যে। তা পূরণ করার কোনো দায়িত্ব নেই। কর্তব্যও নয়।

বুখারী শরীফে এমন কিছু হাদীসের উল্লেখ রয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে এই মানত মানার কাজের কিছুমাত্র উৎসাহ দেয়া হয়নি। কথায় কথায় মানত মানার যে রোগ দেখা যায় অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে এবং যে মানত মানার ইসলামী পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে লোকেরা এক্ষেত্রে নানা প্রকার শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে, রাসূলে করীম (স) একে কিছু মাত্র উৎসাহিত করেননি, এবং তিনি একে সম্পূর্ণ অর্থহীন কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ

اَوَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا و لَا يُؤَخِّرُهُ وَاِنَّمَ يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيْلِ - (بخارى)

তোমরা কি লোকদেরকে মানত মানা থেকে নিষেধ করো না ? অথচ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ মানত মানায় না কিছু আসে, না কিছু যায় (বা মানত কিছু এগিয়েও দেয় না, কিছু পিছিয়েও দেয় না)। এতে বরং শুধু এতটুকু কাজ হয় যে, এর ফলে কৃপণের কিছু ধন খরচ হয়ে যায় মাত্র।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَأْتِي ابْنَ اٰدَمَ النَّذْرَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدِّرَ لَهٗ وَلٰكِنَّهٗ يَلْقِيْهِ النَّذْرُ اِلَى الْقَدْرِ قَدْ قُدِّرَ لَهٗ فَيَسْتَخْرِجُ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ يُؤْتِيْنِيْ عَلَيْهِ مَالَمْ يَكُنْ يُؤْتِيْنِيْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ - (بخارى)

মানত মানব-সন্তানকে কোনো ফায়দাই দেয় না। দেয় শুধু তাই, যা তার তকদীরে লিখিত হয়েছে। বরং মানত মানুষকে তার তকদীরের দিকেই নিয়ে যায়। অতঃপর কৃপণ ব্যক্তির হাত থেকে আল্লাহ কিছু খরচ করান। তার ফলে সে আমাকে (আল্লাহ্‌কে) এমন কিছু দেয়, যা এর পূর্বে সে কখনো দেয়নি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের যে হাদীসটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তাতে মানত মানা থেকে রাসূল করীম (স) স্পষ্ট বাণী উচ্চারণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَنَهَا نَاعَنِ النَّذْرِ وَ يَقُوْلُ اِنَّهٗ لَا يَرَدُّ شَيْئًا وَ اِنَّمَا يَسْتَخْرِجُ بِهٖ مِنَ الشَّحِيْحِ - (مسلم)

একদিন নবী করীম (স) আমাদেরকে মানত মানা থেকে নিষেধ করছিলেন। বলছিলেন, মানত কোনো কিছুকেই ফিরাতে পারে না, তাতে শুধু কৃপণের কিছু অর্থ ব্যয় হয় মাত্র।

অপর এক হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ نَهٰى عَنِ النَّذْرِ মানত মানা থেকে রাসূলে করীম (স) নিষেধ করেছেন। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

لَا تَنْذِرُوْا فَاِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا -

তোমরা মানত মানবে না। কেননা এই মানত একবিন্দু তকদীর বদলাতে বা ফিরাতে পারে না।

এই হাদীস কয়টি থেকে বোঝা যায়, ইসলামের মানত মানার রেওয়াজ পছন্দনীয় নয়, বরং তা রাসূলের উপস্থাপিত সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরীত এক বিশেষ ধরনের বিদয়াত। আরো স্পষ্ট বলা যায়, টাকা-পয়সা বা ধন সম্পদের কিছু মানত করা সম্পূর্ণ হারাম, তা যে কোনো উদ্দেশ্যেই মানা হোক না কেন। ইমাম মুহাম্মদ ইসমাইল আল-কাহলানী আস-সানয়ানী তাই লিখেছেন ঃ

اَلْقَوْلُ بِتَحْرِيْمِ النَّذْرِ هُوَ الَّذِىْ دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيْثُ وَ يَزِيْدُهٗ تَاكِيْدًا تَعْلِيْلُهٗ بِاَنَّهٗ لَا يَاْتِىْ بِخَيْرٍ فَاِنَّهٗ يَعِيْرُ اِخْرَاجَ الْمَالِ فِيْهِ مِنْ بَابِ اِضَاعَةِ الْمَالِ وَاِضَاعَةُ الْمَالِ مُحَرَّمٌ فَيَحْرُمُ النَّذْرُ بِالْمَالِ - (سبل السلام :ج-٤، ص-١١١)

মানত মানাকে হারাম বলা কথা তো হাদীস থেকেই প্রমাণিত। এ হারাম হওয়ার কথা আরো শক্ত হয় এজন্যে যে, মানত মানা থেকে নিষেধ করতে গিয়ে তার কারণ দর্শানো হয়েছে এই যে, এতে কোনোই কল্যাণ আসে না। তাতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তা তো অযথা বিনষ্ট করা হয়। আর অর্থ বিনষ্ট করা হারাম। অতএব ধন-মাল দেয়ার মানত মানাও হারাম।

অধিকাংশ শাফিয়ী এবং মালিকী মাযহাবের লোকের বিশ্বাস, মানত মানা মাকরূহ। হাম্বলী মাযহাবেও একে মাকরূহ তাহরীম মনে করা হয়েছে। এর কারণ বলা হয়েছে এই যে, মানত কখনো আল্লাহ্র জন্যে খালেস হয় না। তাতে ‘কোনো না-কোনো বিনিময়’ লাভ লক্ষ্যভূত থাকে। অনেক সময় মানত মানা হয়; কিন্তু তা পূরণ করা কঠিন হয় বলে তা অপূরণীয়ই থেকে যায়। আল্লামা কাযী ইয়াজ বলেছেন ঃ “মানত তকদীরের ওপর জয়ী হতে চায় আর জাহিল লোকেরা মনে করে যে, মানত করলে তকদীর ফিরে যাবে।” ইমাম তিরমিযী এবং কোনো কোনো সাহাবীও মানত মানাকে মাকরূহ মনে করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেছেন ঃ

يَكْرَهُ النَّذْرُ فِىْ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ -

মানত— তা আল্লাহ্র হুকুমবরদারীরই হোক কি নাফরমানীর— উভয় ক্ষেত্রে অবশ্য মাকরূহ হবে।

আর মাকরূহ মানে এসব ক্ষেত্রে মাকরূপ তাহ্রীম। ইবনুল আরাবী লিখেছেন ঃ “মানত মানা দো'আর সাদৃশ্য, তাতে তকদীর ফিরে যায় না।” এ-ই হচ্ছে

তকদীর। অথচ দো'আ করাকে পছন্দ করা হয়েছে, কিন্তু মানত মানতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা দো'আ উপস্থিত ইবাদত। তাতে সোজাসুজি বান্দার মন-মগজ আল্লাহ্র দিকেই ঝুঁকে পড়ে। তা হয় বিনয়াবনত, কাতর, উৎসর্গিত আল্লাহ্রই সমীপে। কিন্তু মানত মানায় উপস্থিত কোনো ইবাদত দেখা যায় না; বরং তাতে সরাসরি আল্লাহ্র পরিবর্তে সেই মানতের ওপরই নির্ভরতা দেখা দেয়। আর তা-ই শির্ক পর্যন্ত পৌঁছায়।

এই প্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, বর্তমানকালে সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে এবং বিশেষভাবে এক শ্রেণীর জাহিল পীরের মুরীদের মধ্যে কথায় কথায় মানত মানার যে হিড়িক পড়ে গেছে এবং ওয়ায-নসীহতে মানত মানার যে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে, তা আর যা-ই হোক ইসলামের আদর্শ নয়, নয় রাসূলের প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত বরং তা স্পষ্টভাবে বিদয়াত। এই বিদয়াতই কোনো কোনো ক্ষেত্রে শির্ক-এ পরিণত হয়ে যায়। শির্ক হয় তখন, যখন মানত মানা হয় কোনো মরা পীরের কবরের নামে। কেননা এসব ক্ষেত্রে 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে' যতই মানত মানা হোক না কেন, আসলে তা 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে' থাকে না। তার সামনে পীর, মাদ্রাসা ইত্যাদি-ই থাকে প্রবল হয়ে এবং মনে করা হয়, এদের এমন কিছু বিশেষত্ব আছে, আছে এমন কিছু অলৌকিক ক্ষমতা, যার কারণে সে এ মানতের দরুন উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারবে; কিংবা তা বাঞ্ছিত কোনো সুবিধে লাভ করিয়ে দিতে পারবে। আর ইসলামের দৃষ্টিতে এ-ই হচ্ছে সুস্পষ্ট শির্ক। এ ধরনের মানত মানায় আল্লাহ পড়ে যান পেছনে, আর যার নামে মানত মানা হয়, সেই হয় মুখ্য। মনে ঐকান্তিক সম্পর্ক তারই সাথে স্থাপিত হয়, তাকে খুশি করাই হয় আসল লক্ষ্য। কাজেই এই জিনিস আল্লাহ্র নিষেধ এবং তা আল্লাহ বাণী ঃ (البقرة ২২) - فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا —'কাউকেই আল্লাহ্র সমতুল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী বানিও না'-এর বিপরীত হয়ে যায়।

এধরনের মানত মানা যে হারাম, তাতে কোনো মুসলমানেরই কি একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে?

পূর্বোক্ত হাদীস থেকে অবশ্য এ কথাও জানা যায় যে, মানত যদি খালেসভাবে কেবল মাত্র আল্লাহ্র জন্যেই হয়, তবে তা পূরণ করতে হবে এবং তা জায়েয। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জায়েয নিয়মে খালেসভাবে মানত মানা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে থাকে। তাই টাকা-পয়সা খরচ করার বা কোনো মাল দেয়ার মানত না মানা-ই তওহীদবাদী লোকদের জন্যে নিরাপদের পথ। যদি মানত

মানতেই হয়, তবে যেন নামায রোযা, আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ ইত্যাদি ধরনের কোনো কাজের মানত মানা হয়। কেননা তাতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই বান্দার সামনে আসে না— আসার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ধন-মালের যে মানত মানা হয় তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু বা অন্য কারো প্রতিই মন বেশি করে ঝুঁকে পড়ে, বিশেষ করে এক শ্রেণীর শোষক অর্থলোলুপ জাহিল গদীনশীন পীর যখন মানত মানার এক জাল বিস্তার করে দিয়েছে সমস্ত সমাজের ওপর, তখন মূর্খ লোকেরা ও অজ্ঞ মুরীদেরা এ জালে অতি সহজেই ধরা পড়ে যেতে পারে, নিমজ্জিত হতে পারে কঠিন শির্‌ক এর অন্ধ গহ্‌বরে। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা দরকার যে, যদি কোনো বিশেষ জায়গার বিশেষ লোকদের জন্যে টাকা পয়সা বা কোনো মাল খরচ করার মানত মানা হয়, তবে সে টাকা ইত্যাদি সেখানেই খরচ করত হবে ইসলামে এমন কোনো জরুরী শর্ত নেই। হানাফী ফিকহের কিতাবে লিখিত রয়েছে ঃ

وَلَوْقَالَ لِلّٰهِ عَلَىَّ اَنْ اَتَصَدَّقَ يَوْمَ كَذَا - وَ عَلَىَّ مَسَاكِيْنُ بَلَدٍ كَذَا فَاِنَّهٗ لَا تُقَيِّدَ بِذٰلِكَ - (تحفة الفقهاء لسمر قندى :ج - ٢، ص - ٤٦٧)

কেউ যদি বলে, অমুক দিন আল্লাহ্‌র নামে কিছু দান করা আমার ওপর ওয়াজিব কিংবা বলে অমুক স্থানের মিসকীনদের জন্যে কিছু সদকা দেয়া ওয়াজিব, অহলে দিন ও স্থানের কয়েদ পালন করা জরুরী হবে না।

অর্থাৎ, যে কোনো দিন ও যে কোনো স্থানের গরীবদের মধ্যে দান করলেই মানত পূরণ হয়ে যাবে।

কবর যিয়ারত বিদয়াত

ইসলামের কবর যিয়ারত করা জায়েয ও সুন্নাত-সমর্থিত। কিন্তু বর্তমানে কবর বিশেষ করে, পীর-অলী বলে কথিত লোকদের কবরকে কেন্দ্র করে দীর্ঘকাল ধরে যা কিছু করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ বিদয়াত, ইসলাম বিরোধী বরং সুস্পষ্ট শির্ক, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না।

কবর বিযারত সম্পর্কিত হাদীসমূহ থেকে জানা যায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কবর যিয়ারত করার অনুমতি ছিল না। পরে সে অনুমতি দেয়া হয়। এ পর্যায়ে নবী করীম (স)-এর একটি কথাই বড় দলীল। তিনি বলেছেন ঃ

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا – (مسلم)

আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন বলছি, তোমরা কবর যিয়ারত করো।

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّزُوْرَ الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ – (مسلم)

তোমাদের কেউ যদি কবর যিয়ারত করতে চায়, তবে সে তা করতে পারে। কেননা কবর যিয়ারত মানুষকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইমাম নববী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

اَجْمَعُوْا عَلَيْهِ اَنَّ زِيَارَتَهَا سُنَّةٌ لَّهُمْ –

সকলেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, কবর যিয়ারত করা মুসলমানদের জন্যে সুন্নাত সমর্থিত।

হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে এ পর্যায়ে আরো একটি বিস্তারিত কথা বলা হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ثُمَّ بَدَانِىْ اَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتَدَمِّعُ الْعَيْنَ وَ تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ فَزُوْرُوْهَا وَ لَا تَقُوْلُوْ هَجْرًا – (مسند احمد)

আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে প্রথমে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু পরে আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ কবর যিয়ারতে মন নরম হয়, চোখে পানি আসে এবং পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত করো। কিন্তু তা করতে গিয়ে তোমরা অশ্লীল, গর্হিত ও বাজে কথাবার্তা বলো না।

ইবনুল হাজার আল-আসকালানী هجرا শব্দের অর্থ লিখেছেন ঃ

فَحْشًا وَ كَذٰلِكَ اِذَا اَكْثَرَ الْكَلَامَ فِيْمَا لَا يَنْبَغِىْ - (فتح البارى باب زيارة القبور)

অশ্লীল কথা এবং অবাঞ্ছনীয় অতিরিক্ত কথাবার্তা অর্থাৎ অশ্লীল, অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছনীয় কথাবার্তা কবরস্থানে বেশি করে বলা নিষিদ্ধ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ - (مسند احمد)

রাসূলে করীম (স) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন কবর যিয়ারতকারী মেয়েলোকদের ওপর এবং তাদের ওপরও, যারা কবরের ওপর মসজিদ, গুম্বদ বা কোব্বা ইত্যাদি নির্মাণ করে।

হযরত আয়েশা (রা) তাঁর মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেছিলেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ - (بخارى)

আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেছেন ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের ওপর এ জন্যে যে, তারা তাদের নবী-রাসূলের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

আর গুম্বদ বা কোব্বা ইত্যাদি নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ مجمع البحار গ্রন্থে লিখিত হয়েছে ঃ

نَهٰى عَنِ الْاِسْرَاجِ لِاَنَّهٗ تَضْيِيْعُ مَالًا بِلَا نَفْعٍ اَوْ اِحْتِرَازٌ عَنْ تَعْظِيْمِ الْقُبُوْرِ لِاتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ -

গুম্বদ বা কোব্বা ইত্যাদি নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এ কারণে যে, তাতে ধন-মালের অপচয় হয়, তাতে কারো কোনো উপকার সাধিত হয় না। আর

কবরস্থানে মসজিদ বানান হলে কবরের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তা থেকে বিরত রাখাই এ নিষেধের উদ্দেশ্য।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ زُوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ الْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهِ السِّرَاجَ -

কবর যিয়ারতকারী মেয়েলোক এবং তার ওপর যারা বাতি জ্বালায় তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ করেছেন। আর একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّجَصَّصَ الْقَبْرُ وَ اَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ وَ اَنْ يُّقْعُدَ عَلَيْهِ وَ اَنْ يُّكْتُبَ عَلَيْهِ - (مسلم عن جابر)

কবরকে পাকা-পোখত ও শক্ত করে বানাতে, তার ওপর কোনোরূপ নির্মাণ কাজ করতে, তার ওপর বসতে এবং তার ওপর কোনো কিছু লিখতে নবী করীম (স) সুস্পষ্ট নিষেধ করেছেন।

নবী করীমের ফরমান অনুযায়ী বলা যায় যে, কবরকে কেন্দ্র করে এ সব কাজ করা মহা অন্যায়, অবাঞ্ছনীয়। আর যারা এ কাজ করে তারা নিকৃষ্টতম লোক। নবী করীম (স) নিজে নিজের সম্পর্কে দো'আ করেছেন। এই বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَ ثَنًا يُعْبَدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِ هِمْ مَسَاجِدَ -

(عن عطاء ابن يسارمالك مرسلا البزارعن زيد عن عطاء عن ابى سعيد الخدرى مرفوع)

হে আল্লাহ" তুমি আমার কবরকে কোনো পূজ্যমূর্তি বানিয়ে দিও না। বস্তুত যে জাতি তাদের নবী রাসূলদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে, তাদের ওপর আল্লাহ্‌র গজব তীব্র হয়ে উঠেছে।

এ হাদীসের তাৎপর্য সুস্পষ্ট। কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সিজদা করা, কবরকে কিবলার দিকে রেখে নামায পড়া শরীয়তে সুস্পষ্ট হারাম। হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) মুসলমানদের লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَاوَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِ هِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلَا فَلَا تَتَّخِذُ والْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَاِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ - (مسلم)

সাবধান হও, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নবী-রাসূল ও নেক লোকদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল। তোমরা কিন্তু সাবধান হবে, তোমরা কখনো কবরকে মসজিদ বানাবে না। আমি এ থেকে তোমাদের স্পষ্ট নিষেধ করছি।

কবরকে কেন্দ্র করে যে ওরস ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় তা ইসলামে নিষিদ্ধ। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَ لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغَنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ -

(نسائی ابوداؤد)

রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না (অন্তত নফল নামায নিজেদের ঘরেই পড়বে)। আমার কবর-কেন্দ্রে মেলা বসাবে না, তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠাবে। যেখানে থেকেই তোমরা দরূদ পাঠাও না কেন, তা অবশ্যই আমার নিকট পৌছবে।

এ কারণেই কবরকে কোনো স্পষ্ট ও উন্নত স্থানরূপে নির্মিত করতেও নিষেধ করা হয়েছে। নবী করীম (স) হযরত আলী (রা)-কে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ঃ

اَنْ لَّا تَدَعَ تِمْثَا لًا اِلَّا لَمَسْتَهٗ وَ لَا قَبْرًا مُشْرِّفًا اِلَّا سَوَّيْتَهٗ -

সব মূর্তি চুরমার করে দেবে এবং সব উচ্চ ও উন্নত কবর ভেঙ্গে মাটির সাথে সমান ও একাকার করে দেবে। এ থেকে যেন কোনো প্রতিকৃতি ও কোনো কবর রক্ষা না পায়।[১]

এসব কয়টি হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে কবর যিয়ারত করা সাধারণ মুসলমানদের জন্যেই নিষিদ্ধ ছিল। নিষেধের কারণ এখানে স্পষ্ট বলা হয়নি। তবে অন্যান্য কারণের মধ্যে এ-ও একটি বড় কারণ অবশ্যই ছিল যে, কবর পূজা জাহিলিয়াতের জমানায় একটি মুশরিকী কাজ হিসেবে আরব সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। মুসলমান হওয়ার পরও কবর

১. হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত। এর বর্ণনাকারী আবুল হাইয়্যাজ আল-আমাদী। হযরত আলী (রা) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন আমিও কি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে পাঠাব না ? খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবেই হযরত আলী (রা) তাঁকে এই দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন।

যিয়ারতের অবাধ সুযোগ থাকলে তওহীদবাদী এ মানুষের পক্ষে কবর পূজার শির্ক-এ নিমজ্জিত হয়ে পড়ার বড় বেশি আশংকা ছিল। কিন্তু পরে যখন ইসলামী আকীদার ব্যাপক প্রচার ও বিপুল সংখ্যক লোকের মন-মগজে তা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, পূর্ণ বাস্তবায়িত হয় ইসলামী জীবনাদর্শ, তখন কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু সে অনুমতি কেবল পুরুষদের জন্যে, মেয়েদের তা থেকে বাদ দিয়ে রাখা হয়। শুধু তা-ই নয়, কবর যিয়ারত করতে মেয়েদের যাওয়ার ব্যাপারটিকে ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অভিশাপের কাজ বলে ঘোষণা করা হয়। এ পর্যায়ে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী লিখেছেন ঃ

اَقُوْلُ كَانَ نَهى عَنْهَا لِاَنَّهَا تَفْتَحُ بَابَ الْعِبَادَةِ لَهَا فَلَمَّا اسْتَقَرَّتِ الْاُصُوْلُ الْاِسْلَامِيَّةُ وَاطْمَاَنَّتْ نُفُوْسُهُمْ عَلٰى تَحْرِيْمِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللّٰهِ اُذِنَ فِيْهَا -

(حجة الله البالغة :ج -١، باب زيارة القبور)

আমি বলছি, শুরুতে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। কেননা তা কবর পূজার দ্বার খুলে দিত। কিন্তু পরে যখন ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলো এবং আল্লাহ্‌র ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত হারাম হওয়ার ব্যাপারে তাদের মন-মগজ স্থির বিশ্বাসী হলো, তখন কবর যিয়ারত করা অনুমতি দেয়া হয়।

অবশ্য মেয়েলোকদের পক্ষে কবর যিয়ারত করতে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো কোনো ফিকহ্‌বিদ সামান্য ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁরা এক দিকে নিষেধ ও অপরদিকে অনুমতি—এ দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ

وَالتَّبَرُّكُ بِزِيَارَةِ الْقُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ فَلَا بَاْسَ اِذَا كُنَّ عَجَائِزَ وَ يُكْرَهُ اِذَا كُنَّ شَوَابَّ -

(درمختار على درمختار :ج-١ ، ص -٨٤٣)

নেককার লোকদের কবর যিয়ারত করে বরকত লাভ করা বৃদ্ধা মেয়েলোকদের পক্ষে জায়েয, তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যুবতী মেয়েলোকদের পক্ষে মাকরূহ তাহরীম।

কবর যিয়ারত করতে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার কারণ হাদীসে বলা হয়েছে এই যে, তাতে মানুষের মন নরম হয়, চোখে পানি আসে এবং পরকালের কথা মনে আসে। মনে আসে, কবরস্থ সব লোকই একদিন তাদেরই মতো জীবিত ছিল। কিন্তু আজ দুনিয়ার বুকে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। এমনিভাবে তাদেরও সব মানুষেরই এরূপ পরিণতি দেখা দেবে। এ থেকে করোরই রেহাই

নেই। এতে করে যিয়ারতকারীর মনে পরকালের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের এক প্রয়োজনীয় ভাবধারা জাগে। আর ইসলামের তা বিশেষভাবে কাম্য।

কিন্তু কবর নির্মাণ সম্পর্কে এ হাদীসসমূহে দু'টো কড়া নিষেধ উদ্ধৃত হয়েছে। একটি এই যে, কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ করা চলবে না। কেননা তা করা হলে মানুষ মসজিদের মতো কবরের প্রতিও ভক্তিভাজন হয়ে পড়তে পারে, কবরের প্রতি দেখাতে পারে আন্তরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা। আর এ জিনিসই হলো শির্ক-এর উৎস। কবরগাহে মসজিদ বানানর প্রচলন মুসলিম সমাজে দীর্ঘদিন থেকে চালু হয়ে আছে। অলী-আল্লাহ বলে কথিত কোনো লোকের কবর এখন কোথাও পাওয়া যাবে না, যার নিকট মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। আর এসব কবরস্থানই শির্ক ও বিদয়াতের লীলাকেন্দ্র হয়ে রয়েছে। বহু শত রকমের বিদয়াত মুসলিম সমাজে এখান থেকেই বিস্তার লাভ করছে। বস্তুত এসব হচ্ছে ইসলামের তওহীদী আকীদায় শির্ক-এর বিদয়াতের অনুপ্রবেশ।

হাদীস অনুযায়ী কবরের ওপর কোনো কিছু নির্মাণ করাই সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম শাওকানী পূর্বোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ - (نيل الاوطار : ج- ٤، ص -١٣٣)

এ হাদীসে এ কথার দলীল পাওয়া গেল যে, কবরের ওপর কোনো কিছু নির্মাণ করাই হারাম।

শুধু তা-ই নয়, কবরের ওপর কিছু লেখাও হারাম। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীসে অন্যান্য কথার সাথে এ বাক্যাংশটুকুও উল্লেখ রয়েছে। পূর্বে একবার এ হাদীসটির উল্লেখ হয়েছে ঃ وان يكتب عليه— কবরের ওপর কিছু লেখাও নিষেধ।

অর্থাৎ কবরে মৃত ব্যক্তির নাম, জন্ম ও মৃত্যুর সন-তারিখ কিংবা কোনো মর্সিয়া বা শোক-গাঁথা লেখা নিষিদ্ধ। শরীয়তে নাম লেখা আর অন্য কিছুই লেখা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনোই পার্থক্য করা হয়নি।

মওলানা ইদরীস কান্দেলভী এ সম্পর্কে হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনে ঃ

يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ بِالْحِجَارَةِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا وَالْآخَرُ أَنْ يَضْرِبَ عَلَيْهِ خِبَاءٌ أَوْ نَحْوُهُ وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَوَّلِ لِانْعِدَامِ الْفَائِدَةِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ مِنْ صَنِيعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ -

(التعليق الصبيح ج-٢، ص-٢٥١)

এ কথার দু'টো অর্থ হতে পারে ঃ একটি হচ্ছে কবরের ওপর ইট-পাথর দিয়ে কোনো নির্মাণ কাজ করা কিংবা এই পর্যায়ের অন্য কোনো কাজ আর দ্বিতীয় হচ্ছে, কবরের ওপর কোনো চাঁদর, তাবু ইত্যাদি টানিয়ে দেয়া। আর এ দু'ধরনের কাজই নিষিদ্ধ। প্রথমটি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ আগেই বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি এ জন্যে যে, তা-ও প্রথমটির মতোই নিষ্ফল, অর্থহীন কাজ। এতে অর্থের অপচয় হয় এবং তা হচ্ছে জাহিলিয়াতের লোকদের কাজ।

জনসাধারণ শরীয়তের মূল বিধানের সাথে পরিচিত নয় বলে তারা সব অলী-আল্লাহ বলে পরিচিত লোকদের কবরের কোব্বা নির্মিত এবং তার প্রত্যেকটির ওপর নাম ও অন্যান্য জিনিস লিখিত দেখে মনে করে যে, এ বুঝি শরীয়ত সম্মত কাজ, অন্তত এতে শরীয়তে কোনো দোষ নেই। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা সবই ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদীসে এ পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক কথা রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত এবং কিতাবসমূহে উদ্ধৃতি হয়েছে। এসব হাদীস সম্পর্কে ইমাম হাকিম লিখেছেন ঃ

وَهٰذِهِ الْاَسَانِيْدُ صَحِيْحَةٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا، فَاِنَّ اَئِمَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ مَكْتُوْبٌ عَلٰى قُبُوْرِهِمْ وَهُوَ عَمَلٌ اَخَذَ بِهِ الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ -

(مستدرك حاكم : ج-١، ص - ٣٧)

কবরের ওপর কোনো কিছু লিখতে নিষেধ করা হয়েছে যে সব হাদীসে, তার সব কয়টিরই সনদ বিলকুল সহীহ্। কিন্তু তদানুযায়ী আমল করা হচ্ছে না। কেননা সর্বত্র মুসলিম ইমামদের কবরের ওপর কিছু না কিছু লিখিত দেখা যায়। পরবর্তীকালে লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের কাছ থেকে এসব শিখেছে (ও জায়েয বলে মনে করেছে)।

আসলে এ আমল না নবী করীম (স) থেকে প্রমাণিত, না সাহাবীদের থেকে। পরবর্তীকালের লোকেরাই উদ্যোক্তা। কিন্তু তারা ছিল এমন লোক যাদের কথা বা কাজ শরীয়তে দলীলরূপে গৃহীত নয়। এ পর্যায়ে ইমাম যাহবী লিখেছেন ঃ

قُلْتُ مَا قُلْتُ طَائِلًا وَ لَا نَعْلَمُ صَحَابِيًّا فَعَلَ ذٰلِكَ وَاِنَّمَا شَيْءٌ اَحْدَثَهُ بَعْضُ التَّابِعِيْنَ فَمَنْ بَعْدَ هُمْ وَلَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّهْيُ - (تلخيص مستدرك: ج -١، ص -٣٧)

ইমাম হাকিমের পূর্বোক্ত কথা কোনো কাজের কথা নয়। আসলে কোনো সাহাবীই এই নিষিদ্ধ কাজটি করেননি। এ হচ্ছে উত্তরকালের উদ্ভাবিত একটি কাজ— বিদয়াত। কোনো কোনো তাবেয়ী এবং তাদের পরবর্তীকালের

লোকেরা-ই উদ্ভাবন করেছেন। নবী করীম (স)-এর এই নিষেধ তাদের নিকট পৌঁছায়নি।

আর পাক ভারতে প্রখ্যাত মনীষী কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি লিখেছেন ঃ

مسئلہ قبوراولیا بلند کردن وگنبد بر آں ساختن عرس وامثال آں وچرا غاں کردن ہمہ بدعت است بعضے ازآں حرام وامرے مکروہ پیغمبر خدا صلعم بر شمع افروز اں نزد قبرو سجدہ کنندہ گاں رالعنت گفت وفرمو دہ کہ قبر مراعید ومسجد سجدہ نکنید ودرون مسجد سجدہ نکنید وروزعید بر ائے مجمع روزے درسال مقررہ کر دہ شدہ ورسول کریم علی رض رافرستادکہ قبر مشر فہ رابر ابرکند وہرجاکہ تصویر بیند محو کند - (ارشاد الطالبین للشیخ شرف الدین یحیی منیری رح ص - ۲۰)

আউলিয়াগণের কবর প্রসঙ্গে তাদের কবরকে উন্নত করা, তার ওপর গম্বুজ নির্মাণ, ওরস অনুষ্ঠান করা, চেরাগ বাতি জ্বালান সম্পূর্ণ বিদয়াত। এর মাঝে কতোগুলো হারাম মাকরূহ (তাহরীম) ঃ নবী করীম (স) যারা কবরে বাতি জ্বালায় ও সিজদা করে তাদের ওপর লা'নত করেছেন। বলেছেন ঃ না আমার কবরের ওপর উৎসব পালন করবে, না তাকে সেজিদার স্থান বানাবে বানাবে, না এরূপ কোনো মসজিদে নামায পড়বে। না কোনো নির্দিষ্ট তারিখে সেখানে একত্রিত হবে। নবী করীম (স) হযরত আলী (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন এ নির্দেশ দিয়ে যে, উঁচু কবর ভেঙ্গে সমান করে দেবে এবং প্রতিকৃতি যেখানেই পাবে, মুছে ফেলবে।

সহীহ্ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে, নেক্কার অলী লোকদের কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ করা সাধারণ ও মূর্খ লোকদের একটি চিরন্তন স্বভাব। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (স) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেই সময় তাঁর স্ত্রী মারিয়া আবিসিনিয়ায় তার দেখা গির্জার কথা রাসূল (স) এর নিকট উল্লেখ করেন। সে সময় উম্মে সালমা ও উম্মে হাবিবা (রা)-ও উল্লেখ করেন তাঁদের দেখা সে গির্জাসমূহের সৌন্দর্য ও তার মধ্যে রক্ষিত সব ছবি ও প্রতিকৃতির কথা। এসব কথা শুনে নবী করীম (স) মাথা ওপরে তুললেন এবং বললেন ঃ

أُولٰئِكَ اِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوْهُ فِيْهِ تِلْكَ الصُّوْرَةَ اُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ - (بخاری باب بناء المسجد علی القبر)

এসব ছবি ও প্রতিকৃতির ইতিহাস হলো এই যে, তাদের মধ্য থেকে কোনো নেককার (আমাদের ভাষায় কোনো পীর বা অলী-আল্লাহ্ বলে কথিত) ব্যক্তি

যখন মরে গেছেন, তখন তার কবরের ওপর তারা মসজিদ নির্মাণ করেছে। অতঃপর তার মধ্যে এ সব ছবি ও প্রতিকৃতি সংস্থাপিত করেছে। আসলে এরা হলো আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম লোক।

এ হাদীসও প্রমাণ করে যে, কারো কবরকে কেন্দ্র করে মসজিদ নির্মাণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা খুবই আশংকা রয়েছে যে, সাধারণ লোকেরা কবরের সাথে সেরূপ ব্যবহারই করবে, যা করছে এসব অভিশপ্ত লোকেরা।

বস্তুত বর্তমানকালেও কোনো নামকরা বা খ্যাতনামা 'অলী' (?) আলিম বা পীরের মাযার এমন খুবই কম-ই দেখা যাবে, যার ওপর কোনো গুম্বদ বা কোব্বা নির্মিত হয়নি। নাম ও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ এবং তৎসহ মর্সিয়া গাঁথা লেখা হয়নি। এ সব কাজ যেমন হাদীসের স্পষ্ট বরখেলাফ, তেমনি তওহীদী আকীদারও সম্পূর্ণ পরিপন্থী। রাসূলে করীম (স) ইসলামের মৌল ভাবধারা তওহিদী-আকীদার সুষ্ঠু হিফাজতের জন্যেই এ সব কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু রাসূলের এ সুস্পষ্ট নিষেধ নির্ভয়ে অমান্য করে পীর অলী-আল্লাহ্ বলে কথিত লোকদের, রাজনৈতিক নেতাদের ও প্রখ্যাত ব্যক্তিদের কবরের ওপর বানান হয়েছে ও হচ্ছে গুম্বদ, কোব্বা, স্মৃতি, মীনার প্রভৃতি আর তার ওপর লেখা হচ্ছে তাদের নাম, জন্ম-মৃত্যুর তারিখ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি বা মর্সিয়া গাঁথা। কিন্তু এগুলো যে বিদয়াত এবং ইসলামের সম্পূর্ণ খেলাফ কাজ; তাতে কোনো ঈমানদার মানুষেরই একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না।

ওপরের দলীলভিত্তিক আলোচনা থেকে অকাট্যভাবে প্রামণিত হলো যে, কবর উঁচু করা, তার ওপর কোব্বা নির্মাণ করা, মসজিদ বা নামায পড়ার স্থান নির্ধারণ, তাকে সর্বসাধারণের যিয়ারতগাহে পরিণত করা— কবরের পার্শ্বে লোকদের দাঁড়াবার জন্য ব্যালকনী বানান— এই সবই অত্যন্ত ও সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ কাজ। এই ব্যাপারে রাসূলে করীম (স) কখনও অভিশাপ বর্ষণ করেছেন সেই লোকদের ওপর যারা এসব করে আবার কখনও তিনি বলেছেন ঃ

اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَا ئِهِمْ مَسَاجِدَ -

সেই লোকদের ওপর আল্লাহ্‌র গজব অত্যন্ত তীব্র ও প্রচণ্ড হয়ে এসেছে যারা তাদের নবী-রাসূলগণের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে।

তাই কখনও তিনি নিজেই ঐ কাজ যারা করে তাদের ওপর আল্লাহ্‌র গজব কঠিন ও তীব্র হয়ে বর্ষিত হওয়ার জন্য দো'আ করেছেন। সহীহ হাদীসেই তার উল্লেখ রয়েছে।

আবার কখনও তিনি সেই ধরনের সব কবর কোব্বা ইত্যাদি ধ্বংস করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে লোক পাঠিয়েছেন। কখনও তিনি এই কাজকে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। কখনও বলেছেন ঃ তোমরা আমার কবরকে মূর্তি বানিয়ে অনুরূপ আচরণ করো না। আবার কখনও বলেছেন ঃ

لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا -

তোমরা আমার কবর ঈদের ন্যায় উৎসবের কেন্দ্র বানিও না।

অর্থাৎ এমন একটা মওসুম বা সময় নির্দিষ্ট করে সেই সময় আমার কবরস্থানে লোকজন একত্রিত করে উৎসব করো না। যেমন করে কবর পূজারীরা করে থাকে। তথায় তারা নানা অনুষ্ঠান পালন করে। কবরে অবস্থান গ্রহণ করে। ওরা আসলেও কার্যত আল্লাহ্‌র ইবাদত সম্পূর্ণ পরিহার করে কবর বা কবরস্থ ব্যক্তির ইবাদতে মেতে যায়। নবী করীম (স) এই সবকে তীব্র ভাষায় ও অত্যন্ত কঠোরতা সহকারে প্রতিরোধ করেছেন। আর আজ তাঁরই উম্মাহ্ হওয়ার দাবিদার অলী-আল্লাহ্, পীর, শায়খ ইত্যাদির ছদ্মাবরণ ধরে মানুষকে কবর পূজারী বানাচ্ছে। কোথাও কোথাও আল্লাহ্‌কে হটিয়ে দিয়ে নিজেরাই মানুষের মা'বুদ হয়ে বসেছে। সেখানে তাদের প্রতি মুরীদরা— ভক্তরা— সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি ও আচার-আচরণ করে, যা একান্তভাবে আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

এ শুধু বিদয়াত নয়, এ হচ্ছে প্রচণ্ড শির্‌ক। তওহীদী ইসলামের দোহাই দিয়ে শির্‌ক এর পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে এমন দরগাহ্ মুসলিম দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই বিরাজ করছে।

কবর যিয়ারতের নিয়ম

ইমাম নববী লিখেছেন ঃ 'যিয়ারতকারীর কর্তব্য কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সালাম করবে এবং বকরস্থ সকলের রূহের প্রতি মাগফিরাত রহমত নাযিল হওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করবে।' এই সালাম ও দো'আ তাই হওয়া উচিত, যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া কুরআনের আয়াত— সূরা বা রাসূল (স) থেকে বর্ণিত দো'আও পাঠ করা যেতে পারে।

ইমাম শাফিয়ী এবং তাঁর সব সঙ্গী-সাথী মনীষীবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে এ নিয়মেরই উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে মরযুক জাফরানী একজন মুহাক্কিক ফকীহ ছিলেন। তিনি তাঁর جنائز। কিতাবে লিখেছেন ঃ

وَ لَا يَسْتَلِمُ الْقَبْرَ بِيَدِهٖ وَ لَا يُقَبِّلُهُ قَالَ وَعَلٰى هٰذَا مَضَتِ السُّنَّةُ -

কবরকে হাত দ্বারা জড়িয়ে ধরবে না, স্পর্শ করবে না, কবরকে চুমু দেবে না, কবর যিয়ারতের সুন্নাতী নিয়ম এই।

আবুল হাসান আরো বলেছেন ঃ

وَاسْتِلَامُ الْقُبُوْرِ وَ تَقَبُّلُهَا الَّذِىْ يَفْعَلُهُ الْعَوَامُّ الْاٰنَ مِنَ الْمُبْتَدَعَاتِ الْمُنْكَرَةِ شَرْعًا يَنْبَغِىْ تَجَنُّبُ فِعْلِهٖ وَ يَنْهٰى فَاعِلَهٗ -

কবর ধরা, স্পর্শ করা এবং তাকে চুমু দেয়া— যা বর্তমান কালের সাধারণ মানুষ করছে— নিঃসন্দেহে বিদয়াত, শরীয়তে নিষিদ্ধ, ঘৃণিত। তা পরিহার করা এবং যে তা করে তাকে এ থেকে বিরত রাখা একান্তই কর্তব্য।

আবু মুসা এবং খোরাসানের সুবিজ্ঞ ফিকহ্‌বিদরা বলেছেন যে, কবর স্পর্শ করা, চুমু দেয়া খ্রিস্টানদের অভ্যাস। মুসলমানদেরদের জন্যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা ঃ

قَدْ صَحَّ النَّهْىُ عَنْ تَعْظِيْمِ الْقُبُوْرِ -

নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কবরের প্রতি কোনোরূপ তা'জীম দেখানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

হাফিজ ইবনে কাইয়্যেম লিখেছেন, নবী করীম (স) কবর যিয়ারত করতেন, করতেন কবরস্থ লোকদের জন্যে দো'আ করার উদ্দেশ্যে, তাদের প্রতি দয়া দেখাবার জন্যে ও তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট ইস্তিগফার করার উদ্দেশ্যে। অতঃপর লিখেছেন ঃ

وَهٰذِهِ الزِّيَارَةُ الَّتِىْ سَنَّهَا لِاُمَّتِهٖ وَشَرَعَهَا لَهُمْ اَمْرَهُمْ -

এরূপ যিয়ারত করাকেই রাসূলে করীম (স) তাঁর উম্মতের জন্যে সুন্নাত করে পেশ করেছেন এবং এ-ই তাদের জন্যে শরীয়তী পন্থা ও নিয়ম করে দিয়েছেন।

কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে মুসলমানরা কি বলবে এবং কি করবে, শরীয়তে তারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম লিখেছেন ঃ

اَنْ يَّقُوْلُوْا اِذَا اَزَارُوْهَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَا حِقُوْنَ، نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ -

মুসলমান যখন কবর যিয়ারত করবে, তখন বলবে ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম, হে কবরস্থানবাসী মুমিন-মুসলমানগণ, আমরাও আল্লাহ্ চাইলে তোমাদের সাথে মিলিত হবো। এখন তোমাদের জন্যে ও আমাদের নিজেদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণ ও শান্তি প্রার্থনা করছি।

অতঃপর তিনি লিখেছেন ঃ মুশরিকরা কিন্তু এরূপ করতে অস্বীকার করেছে। তারা কবরস্থানে শিরক করে, আল্লাহ্‌র সামনে মৃত লোকদের নাম নিয়েই দোহাই দেয়, তাদের অসীলা বানায় ও তাদের নামে 'কসম' করে। মৃত লোকদের নিকট নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে দো'আ করে, সাহায্য প্রার্থনা করে, তার দিকে তাওয়াজ্জুহ করে। আর এসব করে তারা রাসূলের হেদায়েতের বিরুদ্ধতা করে। কেননা রাসূলের হেদায়েত তো হলো তওহীদ এবং মৃত লোকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন। আর মুশরিকদের পন্থা হলো শির্ক এবং নিজেদের ও মৃত লোকদের প্রতি যাবতীয় অন্যায় চালিয়ে দেয়া। (فتح الربانی، شرح مسند احمد)

আজমীর শরীফে খাজা মঈনউদ্দীন চিশতীর কবরে তাঁকে লক্ষ্য করে যে দো'আ করা হয়, তাতে খাজা বাবাকে ঠিক আল্লাহ্‌র আসনেই বসান হয় নাউজুবিল্লাহ।

তাতে বলা হয় ঃ

আল্লাহ্‌কে মাহবুব কি তুরবত কা তামাচ্ছুক শায়মা সোওদা কী আজমাত কা তামাচ্ছুক, আপনে দরওয়াজা সে নেয়ামত বখশে দিজিয়ে। 'এই বিশ্ব সংসারের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র তুমি প্রিয় সন্তান। আল্লাহ্ তোমার কথা শোনেন। তাই আজ এই সন্ধা বেলায় তোমায় দু'টি অবোধ সন্তান তোমার দরবারে হাযির হয়েছে। বাবা তুমি এদের বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, অর্থ-যশ-খ্যাতি প্রতিপত্তি দাও।

তোমার অপর করুণাধারার মতো এদের জীবনে যেন প্রেম প্রীতি অনন্তকালের জন্য অটুট থাকে। বাবা আমার। খাজা সাহেব আমার অন্ধের যষ্টির মতো তুমিই এদের একমাত্র ভরসা, তুমিই এদের অন্ধকারের আলো, সব বিপদের একমাত্র সহায়।

তুমি দুনিয়ার বাদশাহ্, গরীবের একমাত্র পালনকর্তা, তোমার নামে ডুবে যাওয়া মানুষ ভেসে উঠে, অন্ধকার দুঃখের মহাসাগর হাসতে হাসতে পার হয়।

বলা হয় ঃ কোনো ভয় নেই, কোনো চিন্তা নেই, বাবা আপনাদের খুশী করাবেনই। বাবা বড় স্নেহপরায়ণ। যে ছেলে মেয়েরা এখানে ছুটে আসে বাবা তাদের কোনো দুঃখ দেখে সহ্য করতে পারে না।

কাল আবার আসবেন। বাবা খুশী হবেন।

إِنَّ مَنْ عَظَّمَ مَخْلُوقًا فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا بِحَيْثُ أَخْرَجَهُ عَنْ مَنْزِلَةِ الْعُبُودِيَّةِ الْمُحْضَةِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللّٰهِ وَعَبَدَ مَعَ اللّٰهِ غَيْرَهُ وَذَالِكَ مُخَالِفٌ لِجَمِيعِ دَعْوَةِ الرُّسُلِ - (زادالمعاد ج -٣، ص - ٦٤٢)

মৃত ব্যক্তি দাফন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতের মাগফিরাত চেয়ে দো'আ করা রাসূলে করীমের আমল থেকে জায়েয বলে প্রমাণিত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرِغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا التَّثَبُّتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ - (ابوداؤد)

নবী করীম (স) যখন মৃত ব্যক্তির দাফনের কাজ সম্পাদন করতেন তখন সেখানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং লোকদের বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের এ ভাইয়ের জন্যে মাগফিরাতের দো'আ করো। কবরে সে যেন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও স্থির হয়ে থাকতে পারে, সে জন্যে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করো। কেননা এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, এ হলো দাফন-কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরে দো'আ করা। এ তো সম্পূর্ণ জায়েয। কিন্তু বর্তমানে সাধারণ প্রচলনে দেখা যায়, এ দিকে জানাযার নামায পড়া হলো, আর অমনি কিছু একটা পড়ে দো'আ করার জন্যে হাত তোলা হলো। আজকাল মুসলিম সমাজে এ যেন এক সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ ইসলামী শরীয়তে এ কাজ মাকরূহ! তৃতীয় শতকের ফকীহ্ ইমাম আবু বকর ইবনে হামিদ (রহ) বলেন ঃ

إِنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ مَكْرُوهٌ - (فوائد بهية :ج -١،ص -١٥٢)

জানাযা নামাযের পরই আলাদা করে দো'আ করা মাকরূহ (তাহরীম)

শামসুল আয়েম্মা হাওয়ানী ও শায়খুল ইসলাম আল্লামা মগ্দী বলেন ঃ

لَا يَقُومُ الرَّجُلُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ - (قنيه :ج -١، ص- ٥٦)

জানাযা নামাযের পরে দো'আর জন্যে কেউই দাঁড়াবে না।

এমনিভাবে ফতোয়ার সিরাজিয়া (১ম খণ্ড, ১৪ পৃ.) জামেউর রমুজ (১ম খণ্ড, ১৭৪ পৃ.), বহরুর রায়েক (২য় খণ্ড, ১৮৩ পৃ.) প্রভৃতি গ্রন্থ এই কথা লিখিত রয়েছে। মুল্লা আলী আল-কারী বলেন ঃ

وَ لَا يَدْعُوْ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهٗ يَشْبَهُ الزِّيَادَةَ فِىْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ -

(مرقاة: ج-٢، ص- ٣١٩)

জানাযা নামায পড়া হয়ে যাওয়ার পরই মৃতের জন্যে দো'আ করবে না। কেননা এতে মূল জানাযা নামাযের ওপর অতিরিক্ত কিছু করার মতো হয়।

তাহলে প্রমাণিত হলো যে, যিয়ারতের জন্যে গিয়ে কবরস্থ লোকদের কল্যাণের জন্যে দো'আ করা ছাড়া মুমিন-মুসলমান যিয়ারতকারীর আর কিছু করার নেই, নেই অন্য কোনো কাজ করার মতো, নেই কোনো কথা বলবার মতো। এ দৃষ্টিতে স্পষ্ট বোঝা যায়, কবরস্থানে গিয়ে মুসলমানরা বর্তমানে যা কিছু করছে, তা শুধু বিদয়াতই নয়, শির্কও। অনুরূপভাবে "আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব শক্তির উৎস" এই ইয়াকীন ও বিশ্বাস অন্তরে বজায় রেখে কোনো মাখলুকের নিকট জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুর পর—কোনো কিছুরই অলৌকিক ধরনের কাজের সাহায্য চাওয়াও আহলে সুন্নাত আল-জামায়াতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ শির্ক এবং মুসলিম সমাজে তার প্রচলন তওহিদী আকীদার বিরুদ্ধে শির্ক-এর বিদয়াত।

কুরআন তিলাওয়াত তো কুরআন হাদীস উভয়ের ভিত্তিতেই অত্যন্ত সওয়াবের কাজ বলে প্রমাণিত। কবরের নিকট বসে কুরআন তিলায়াতেও বাহ্যত কোনো দোষ দেখা যায় না। কিন্তু এ পর্যায়ে ফিকাহ্র কিতাবে বলা হয়েছে ঃ

اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِىْ حُكْمِ قِرَاۃِ الْقُرْاٰنِ عِنْدَ الْقَبْرِ - فَذَهَبَ اِلٰى اسْتِحْبَابِهَا الشَّافِعِىُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لِلتَّحْصِيْلِ لِلْمَيِّتِ بَرَكَةُ الْمُجَاوَرَةِ وَوَافَقَهُمَا عِيَاضٌ وَالْقِرَّانِىُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَرَاٰى اَحْمَدُ اَنَّهٗ لَا بَاْسَ بِهَا وَكَرِهَهُمَا مَالِكٌ وَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ لِاَنَّهُمَا لَمْ تَرِدْبِهَا السُّنَّةُ -

কবরের নিকট কুরআন পাঠ করার ব্যাপারে ফিকহ্বিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ ইবনে হাসান বলেছেন, তা পড়া মুস্তাহাব। এতে মৃত ব্যক্তি কুরআনের সোহবতের বরকত পেতে পারে। কাযী ইয়াজ এবং মালিকী মাযহাবের ক্বিরানী উভয়ই এঁদের সাথে একমত। ইমাম আহমদ বলেছেন ঃ এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানীফা (রা) এ কাজকে মাকরূহ মনে করেছেন। কেননা এ কাজের সমর্থনে সুন্নাতের কোনো দলীল পাওয়া যায়নি।

মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া বিদয়াত

যারা মরে গেছে— তাঁরা অলী-ই হউন, আর নবী-ই হউন তাদের নিকট জীবিত লোকদের কোনোরূপ সাহায্য প্রার্থনা করা— বিদয়াতীদের ভাষায় যাকে বলা হয় ইস্তেমদাদে রূহানী— সুস্পষ্ট বিদয়াত।

প্রকৃতপক্ষে সাহায্য বা ক্ষতি কোনো কিছু করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর করোরই নেই। এ জন্যে কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা কেবল তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়ার কথাই শিক্ষা দিয়েছেন নানাভাবে। সূরায়ে ফাতিহা যা মূলত একটি দো'আরই সূরা, তাতে বন্দেগী যেমন কেবলমাত্র এক আল্লাহ্রই করার কথা বলা হয়েছে, তেমনি সাহায্যও একমাত্র আল্লাহ্রই কাছে চাইতে শেখান হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -

হে আল্লাহ, আমরা কেবল তোমারই বন্দেগী করি, কেবল তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

এ আয়াত যেমন বন্দেগী, দাসত্ব ও আইন পালনকে কেবলমাত্র আল্লাহ্র সাথে খাস করে দেয়ার নির্দেশ দেয়, তেমনি যাবতীয় বিষয়ে ও ব্যাপারে সবরকমের সাহায্য-প্রার্থনাও কেবল আল্লাহ্র নিকটই করা যেতে পারে কিংবা করা উচিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উপরন্তু ইমাম রাযীর ভাষায় ঃ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ শব্দের মানে হচ্ছে لَاأَسْتَعِينُ بِغَيْرِكَ —হে আল্লাহ, তোমাকে ছাড়া আর কারো নিকটই আমি কোনো প্রকারের সাহায্যে চাই না। কেননা তুমি ছাড়া যার কাছেই সাহায্য চাইব, তার পক্ষে আমার কোনোরূপ সাহায্য করা আদৌ সম্ভব নয়— তোমার সাহায্য ছাড়া। তাহলে তোমার সাহায্য ছাড়া অপর কারো পক্ষেই আমার কোনোরূপ সাহায্য করা যখন আদৌ সম্ভব নয়, তখন আমি তোমাকে ছাড়া অপর কারো নিকট সাহায্য চাইবই বা কেন ? মাঝখানের এই মধ্যস্থতা মেনে নেয়ার এবং তোমাকে বাদ দিয়ে তার নিকট ধর্ণা দেয়ার কিইবা দরকার থাকতে পারে ?

তা ছাড়া নবী করীম (স)-এর বাণী এ পর্যায়ে আমাদের যে পথ-নির্দেশ করে তাও তো এই যে, সাহায্য কেবল আল্লাহ্র নিকটই চাইতে হবে। অন্য কারো নিকট নয়। নবী করীম (স) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

وَاِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَ اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ -

তুমি যদি কোনো কিছু প্রার্থনা করতে চাও তো আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করো, আর যদি তুমি কোনো সাহায্য চাওই, তাহলে সাহায্য চাইবে আল্লাহ্‌র নিকট।

আর আসল ব্যাপারই যখন এই, তখন যাবতীয় ব্যাপারে কেবল আল্লাহ্‌র নিকটই সাহায্য চাওয়া কর্তব্য। অপর কারো নিকট সাহায্য চাওয়া তো চরম বোকামী; চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা, নীচতা ও হীনতা।

বিশেষ করে মরে যাওয়া লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া তো আরো অধিক মারাত্মক। দুনিয়ায় জীবিত থাকা অবস্থায় বৈষয়িক বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার তো একটা বৈষয়িক মূল্য আছে, আছে বৈষয়িক তাৎপর্য, তা নিষিদ্ধও নয় ; কিন্তু মরে যাওয়া লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়ার কি অর্থ হতে পারে। কবরস্থ লোকেরা কি দুনিয়ার লোকদের ফরিয়াদ শুনতে পায়, শুনতে পেলেও তাদের কিছু করবার ক্ষমতা আছে কি ? তারা যে শুনতে পায় না, তা তো কুরআনের ঘোষণা থেকেই প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى - (انفال : ٨٠)

তুমি মরে যাওয়া লোকদের কোনো কথা শোনাতে পারবে না।

অন্যত্র বলেছেন ঃ

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى -

নিশ্চয়ই তুমি হে নবী! মরে যাওয়া লোকদের কিছু শোনাতে পারবে না।

মরে যাওয়া লোকদের সম্পর্কে যদি এই ধারণা হয় যে, তারা মরে যাওয়ার পর এতদূর ক্ষমতাশালী থাকে যে, সেখানেও তারা যা-ইচ্ছা তা-ই করতে পারে; আর এসব কিছুই করতে পারে অলৌকিকভাবে; তাহলে এতে তাকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য— আল্লাহ্‌র সমান— ক্ষমতাশালী হওয়ার ধারণা করার শামিল। আর এ ধারণা যে শিরক, তাতে কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

ইমাম বগভী লিখেছেন ঃ

اَ لْاِسْتِغَاثَةُ نَوْعُ تَعَبُّدٍ وَالْعِبَادَةُ الطَّاعَةُ مَعَ التَّذَلُّلِ وَالْخُضُوْعِ وَسُمِّىَ الْعَبْدُ عَبْدًا لِذِلَّتِهٖ وَانْقِيَادِهٖ - (المعالم)

সাহায্য প্রার্থনা তো এক প্রাকরের ইবাদত। ইবাদত বলা হয় বিনয় ও হীনতা জ্ঞান সহকারে আনুগত্য করাকে। আর বান্দাকে বান্দা বলাই হয় আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তার এই বিনয়, বাধ্যতা ও হীনতার কারণে।

مَنْ قَصَدَ لِذِيَارَةِ قُبُوْرِ الْاَنْبِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ اَنْ يُّصَلِّى عِنْدَ قُبُوْرِهِمْ وَ يَدْعُوَ عِنْدَ هَا وَ يَسْئَلُهُمُ الْحَوَائِجَ فَهٰذَا لَا يَجُوْزُ عِنْدَ اَحَدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ - فَاِنَّ الْعِبَادَةَ وَطَلَبَ الْحَوَائِجِ وَالْاِسْتِعَانَةَ حَقُّ اللّٰهِ وَحْدَهٗ - (مجمع البحار)

যে লোক নবী-রাসূল ও নেককার লোকদের কবর যিয়ারত করতে গিয়ে তাদের কবরের নিকট নামায পড়বে এবং সেখানে বসে দো'আ করবে, কবরস্থ লোকদের নিকট নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে প্রার্থনা করবে— মুসলিম আলিমদের মধ্যে কারো মতেই এ কাজ আদৌ জায়েয নয়। কেননা ইবাদত, প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা এবং সাহায্য চাওয়া— এ সবই এক আল্লাহ্‌রই হক (কেবল তাঁরই নিকট চাওয়া যেতে পারে, অন্য কারো নিকট নয়)।

নবী করীম (স)-এর এপর্যায়েরই এক দীর্ঘ হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَا عْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ - (احمد، ترمذى)

জেনে রাখো, সমস্ত মানুষও যদি একত্রিত হয়ে তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে তারা তা করতে পারবে না ততটুকু ছাড়া, যা আল্লাহ তোমার জন্যে নির্দিষ্ট করে লিখে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে সমস্ত মানুষও যদি তোমার একবিন্দু ক্ষতি করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবুও তারা কিছুই করতে পারবে না কেবল ততটুকু ছাড়া, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বস্তুত কলম তো তুলে নেয়া হয়েছে, কাগজের কালিও শুকিয়ে গেছে।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধান মতো যা হবার তা হবেই এবং শুধু তা-ই হবে, অন্য কিছু হবে না, হতে পারে না। কারো তেমন কিছু করার একবিন্দু ক্ষমতা নেই। কাজেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট— সে মৃত নবী-রাসূল আর অলী-পীর

গাওস কুতুব-ই হোক-না কেন— কোনো কিছু চাওয়ার কোনো অর্থই হতে পারে না। বরং তা হবে সুস্পষ্ট শির্ক— শির্ক-এর বিদয়াত।

মক্কা শরীফের মুফতী আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ মীর গনী আল-হানাফীর নিকট নিম্নোক্ত বিষয়ে ফতোয়া চাওয়া হয় ঃ

মরে যাওয়া লোকদের নিকট মান-সম্মান লাভ, রিযিকের প্রাচুর্য ও সন্তান লাভের জন্যে জীবিত লোকদের সাহায্য চাওয়া সম্পর্কে আলিম সমাজের কি বক্তব্য ? কবরস্থানে গিয়ে একথা বলা ঃ "হে কবরস্থ লোকেরা, তোমরা আমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করো; আমাদের গরিবী দূর করার, রিযিকের প্রাচুর্য, বেশি সন্তান হওয়া, আমাদের রোগীদের নিরাময়তা এবং উভয় জগতে আমাদের কল্যাণ হওয়ার জন্যে কেননা তোমরা আমাদের 'সলফে সালেহীন', তোমাদের দো'আ আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হয়।" মৃত ব্যক্তিদের নিকট এরূপভাবে সাহায্য চাওয়া কি জায়েয ? কুরআন, সুন্নাহ ও মুজতাহিদদের মতের ভিত্তিতে এর জবাব দেন। জওয়াবে মুফতি সাহেব যে ফতোয়া দেন, তার সারকথা হলোঃ

اَ لْاِسْتِغَاثَةُ بِالْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ مَطْلُوبَةٌ اِلَّا اَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ فِى الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَةِ -
(فتاوى رشيد يه كامل :ص- ٣٢٩)

নবী-অলীদের নিকট ফরিয়াদ করা যায়; কিন্তু প্রশ্নের উল্লেখিত বিষয় ও স্থানে তা করা শরীয়তে বিধিবদ্ধ নয়।

এই ফতোয়ায় তদানীন্তন বহু আলিম সমর্থনসূচক স্বাক্ষর দেন।

মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গংগুহী (রহ) অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে লিখেছেন, 'শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (রহ) গায়েব জানেন এবং স্বতন্ত্র ও স্বশক্তিতে দুনিয়ার ওপর তাসাররূফ (ক্ষমতা প্রয়োগ) করতে পারেন বলে বিশ্বাস করলে সুস্পষ্ট শির্ক হবে। এ পর্যায়ে তিনি প্রথমত উল্লেখ করেছেন কুরআন মজীদের আয়াত ঃ

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ -

গায়েব জগতের চাবিসমূহ আল্লাহ্ তা'আলারই হস্তে নিবদ্ধ, তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

পরে বাজ্জাজীয়া প্রভৃতি ফতোয়ার কিতাবের এ উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ

مَنْ قَالَ اَنَّ اَرْوَاحَ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ وَ تَعْلَمُ كَفَرَ -

মাশায়িখ— তথা পীর-বুজুর্গদের রূহ্ হাযির হয় এবং তারা সব কিছু জানে বলে যে বিশ্বাস করবে, সে কাফির হবে।

উক্ত কিতাবে এ একথাও লিখিত হয়েছে ঃ

وَ مَنْ ظَنَّ اَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّفُ فِىْ الْاُمُوْرِ دُوْنَ اللّٰهِ وَاعْتَقَدَ بِهٖ كَفَرَ -

(كذا فى البحر الرائق انتهى من مائة المسائل)

যে ব্যক্তি মনে করে যে, মৃত্যু ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া নিজেই যাবতীয় বিষয় ও ব্যাপারে কর্তৃত্ব চালায়, আর এরূপ আকীদা ও বিশ্বাস যার হবে, সে কাফির হয়ে যাবে। (বাহরুর-রায়েক গ্রন্থেও এমনিই লেখা রয়েছে, মিয়াত মাসায়েল গ্রন্থ) (فتاوى رشيديه كامل ص - ٣٦٠)

মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাকের ছাত্র মওলানা নওয়াব কুতুবুদ্দীন খান কবরস্থ লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েয কি-না এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন ঃ

استعا نت واستمدا د اهل قبور بهر نهج كه باشد جائز نيست جنانچ شيخ عبد الحق درشرح مشكو ة شريف كه بزبان عربى نوشته مى آرد وَاَمَّا الْاِسْتِمْدَادُ بِاَهْلِ الْقُبُوْرِ فِىْ غَيْرِ النَّبِيِّ وَالْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدْ اَنْكَرَهٗ كَثِيْرٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ وَقَالُوْا لَيْسَ الزِّيَارَةُ اِلَّاالدُّعَاءُ لِلْمَوْتٰى وَالْاِ سْتِغْفَارُ لَهُمْ وَ اِيْصَالُ النَّفْعِ اِلَيْهِمْ بِالدُّ عَاءِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ -

কবরস্থ লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া, তা যে রকমেরই হোক না কেন— জায়েয নয়। শায়খ আবদুল হক মিশকাতের আরবী শরাহ্-এ লিখেছেন ঃ নাবী ও আম্বিয়া ছাড়া কবরস্থ অন্য লোকদের নিকট কোনরূপ সাহায্য চাওয়া— ইস্তেমদাদে রূহানী করা— বহুসংখ্যক ফকীহ নাজায়েয বলেছেন। তাতা বলেছেন ঃ 'মৃতদের জন্যে দো'আ করা, তাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট মাগফিরাত চাওয়া, দো'আ ও কুরআন তিলাওয়াত করে তাদের কোনোরূপ ফায়দা পৌঁছানো ছাড়া কবর যিয়ারতে আর কিছুই করণীয় নেই।

এ পর্যায়ে একটি ধোকা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র নামে— আল্লাহ্র ওয়াস্তে কোনো অলীর রূহের নিকট কিছু প্রার্থনা করাকে জায়েয মনে করা হচ্ছে এবং এতে কোনো দোষ আছে বলে মনে করা হচ্ছে না। মনে করা হচ্ছে যে, তাকে

শুধু অসীলা হিসেবেই গ্রহণ করা হচ্ছে আর এরূপ অসীলা গ্রহণে কোনো দোষ নেই।

কিন্তু এ বাস্তবিকই একটি ধোঁকা, যার ফলে অনেক নিষ্ঠাবান তওহীদবাদী মুসলমানও অজ্ঞাতসারে পরিষ্কার শির্ক-এর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কোনো কিছু প্রার্থনা করার সময় আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নাম করা হলে হয় তার অর্থ এই হবে যে, আসলে চাওয়া হচ্ছে অন্য ব্যক্তির নিকট। আল্লাহ্র নিকট চাইলে আল্লাহ তা দিবেন কি না কিংবা শুধু আল্লাহ্র তা দেয়ার ক্ষমতা আছে কি না। আর এ দু'টো দিক দিয়েই ব্যাপারটি পরিষ্কার শির্ক-এর মধ্যে গণ্য হয়ে যায়।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী এ পর্যায়ে লিখেছেন ঃ

وَمِنْهَا (اَىْ مِنْ مُظَانِّ الشِّرْكِ) اَنَّهُمْ كَانُوْا يَسْتَعِيْنُوْنَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فِىْ حَوَائِجِهِمْ مِنْ شَفَاءِ الْمَرِيْضِ وَغِنَاءِ الْفَقِيْرِ وَيَنْذُرُوْنَ لَهُمْ يَتَوَقَّعُوْنَ اِنْجَاحَ مَقَاصِدِهِمْ بِتِلْكَ النُّذُوْرِ وَيَتْلُوْنَ اَسْمَائَهُمْ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا فَاَوْجَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا فِىْ صَلَوٰاتِهِمْ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الدُّعَاءِ الْعِبَادَةَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ بَلْ مُرَادُهُ اَلْاِسْتِعَانَةُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ - (الحجة الله البالغة ج -١)

শির্ক হওয়ার ধারণা হয় যে সব ক্ষেত্রে, তার মধ্যে এ-ও একটি যে, লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অপরের নিকট রোগীর রোগ সারা ও গরীবকে ধন দেয়া প্রভৃতি প্রয়োজন পূরণের জন্যে দো'আ করে, তাদের জন্যে মানত মানে, এসব মানত থেকে নিজেদের কামনা পূরণ হওয়ার আশা পোষণ করে তাদের নামে তিলাওয়াত করে বরকত লাভের আশায়। এ জন্যে আল্লাহ্ লোকদের ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন যে, তারা নামাযে বলবে ঃ "হে আল্লাহ্ আমরা কেবল তোমারই বন্দেগী করি, কেবল তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" আল্লাহ্ আরো বলেছেন ঃ আল্লাহ্র সাথে আর কাউকেই ডাকবে না। এ ডাকা নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ ইবাদত করা থেকে নিষিদ্ধ নয়—যেমন কোনো কোনো তাফসীরকার মনে করেছেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা নিষেধ। কেননা আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেছেন ঃ "কেবল আল্লাহ্কেই ডাকবে। ফলে তোমরা যা চাও, তিনি তা তোমাদের জন্যে খুলে দিবেন।

মিথ্যা প্রচারের বাতুলতা

কবর পূজা ও রূহানী ইস্তেমদাদে বিশ্বাসী লোকেরা তাদের মতের সমর্থনে একটি কথাকে হাদীসের দলীলরূপে পেশ করে থাকে। কথটি এই ঃ

اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِى الْاُمُوْرِ فَاسْتَعِيْنُوْا بِاَهْلِ الْقُبُوْرِ -

তোমরা যখন দুনিয়ার কাজ-কর্মে খুব কাতর ও দিশেহারা হয়ে পড়বে, তখন তোমরা কবরবাসীদের নিকট সাহায্য চাইবে।

এ কথাটিকে তারা হাদীস বলে চালিয়ে দেয়। আসলে এটা হাদীস নয়, এটাকে হাদীস বলা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। বিশেষজ্ঞগণ এ কথাটি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

هُوَ كَلَامٌ مَوْضُوْعٌ مَكْذُوْبٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ - (اقتضاء الصراط :ص - ٥٨٥)

বিশেষজ্ঞগণ সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলেছেন যে, এ কথাটি মনগড়া, মিথ্যা।

আর শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দিহলভী এ কথাটি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

این حدیث قول مجاوران است برئے اخذ نذرو نیاز بر مصطفی صلی اللّٰہ علیہ وصلم افتراء کردہ اند - (بلاغ المبین - ص ٥٣)

হাদীস বলে চালানো এ বাক্যটি কবরের মুজাবির (পেশাদার খাদেমদের) নিজেদের মনগড়া কথা। তারা নযর-নিয়াজ লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের এ কথাটি মিথ্যামিথ্যি নবী করীমের নামে চালিয়ে দিয়েছে।

আসলে এ কথাটি কোনো হাদীসই নয়। মুহাদ্দিস এবং মুহাক্কিক সূফিগণও একে মনগড়া ও রচিত কথা বলে ঘোষণা করেছেন। বস্তুত আকীদার ব্যাপারে এ রকম বানানো কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করার কারণ হলো চরম অজ্ঞতা ও মূর্খতা।

সূরা আল-বাকারার আয়াত ঃ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

এর তাফসীরে শাহ্ আবদুল আযীয (র) বিভিন্ন রকম ও প্রকারের اندادا 'প্রতিদ্বন্দ্বীর' উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে চতুর্থ রকম হলো কবর পূজারীদের বানানো প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের সম্পর্কে এখানে লিখেছেন ঃ

چهارم پیر پرستان گویند چوں مرد بزرگے کہ بسبب کمال ریاضت ومجاهده مستجاب الدعوات ومقبول الشفاعت عند الله شده بود ازین جهان میگزرد روح اورا

قوت عظیم ووسعتی بس فخیم بهم برسد هرکه صورة اورابزرخ سازد یادرمکان نشست وبرخاست اوبابزرگور اوسجود وتذل تام نماید روح اوبسبب وسعت واطلاق برآں مطلع شود – ودر دنیاو اخرت درحق اوشفاعت نماید –

(تفسیر عزیزی : ج -١،ص -١٥١)

পীর-পূজারী লোকেরা বলে ঃ বুযুর্গ লোকেরা খুব বেশি বেশি রিয়াজত ও সাধনা মুজাহিদা করে বলে তাঁদের দো'আ ও সুপারিশ আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয় বিধায়। এ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তাদের রূহে অসীম শক্তি ও বিশালতার সৃষ্টি হয়। তাদের শেকেল-সুরতকে যদি বরজাখ্ বানান হয় কিংবা তার বৈঠকখানায় ও কবরস্থানে আজিজী-ইনকেসারীর সাথে সিজদা করা হয়, তাহলে তাদের রূহ জ্ঞানের বিশালতার কারণে তা জানতে পারে এবং দুনিয়া-আখিরাতে সিজদাকারীর কল্যাণের জন্যে তারা সুপারিশ করে।

এ থেকে বোঝা গেল, এ ধরনের ইস্তেমদাদ ও কবর পূজাকে শাহ্ আবদুল আযীয (রহ) সুস্পষ্টরূপে ند আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রহণ করা মনে করেন। আর এই ند গ্রহণ করাই হল শির্‌ক— যা কুরআনে সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ।

আল্লাহ ও বান্দার মাঝে এধরনের অসীলা ধরা ও সুপারিশ হাসিল করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে যদি কেউ মনে করে, তবে সে আল্লাহ্‌র সম্পর্কে বদনামী করছে। আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম লিখেছেন ঃ

وَمَنْ ظَنَّ اَنَّ لَهٗ وَلَدًا اَوْشَرِيْكًا اَوْ اَنَّ اَحَدًا شَفَعَ عِنْدَهٗ بِدُوْنِ اِذْنِهٖ اَوْ اَنَّ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ خَالِقِهٖ وَسَايِطُ يَرْفَعُوْنَ حَوَائِجَهُمْ اِلَيْهِ وَ اَنَّهٗ نَصَبَ الْعِبَادَةَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِهٖ يَتَقَرَّبُوْنَ بِهِمْ اِلَيْهِ وَيَتَوَسَّلُوْنَ بِهِمْ اِلَيْهِ وَيَجْعَلُوْنَهُمْ وَسَابِطَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهٗ فَيَدْعُوْنَهُمْ وَ يَخَافُوْنَهُمْ وَيَدْجُوْنَهُمْ فَقَدْ ظَنَّ بِهٖ اَقْبَحَ الظَّنِّ وَاَسْوَءِهٖ – (الهدى : ج-٢، ص -١٠٤)

যে মনে করবে যে, আল্লাহ্‌র সন্তান আছে কিংবা তাঁর কোনো শরীক আছে বা তাঁর অনুমতি ছাড়াই কেউ তাঁর নিকট শাফা'আত করতে পারে অথবা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে এমন কিছু মাধ্যম রয়েছে, যা সৃষ্টির প্রয়োজনের কথা আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করে কিংবা আল্লাহ ছাড়া এমন কতক অলী-আল্লাহ্ও রয়েছে,

যারা আল্লাহ এবং সেই লোকদের মাঝে অসীলা ও নৈকট্যের কাজ করবে এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্যে তাদের নিকট তারা দো'আ করে, তাদের ভয় করে চলে, আর তাদের কাছ থেকে অনেক কিছুর আশা করে— এই যার আকীদা হবে, সে তো আল্লাহ্ সম্পর্কে খুব জঘন্য ও অত্যন্ত খারাপ ধারণা পোষণ করলো।

কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপত্তী (র) হানাফী মাযহাবের বড় আলিম এবং তাসাউফপন্থী মনীষী ছিলেন। কুরআন-হাদীসে গভীর পাণ্ডিত্য থাকার কারণে তিনি সব মহলেই সম্মানার্হ ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি কুরআনের আয়াত ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ - (الاعراف : ١٩٤)

তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আর যাদের ডাকো, তারা তো তোমাদের মতোই দাসানুদাস মাত্র।

এর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "এ আয়াত বিশেষভাবে কেবলমাত্র মূর্তি পূজারীদের জন্যে নয়, বরং مِنْ دُونِ الله আল্লাহ ছাড়া সাধারণভাবে আর যে কেউ-ই হোক না কেন, সে-ই এর মধ্যে শামিল এবং তাকে ডাকলেই সুস্পষ্ট শির্ক হবে। কেননা ওদের যে ডাকা হচ্ছে, মানুষের কোনো একটি প্রয়োজন পূরণ করার ওদের কি ক্ষমতা আছে ? কেউ যদি বলে যে, এ আয়াত কাফিরদের সম্পর্কে প্রযোজ্য, কেননা তারাই মূর্তিগুলোকে স্মরণ করে থাকে, তা হলে বলবো دون الله শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত কোনো বিশেষ জিনিস যে বোঝায় না, তা-ই একথা স্বীকৃতব্য নয়। (ارشاد الطالبين ص : ١٩)

বস্তুত কুরআন ও হাদীস থেকে মুশরিকী আকীদা ও আমলের অনুকূলে দলীল পেশ করা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। আরও আশ্চর্যের বিষয়, যে সব মনীষী আজীবন শির্ক বিদয়াতের বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছেন, বাস্তবভাবে অভিযান চালিয়েছেন, তাঁদেরই কোনো কোনো কথা পূর্বাপর সম্পর্ক ছিন্ন করে শির্ক-বিদয়াতের সমর্থনে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদের এই ধোঁকাবাজি অভিজ্ঞ মহলে ধরা পড়ে যেতে পারে— এতটুকু ভয়ও এই বিদয়াতপন্থী ও বিদয়াত-প্রচারকদের মনে জাগে না। মনে হয়, বিদয়াত ছাড়া তাদের মন-মগজে আর কিছু নেই। বিদয়াতেই তাদের রুচি, বিদয়াতই তাদের পেশা যেমন এক শ্রেণীর পোকার রুচি কেবল ময়লা ও আবর্জনায়! আল্লাহ এদের হেদায়েত করুন।

কুরআনের আয়াত দিয়ে ধোঁকাবাজি

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সাহায্য চাওয়া জায়েয নয়; বরং তা শির্ক। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে তা কুরআন-হাদীস ও ফিকাহ্র অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এই আলোচনার শেষভাগে পীর-পোরস্ত আলিমদের তিনটি দলীল সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'টি কথা না বললে ভুল অপনোদন এবং বাতিলের প্রতিবাদ সম্পূর্ণ হবে না।

উক্ত আলিম সাহেবদের মতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য শক্তির নিকট— জীবিত বা মৃত অলী-আল্লাহ্র নিকট ইস্তেমদাদ বা সাহায্য চাওয়া জায়েয! আর তা প্রমাণের জন্যে তাঁরা কুরআন মজীদ থেকে তিনটি আয়াত পেশ করে থাকেন। প্রথম আয়াত হলো সূরা ছফ এর ঃ

مَنْ اَنْصَارِیْٓ اِلَی اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ - (الصف :١٤)

হযরত ঈসা (আ) বললেন ঃ আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে আমার সহায়ক কে হবে? শিষ্যগণ বললো— আমরাই আল্লাহ্র কাজে আপনার সহায়ক।

আর দ্বিতীয় আয়াতটি হলো সূরা 'আল-কাহাফ' এর ঃ

قَالَ مَامَكَّنِّیْ فِیْهِ رَبِّیْ خَیْرٌ فَاَعِیْنُوْنِیْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمًا - (٩٥- ع)

তোমাদের আর্থিক সাহায্য দেয়ার জরুরত নেই, কেননা আমার প্রভু আমাকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন তা-ই যথেষ্ট; তবে তোমরা আমাকে দৈহিক সাহায্য করতে পার। তাহলে আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে এক দৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেবো।

আর তৃতীয় আয়াত হলো সূরা ইউসুফের। আয়াতটি এই ঃ

اُذْكُرْنِیْ عِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسَاهُ الشَّیْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ سِنِیْنَ - (٤٢- ع)

তোমার প্রভু (আজিজ মিসরের) নিকট আমার কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর নিকট তার কথার উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিলো। ফলে ইউসুফ (আ) আরও কয়েক বৎসর কারাগারেই রইলো।

এই তিনটি আয়াত পেশ করে পীর-পোরস্ত আলিম নামধারী লোকেরা বলতে চান যে, যেভাবে হযরত ঈসা (আ) হাওয়ারী লোকদের নিকট সাহায্য চেয়েছিলেন, যেভাবে যুলকারনাইন জনগণের কাছে বলেছিলেন বাঁধ বাধার

ব্যাপারে তোমরা শক্তি দিয়ে আমাকে সাহায্য করো এবং যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে মুক্তিলাভের জন্যে মুক্তিপ্রাপ্ত সাথীকে বাদশাহ্‌র নিকট সুপারিশ করতে বলেছিলেন, অনুরূপভাবে কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কিংবা বৈষয়িক উন্নতি লাভের আশায় যে কোনো জীবিত বা মৃত অলী-আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ-প্রার্থনা করা যায়, তা সম্পূর্ণ জায়েয। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে কথাটি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদের এ আয়াত তিনটি পেশ করা হয়, তা এর কোনো একটি আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় না। প্রত্যেকটি আয়াতকে ভিত্তি করে চিন্তা-বিবেচনা করলেই আমার এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। মনে রাখা আবশ্যক যে, আলোচনা হচ্ছে 'ইস্তেমদাদে রূহানী' 'আধ্যাত্মিক উপায়ে সাহায্য পাওয়ার জন্যে কারো নিকট দো'আ করা' সম্পর্কে। আহলে সুন্নাত আল-জামা'আতের আকীদা হলো এই যে, এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই করা যেতে পারে। কেননা, এ ধরনের সাহায্য দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই— থাকতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নির্দেশ এই যে, এ ধরনের অবস্থায় কেবল আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাইতে হবে। তওহিদী আকীদাও তাই। অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া হলে তা আকীদার দিক দিয়ে হবে শির্‌ক এবং তওহিদী আকীদায় তা-ই হবে বিদয়াত। এ প্রেক্ষিতে আয়াত তিনটি যাঁচাই করলে দেখা যাবে যে, এর কোনটিতেই এ পর্যায়ের সাহায্য চাওয়ার কোনো কথা নেই। সূরা الصف। -এর প্রথমোক্ত আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-এর যে সাহায্য চাওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে 'আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে আমার সাহায়ক কে হবে?' এ কথা বলে, সে সাহায্য তো কোনো ব্যক্তির বিপদে পড়ে চাওয়া সাহায্য নয়। হযরত ঈসা (আ) কোনো বিপদে পড়ে হাওয়ারীদের নিকট সাহায্য চান নি। সাহায্য চান নি নিজের কোনো কাজের ব্যাপারে। কোনো আধ্যাত্মিক উপায়ে সাহায্য করার জন্যে ফরিয়াদ করা হয়নি এখানে। কুরআনের আয়াত مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ। 'আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে কে আমার সহায়ক হবে' কথাটিই প্রমাণ করে সে, এ সাহায্য চাওয়ার মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচার ও কায়েম করার ব্যাপারে কাজ করার জন্যে এগিয়ে আসতে তাদের আহবান জানান হয়েছে মাত্র। কেননা দ্বীন কায়েমের জন্যে চেষ্টা করা কেবল মাত্র হযরত ঈসার-ই দায়িত্ব ছিল না, অন্য সব মুসলমানেরও দায়িত্ব ছিল। আয়াতটির সূচনাই তো হয়েছে আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে। বলা হয়েছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ -

হে ঈমানদার লোকেরা. তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও।

এখন বাস্তব ভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য কাজে আহবান করা তো নবীরই দায়িত্ব। হযরত ঈসা (আ) তো সেই দায়িত্বই পালন করেছেন এই সাহায্য চেয়ে। এ কারণেই আল্লামা আলূসী সহ সব মু'তাবার তাফসীরেই এ আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে এভাবে ঃ

اَىْ مَنْ جُنْدِىْ مُتَوَجِّهًا اِلٰى نُصْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্যের উদ্দেশ্য নিয়ে কে আমার সৈন্য হতে রাজি আছে ?

এ তো কোনো আধ্যাত্মিক উপায়ে সাহায্য করতে বলা কথা নয়। এ তো হচ্ছে নবীর নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সহযোগিতা করার আহবান। এ কাজ নবীর নিজের কোনো কাজ নয়। এ হচ্ছে সোজাসুজি ও সরাসরি আল্লাহ্‌র সাহায্যের কাজ। এর বড় প্রমাণ রয়েছে খোদ কুরআনের এ সূরাতেই উল্লিখিত তাদের জবাবে। তারা অগ্রসর হয়ে এসেছে ঈসা (আ)-এর সাহায্যে নয়, আল্লাহ্‌র সাহায্য করার কাজে। তাই তারা বলেছেন ঃ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ —আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী।

আল্লামা আলূসী এখানেই লিখেছেন ঃ

وَالْاِضَافَةُ فِىْ اَنْصَارِىْ اِضَافَةُ اَحَدِ الْمُتَشَارِكَيْنِ الْاٰخَرِ لِاَنَّهُمَا لَمَّا اَشْرَكَا فِىْ نُصْرَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ بَيْنَهُمَا مُلَا بَسَةٌ وَ تَصْحِيْحُ اِضَافَةِ اَحَدِ هِمَا لِلْاٰخَرِ -

(روح المعانى :ج -٢٨، ص - ٩)

আমার সাহায্য বলার মানে দুই শরীকের কাজকে একজনের পক্ষে অপর জনের কাজ বলা। আর যখন, এরা দুপক্ষই সমানভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য কাজে শরীক হয়েছে, তখন উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হলো এবং এই কথা বলাকে সহীহ সাব্যস্ত করে দিলো।

অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এখানে হযরত ঈসা (আ) কোনো অলৌকিক কাজ করার ব্যাপারে কোনো মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চান নি। কেননা তা যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নিকটই চাওয়া যায় না, তা নবীর চাইতে আর কে বেশি বুঝবে ?

দ্বিতীয় আয়াতে যুলকানরাইনও কোনো অলৌকিক কাজের জন্যে সাহায্য চান নি। তাঁর কথার সার হলো ঃ বাঁধ বাঁধতে হবে, টাকা-পয়সা আমার আছে। তোমরা বাস্তবভাবে কাজ করে আমার এ কাজে সাহায্য করো। এ হচ্ছে বৈষয়িক কাজে নিতান্ত বাস্তবভাবে কাজের সহযোগিতা করতে বলা। আর এ জগত তো

বাস্তব কার্যকরণের জগত। এ জগতে এ ধরনের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া বা পাওয়া কিছুতেই কোনো আধ্যাত্মিক সাহায্যের ব্যাপার নয়। এ হলো মানুষের সামাজিক জীবনের জন্যে অপরিহার্য ব্যাপার, যা সম্পূর্ণ জায়েয। তাই ইমাম ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

اَىْ اَنَّ الَّذِىْ اَعْطَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْمُلْكِ وَالتَّمْكِيْنِ خَيْرٌ لِّىْ مِنَ الَّذِىْ تَجْمَعُوْنَهٗ وَلٰكِنْ سَاعِدُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَىْ بِعَمَلِكُمْ وَاٰلاَتِ الْبِنَاءِ - (تفسيرالقران العظيم :ج -٤، ص-٤٢٤)

"অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাকে রাজত্ব ও আধিপত্য যা দিয়েছেন, তা তোমাদের জন্য সব কিছু থেকেই উত্তম। কিন্তু তোমরা আমাকে শক্তি দিয়ে সাহায্য করো অর্থাৎ কাজ করে ও নির্মাণ কাজের জিনিসপত্র দিয়ে।

আর তৃতীয় আয়াতটিও একটা বৈষয়িক তদবীর সংক্রান্ত ব্যাপার। হযরত ইউসুফ (আ) দীর্ঘদিন বিনাবিচারে আটক হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন বাদশাহ হয়তো তাঁর কথাই ভুলে গেছে। অতএব তিনি সহবন্দীর রেহাই পেয়ে জেল থেকে চলে যাওয়ার সময় বলে দিলেন যে, আমার কথা তোমার প্রভুর কাছে বলবে। এও যদি কোন আধ্যাত্মিক সাহায্য চাওয়ার পর্যায়ের কাজ হয়ে থাকে তা হলে তো বলতে হবে যে, নবীও অ-নবীর নিকট অলৌকিক উপায়ে সাহায্য চাইতে পারেন। কিন্তু তা যে একজন নবীর পক্ষে কতখানি অপমানকর, তা বলাই বাহুল্য।[১] সবচেয়ে বড় কথা, একজন নবী অলৌকিক বা আধ্যাত্মিক উপায়ে (?) সাহায্য চাইলেন, আর শয়তান তা ভুলিয়ে দিলো, তার মুক্তির প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিলো! এরূপ কথা পীর-পোরস্তরাই বিশ্বাস করতে পারে, কোনো তওহীদবাদী আহলে সুন্নাত ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাসকে মনের দূরতম কোণেও স্থান দিতে প্রস্তুত হতে পারে না।

মোটকথা, এ কয়টি আয়াত দিয়ে পীর-পোরস্তরা যা প্রমাণ করতে চাইছে তা আদৌ প্রমাণিত হয় না। হয় শুধু ধোঁকাবাজি করা।

---

১. এ পর্যায়ে ইমাম ইবনে কাসীর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটি এই ঃ

قَالَ النَّبِىُّ صعلم لَوْلَمْ يَقُلْ يَعْنِىْ يُوْسُفَ - اَلْكَلِمَةُ الَّتِىْ قَالَ مَالَبِثَ فِى السِّجْنِ طُوْلَ مَالَبِثَ حَيْثُ يَبْتَغِى الْفَلاَحَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ -

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ হযরত ইউসুফ এই যে কথাটি বলেছিলেন, অর্থাৎ তিনি যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নিকট মুক্তি কামনা করেছিলেন, তা না করলে তিনি যতদিন জেলে ছিলেন ততদিন থাকতেন না। পরে ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ وهذا الحديث ضعيف جدا। এ হাদীসটি সাংঘাতিকভাবে যয়ীফ, অগ্রহণযোগ্য।

এই পর্যায়ে কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি আমাদের অবশ্যই সব সময় স্মরণে রাখতে হবে ঃ

وَ لَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ -

আল্লাহ ছাড়া আর যারা যারা আছে তারা বা তা তোমাদের কোনো উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও না-তাই তাকে আদৌ ডাকবে না। যদি ডাকো তাহলে তুমি জালিমদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে।

মানুষ কাউকে ডাকে তার কাছ থেকে কোনো উপকার পাওয়ার আশায় অথবা কোনো ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য। আর উপকার ও ক্ষতি যে করতে পারে না তাকে ডেকে কি লাভ হবে। তা করার নিরংকুশ ক্ষমতা তো এক আল্লাহ্র, অতএব ডাকতে হবে সর্বাবস্থায়, সব কিছুর জন্য একমাত্র তাঁকেই। পানাহ্ বা আশ্রয় চাওয়া কেবল তাঁরই নিকট সম্ভব। কেননা পানাহ্ বা আশ্রয় দেয়ার একবিন্দু ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর করোরই নেই। তাই আল্লাহ নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন— পানাহ্ বা আশ্রয় চাও কেবল সেই এক আল্লাহ্র নিকট।

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য বিদেশ সফর

কবর যিয়ারত করা জায়েয কিন্তু তা করতে হবে শরীয়ত সম্মতভাবে। কবরস্থানে গিয়ে যেমন শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করা যাবে না, কোনো অবাঞ্ছিত কথাও বলা যাবে না; তেমনি কোনো নবী বা অলী বা কোনো নেককার লোকের কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্য বিদেশ সফর করাও জায়েয নয়। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম দলীল হচ্ছে নবী করীম (স)-এর তীব্র ও জোরদার নিষেধ বাণী। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ، مَسْجِدُ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِىْ هٰذَا وَالْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى - (بخارى، مسلم عن سعيد عن ابى هريرة)

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভমূলক সফর কেবল তিনটি মসজিদ যিয়ারতের জন্য করা যাবে, তা হলো ঃ মসজিদে হারাম (কা'বা ঘর), মসজিদে নববী, এবং মসজিদে আকসা। এ ছাড়া আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অপর কোনো স্থানের জন্যে সফর করবে না।

এ হাদীস থেকে জানা যায়, তিনটি মসজিদের জন্য আল্লাহ্‌র নৈকট্যমূলক সফর করা মুস্তাহাব বা জায়েয। কিন্তু এই তিনটি জায়গা ছাড়া অন্য কোনো স্থানের বা দূরে অবস্থিত কোনো কবর যিয়ারত করতে বিদেশ যাত্রা করা নিষিদ্ধ। ইমাম নববী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

وَفِى هٰذَا الْحَدِيْثِ فَضِيْلَةٌ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ وَ فَضِيْلَةُ شَدِّ الرِّحَالِ اِلَيْهَا لِاَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدِ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ لَا فَضِيْلَةَ فِىْ شَدِّ الرِّحَالِ اِلٰى مَسْجِدٍ غَيْرِهَا -

এ হাদীস উক্ত তিনটি মসজিদের এবং সে মসজিদ ত্রয়ের জন্যে সফর করার ফযীলত প্রমাণ করেছে। কেননা সর্বশ্রেণীর আলিমের মতে এর মানে হচ্ছে এই যে, এ মসজিদত্রয় ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের জন্যে সফর করার কোনো ফযীলত নেই।

ইমাম নববী হাদীসের ব্যাখ্যায় অন্যত্র লিখেছেন ঃ এ তিনটি হচ্ছে নবীগণের মসজিদ। এতে নামায পড়ার ফযীলত অনেক বেশি অন্যান্য মসজিদের তুলনায়।

অতএব তাতে নামায পড়া ও ইবাদত করার নিয়্যতেই সফর করা যাবে । তাতে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো ইবাদতের জন্যে সফর করা যাবে না। কেননা اَلْمَسَاجِدُ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا[১] মসজিদে হারামের দিকে সফর করার মানত করা হলে তার হজ্জ বা ওমরা করার উদ্দেশ্যে তা পূরণ করা কর্তব্য। আর শেষোক্ত মসজিদদ্বয়ের সফর মানত করা হলে ইমাম শাফিয়ীর একটি কথা হচ্ছে এই যে, এ দুয়ের নিয়্যতে সফর করা মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, সে মানত পূরণ করা ওয়াজিব হবে। আর অনেক আলিমই এই মত পোষণ করেন। অতঃপর তিনি লিখেছেন ঃ

وَاَمَّا بَاقِيْ الْمَسَاجِدِ سَوَى الثَّلاَثَةِ فَلَا يَجِبُ قَصْدُهَا بِالنَّذْرِ وَ لَا يُنْعَقَدُ نَذْرُ قَصْدِهَا

- وَهٰذَا مَذْ هَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً اِلَّا مُحَمَّدَ بْنِ مُسْلِمِ الْمَالِكِيّ - (نبوى)

এ তিনটি মসজিদ ছাড়া অপর কোনো মসজিদের জন্যে সফর মানত করা হলে তা পূরণ করা ওয়াজিব নয় এবং মানতই শুদ্ধ হবে না। এ মত আমাদের এবং সমগ্র আলিমদের। অবশ্য মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম মালিকী ভিন্নমত পোষণ করেন।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ

شَدُّ الرِّحَالِ كِنَايَةٌ عَنِ السَّفَرِ اَيْ لَا يَقْصُدُ مَوْضَعَ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ اِلَّا اَحَدَ هٰذِهِ الثَّلٰثَةِ تَعْظِيْمًا لِشَانِهَا ، فَاِنَّ مَاسِوَاهَا مُتَسَاوٍ فِى الْفَضْلِ فَفِى اَىْ مَسْجِدٍ يُصَلّٰى كُتِبَ لَهٗ مِثْلَ مَافِىْ غَيْرِهٖ بِخِلَافِ الْمَسَاجِدِ الثَّلٰثَةِ ثُمَّ الْمُرَادُ اَنَّهٗ لَايُرْحَلُ مِنْ حَيْثُ قُصِدَ ذَوَاتُ الْاَمْكِنَةِ وَ اَمَّا اِنْ كَانَ اِلَيْهَا حَاجَةٌ مِنْ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ فَذٰلِكَ شَيْءٌ اٰخَرُ فَظَاهِرَةُ النَّهْىُ عَنِ الْمُسَافِرَةِ اِلٰى مَوْضِعٍ سِوٰى هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ اَنَّهٗ لَا يَجِبُ قَصْدُ مَاسِوٰى الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ بِا النَّذْرُ وَ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ وَ لَا يَلْزَمُ الْوَفَابِهٖ - وَاخْتُلِفَ فِىْ شَدِّ الرِّحَالِ اِلٰى قُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ اَوْ اِلَى الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ فَمُحَرَّمٌ - (مجمعع البحار، اشعة اللمعات)

---

১. মসজিদসমূহ আল্লাহ্রই জন্য স্থাপিত। অতএব আল্লাহ্র সাথে অপর কাউকেই ডাকবে না। (অপর কারো ইবাদত করবে না)।

হাদীসের শব্দ شَدُّ الرِّحَال মানে বিদেশ সফর করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের নিয়্যত ও উদ্দেশ্যে এ তিনটি মসজিদ ছাড়া অপর কোনো স্থানের জন্যে সফর করবে না। কেননা এ তিনটি মসজিদই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্মানার্হ এ কারণে যে, এ ছাড়া অপর সব মসজিদই মর্যাদায় সমান। অতএব যে কোনো মসজিদেই নামায পড়া হোকনা কেন, সবখানেই একই রকম সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু এ তিনটি মসজিদের সম্মান ভিন্ন রকম। এ হাদীসের আরও অর্থ হলো, কোনো বিশেষ জায়গায় নিয়্যত করে সেজন্যে সফর করবে না। কিন্তু সেখানে যদি লেখা-পড়া শেখা ইত্যাদি কোনো প্রয়োজন থাকে, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। হাদীসের বাহ্যিক অর্থ তো এই যে, এ তিনটি স্থান ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় সফরই করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এ তিনটি মসজিদ ছাড়া অপর কোনো জায়গা সফরের মানত মানা হলে তা পূরণ করা ওয়াজিব হবে না। এ মানতই মানত বলে গণ্য হবে না, তা পূরণ করাও জরুরী হবে না। আর 'অলী' ও নেক লোকদের বা পবিত্র স্থানসমূহের জন্যে সফর করা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হারাম।

মনে রাখতে হবে, এখানে শুধু যিয়ারত করতে নিষেধ করা হয় নি, তা আলোচ্যও নয় এখানে। বরং এ নিষেধ হচ্ছে শুধু এ উদ্দেশ্যে বিদেশ সফর করা সম্পর্কে। রাসূলের এ হাদীস-ই হচ্ছে সুন্নাত এবং এই সুন্নাত অনুযায়ী-ই আমল করেছেন সাহাবায়ে কিরাম। এমন কি, কোনো কোনো বর্ণনা মতে শুধু রাসূলের কবর যিয়ারতের জন্যে সফর করার কাজও তাঁরা করেন নি এবং তা করা তাঁরা পছন্দও করেন নি। এ পর্যায়ে প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত কথা দু'টি উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

سَائِرُ الصَّحَابَةِ مِثْلُ مُعَاذٍ وَ اَبِىْ عُبَيْدَةَ وَعُبَادَةَبْنِ الصَّامِتِ وَ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ وَ غَيْرِ هِمْ لَمْ يُعْرَفْ عَنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اَنَّهٗ سَافَرَ لِقَبْرٍمِّنَ الْقُبُوْرِ -

(الصارم المنسكى :ص- ٧١ ، الرد على الاخنائى :ص- ٢٣)

সব সাহাবী— যেমন মুয়ায, আবু উবায়দা, উবাদা ইবনে সামিত এবং আবুদ দারদা প্রমুখ— এঁদের কেউ দুনিয়ার একটি কবরগাহেরও যিয়ারত করবার উদ্দেশ্যে সফর করেছেন বলে জানা যায়নি।

এমন কি, সাহাবায়ে কিরাম (রা) শুধু কোনো নবীর মাযার যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করেছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الصَّحَابَةَ فِيْ خِلَافَةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى انْقِرَاضِ عَصْرِهِمْ لَمْ يُسَافِرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى قَبْرِ نَبِيٍّ وَ لَارَجُلٍ صَالِحٍ -

(غاية الامان :ج -١، ص- ١١٩)

হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী (রা) এবং তাঁদের পরবর্তী লোকদের যুগ শেষ হওয়া পর্যন্ত কোনো সাহাবীই কোনো নবী বা কোনো নেক ব্যক্তির কবর যিয়ারতের জন্যে সফর করে বিদেশে যাননি।

এই পর্যায়ে সর্বজনমান্য ভারতীয় মনীষী শাহওয়ালী মুহাদ্দিসে দিহলভী যা কিছু লিখেছেন, তা উল্লেখ করে আমাদের এ সম্পর্কিত বক্তব্য শেষ করছি।

মুয়াত্তা ইমাম মালিক গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে নিম্নলিখিত ভাষায়; হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

لَقِيْتُ بُصْرَةَ بْنَ أَبِيْ بُصْرَةَ الْغِفَارِيْ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ فَقُلْتُ مِنَ الطُّوْرِ فَقَالَ لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَاخَرَجْتَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تَعْمَلِ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، إِلَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِلَى مَسْجِدِيْ هٰذَا وَإِلَى مَسْجِدِ إِيْلِيَا أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَشُكُّ -

আমি বুসরা ইবনে আবূ গিফারীর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোত্থেকে এসেছ? বললাম, 'তুর' থেকে। তিনি বললেন ঃ তুরের দিকে যাওয়ার পূর্বে যদি তোমার সাথে আমার সাক্ষাত হতো, তাহলে তোমার আর যাওয়া হতো না। কেননা, নবী করীম (স)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ তোমরা মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ এবং মসজিদে ইলীয়া বা বায়তুল মুকাদ্দাস— এই তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোনো মসজিদের জন্যে সফরের আয়োজন করবে না।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রা) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

مَدْلُوْلُ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْ يَّكُوْنَ شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى غَيْرِهَا لِمَعْنَى الْقُرْبَةِ وَتَخَصُّصُ الْمَكَانِ مَنْهِيًّا عَنْهُ -

(المسوى من احديث الموطا: ط - ا، ص- ٧٣)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো জায়গার জন্যে আল্লাহর নৈকট্য (বা সওয়াব) লাভের নিয়্যতে সফর করা এবং কোনো জায়গাকে এ জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া নিষিদ্ধ।

এর কারণ বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِيْهِ السَّدُّ عَمَّا كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُهُ مِنْ اِخْتِرَاعِ مَوَاضِعَ يُعَظِّمُوْنَهَا بِرَأْيِهِمْ الخ (ايضا)

সম্ভবত এ নিষেধের মূল লক্ষ্য হলো লোকদেরকে সে কাজ থেকে বিরত রাখা, যা জাহিলিয়াতের জামানার লোকেরা করতো। যেমন— তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো এক একটি তাজীমের স্থান আবিষ্কার ও নির্দিষ্ট করে নিত।

তিনি এ হাদীসের ভিত্তিতে আরো লিখেছেন ঃ

اَقُوْلُ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْصِدُوْنَ مَوَاضِعَ مُعَظَّمَةً بِزَعْمِهِمْ يَزُوْرُنَهَا وَيَتَبَرَّكُوْنَ بِهَا، وَفِيْهِ مِنَ التَّحْرِيْفِ وَالْفَسَادِ مَالَا يَخْفِىْ فَسَدَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَسَادَ لِئَلَّا يَلْتَحِقَ غَيْرُ الشَّعَائِرِ بِالشَّعَائِرِ وَلِئَلَّا يَصِيْرَ ذَرِيْعَةً لِعِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ وَالْحَقُّ عِنْدِىْ اَنَّ الْقَبْرَ وَمَحَلَّ عِبَادَةِ وَلِيٍّ مِنْ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ وَالطُّوْرِ كُلُّ ذٰلِكَ سَوَاءٌ فِىْ النَّهْىِ - (حجة البالغة :ج -١، باب المساجد)

আমি বলবো, জাহিলিয়াতের জামানার লোকেরা নিজেদের কল্পনার ভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গাকে তাজীমের জায়গা বলে ধারণা করতো, তার যিয়ারত করতো, তা থেকে বরকত হাসিল করতো। তাতে করে মূল দ্বীন-ই বিকৃত হয়ে যেত, আর হতো নানা বিপর্যয়। এ কারণে আলোচ্য হাদীস দ্বারা নবী করীম (স) এ বিপর্যয়ের পথ বন্ধ করে দিলেন, যেন ইসলামের সুন্নাতী আদর্শ ও নিদর্শনাদি গায়র ইসলামী নিদর্শনের সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে না যায় এবং তা গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদতের পন্থা উদ্ভাবনের কারণ রূপে গৃহীত না হয়। আমার মতে হক কথা হলো এই যে কবর, কোনো অলী-আল্লাহ্‌র ইবাদতের জায়গা ও 'তুর'-এ সবই সমানভাবে এই নিষেধের মধ্যে গণ্য।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা কস্তলানী লিখেছেন ঃ

اُخْتُلِفَ فِىْ شَدِّ الرِّحَالِ اِلٰى غَيْرِ هَاكَالذِّهَابِ اِلٰى زِيَارَةِ الصَّالِحِيْنَ اَحْيَاءً وَ اَمْوَاتًا وَالْمَوَاضِعَ الْفَاضِلَةِ لِلصَّلٰوةِ فِيْهَا وَالتَّبَرُّكِ بِهَا فَقَالَ اَبُوْ مُحَمَّدِ نِ الْجُوَيْنِىْ

يَحْرُمُ عَمَلًا بِظَاهِرَا الْحَدِيْثِ وَاخْتَارَهُ قَاضِىْ حُسَيْنٌ وَقَالَ بِهٖ الْقَاضِىْ عِيَاضٌ وَطَائِفَةٌ - وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ اِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرِهٖ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الْجَوَازُ -

(القسطلا نى شرح البخارى)

এ তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য সব জায়গায় যাওয়ার জন্যে সফর করা— যেমন নেককার লোকদের জীবিত থাকা বা মরে যাওয়ার পর তাদের যিয়ারতের জন্য যাওয়া, সেখানে ইবাদত করা বা সেখান থেকে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে যাওয়া— এ সম্পর্কে আবু মুহাম্মদ জুয়েনী বলেন যে, বাহ্যত হাদীস অনুযায়ী আমল করা হলে এ সব হারাম হবে। কাযী হুসাইন, কাযী ইয়াজ ও অন্যান্য মনীষী এ মত-ই গ্রহণ করেছেন। তবে শাফিয়ী মাযহাবের ঈমামুল হারামইন প্রমুখের মতে এ কাজ জায়েয। (বলা বাহুল্য, একদিকে জায়েয অপর দিকে হারাম) হারাম থেকে বাঁচার জন্যে এ জায়েয মত গ্রহণ করা যেতে পারে না)।

মুল্লা আলী আল-কারী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اِلَى الْاِسْتِدْلَالِ بِهٖ عَلَى الْمَنْعِ مِنَالرِّحْلَةِ لِزِيَارَةِ الْمَشَاهِدِ وَقُبُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ -

(مرقاة)

কোনো কোনো আলিম এ হাদীসের দলীল দিয়ে বলেছেন যে, বরকতের জায়গা এবং আলিম ও নেককার লোক (অলী-পীর-দরবেশের) কবর যিয়ারতের জন্যে সফর করা নিষিদ্ধ।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দিহলভী (রহ) লিখেছেন ঃ

وَالْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ الْمَحْذُوْفُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اِمَّا جِنْسٌ قَرِيْبٌ اَوْجِنْسٌ بَعِيْدٌ فَعَلَى الْاَوَّلِ تَقْدِيْرُ الْكَلَامِ لَا تَشُدُّ الرِّحَالَ اِلَى الْمَسَاجِدِ اِلَّا اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ وَحِيْنَئِذٍ مَاسِوَى الْمَسَاجِدِ مَسْكُوْتٌ عَنْهُ وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِىْ لَا تَشُدُّ الرِّحَالِ اِلٰى مَوَاضِعَ يَتَقَرَّبُ بِهٖ اِلَّا اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ اِلٰى اٰخِرِهٖ فَحِيْنَئِذٍ شَدُّ الرِّحَالِ اِلٰى غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلٰثَةِ الْمُعَظَّمِ مَنْهِىٌّ عَنْهُ بِظَاهِرِ سِيَاقِ الْحَدِيْثِ -

(تعليق على البخارى)

এ হাদীসে তিনটি মসজিদকে কিসের থেকে আদালা করা হলো তা উহ্য রয়েছে। তা হয় নিকট জাতীয় কিছু হবে, না হয় দূর জাতীয় কিছু। নিকট জাতীয় কিছু হলে বাক্যের অর্থ হবে ঃ মসজিদগুলোর জন্যে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করা যাবে না; কিন্তু শুধু তিনটি মসজিদের জন্যে (করা যাবে) এরূপ অবস্থায় মসজিদ ছাড়া অন্য জায়গা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি মনে করতে হবে। আর যদি তা দূর জাতীয় হয়, তাহলে হাদীসের বক্তব্য হবে ঃ যে সব জায়গায় গিয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা উদ্দেশ্য, তার কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া যাবে না এ তিনটি মসজিদ ছাড়া। এ অর্থের দিক দিয়ে এ তিনটি বড় মসজিদ ছাড়া আর সব স্থানের জন্যেই সওয়াবের আশায় সফর করা নিষিদ্ধ হবে। বাহ্যত হাদীস থেকে এ কথাই বোঝা যায়।

তিনি কুরআনের তাফসীরে এ পর্যায়ে আরো লিখেছেন ঃ

وازہمین جاواضح شد سرتاکید بلیغ کہ حدیث شریف درنہی اززیارت قبو روازشدالرحال بسوئے موضع غیر ازمسا جدثلثه وازانکه قبو رانبیاء رامسا جد سازند واردشده مدعاہمین است که درین عمل اکثر جہال را اعتقادیکه مشرکیں رادر بزرگان خودبهم رسیده است بہم میر سد وتو جه الی الله محض باقی نماند مگر دربر ده حجاب آں ارواح – (تفسیر فتح العزیز)

এ থেকে কবর যিয়ারত করতে হাদীসে যে নিষেধ এসেছে এবং তিনটি বড় মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো জায়গার জন্যে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে যে নিষেধ করা হয়েছে, আর নবীগণের কবরকে মসজিদ বানানো নিষেধ করা হয়েছে। তার প্রকৃত কারণ দৃষ্ট হয়ে উঠে এই যে, এ কাজ থেকে অধিকাংশ জাহিল লোক মুশরিকরা তাদের বুজুর্গ লোকদের জন্যে যে আকীদা রাখে সেরূপ আকীদা গ্রহণ করতে পারে, আর কেবল আল্লাহ্‌র দিকেই মনযোগ নিবদ্ধ না-ও হতে পারে; হলেও তা এসব মরে যাওয়া লোকদের রূহের আবরণের মাধ্যমে হয় বলে তাদের আকীদা। এ জন্যে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল (রহ)-ও লিখেছেন ঃ

বুজুর্গ লোকদের কবর যিয়ারত করার নিয়্যত করে দুনিয়ার সব দিক থেকে সফরের কষ্ট ভোগ করেও দিনরাতের দুঃখ সহ্য করে আসে। এ সফরেও কষ্ট হয় বলে তা শির্‌ক-এর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে দিতে পারে এবং আল্লাহ্‌র অসন্তোষের জঙ্গলে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। জনগণ এ ধরনের সফর প্রায়ই

হজ্জের সফরের সমান কিংবা তার চাইতেও ভালো ও উত্তম সফর মনে করে, হজ্জের ইহরাম বাঁধার মতো জেনে শুনে বা না জেনে ইহরাম বাঁধে— এ কাজ কিছুতেই করা উচিত নয়।

সহীহ্ হাদীস, উহার ব্যাখ্যা এবং ইসলামের বিশেষজ্ঞ সলফে সালেহীনের পূর্বোদ্ধৃত মূল্যবান বাণীসমূহের ভিত্তিতে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কবর বা নির্দিষ্ট কোনো স্থানকে নিজেদের ইচ্ছেমতো 'পবিত্র' বরকতওয়ালা বা শরীফ ইত্যাদি মনে করা, তার যিয়ারত করার জন্যে এবং কবরস্থ অলী-পীর-দরবেশের নিকট প্রার্থনা বা তাকে অসীলা করার জন্যে বিদেশ সফর করা এবং সেখান থেকে বরকত হাসিল করতে চাওয়া— এ সবই জাহিলিয়াতের জমানার মুশরিক লোকদের কাজ, এ কাজ দ্বীন-ইসলামের সম্পূর্ণ খেলাফ। এতে যেমন আকীদার খারাবী দেখা দেয়, তেমনি আমলেরও। এ কারণে নবী করীম (স) এ ধরনের কাজ করতে এ হাদীস মারফত চিরদিনের তরে নিষেধ করে দিয়েছেন। অতএব বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় স্বকপোল কল্পিত মনগড়া পীর বা অলী-দরবেশের কবরকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হচ্ছে, আজমীর শরীফ, বাগদাদ শরীফ, দাতাগঞ্জবখশ, শর্ষিণা শরীফ, মাইজভান্ডার আর শুরেশ্বর শরীফ প্রভৃতি স্থানে যে ওরস এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়, আর দলে দলে সেখানে মূর্খ মুরীদরা একত্রিত হয় মরা পীরের কবর থেকে ফায়েজ লওয়ার উদ্দেশ্যে— তা সবই রাসূলের নির্দেশের সম্পূর্ণ খেলাফ, সুন্নাতের বিপরীত— এক সুস্পষ্ট বিদয়াত। আর পীর ভক্তির তীব্রতা ও আতিশয্যের কারণে অনেক ক্ষেত্রে তা-ই শির্ক-এ পরিণত হয়।

এমন কি, মক্কার কাবা ঘরের হজ্জ করতে গিয়ে মদীনায় যাওয়া যারা বাধ্যতামূলক মনে করেন, তাদের উচিত মসজিদে নববীতে নামায পড়ার নিয়্যতে সফর করবে, শুধু রাসূলের কবরে সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে সফর করা উচিত নয়।

এ সব অকাট্য দলীলের মুকাবিলায় বিদয়াতীদের কথাবার্তা পেশ করে পীর-মুরিদী মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে দেরী নেই মোটেও।

আল্লাহ্ এই বিদয়াতীদের হেদায়েত করুন।

ইস্তেমদাদে রূহানী

কবর যিয়ারত সম্পর্কে উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা পাঠ করার পর কারো মনেই সন্দেহ থাকতে পারে না যে, কবরস্থানে গিয়ে তাদের জন্যে দো'আ করা ছাড়া আর কোনো কাজ করা। কবরস্থ লোকদের নিকট নিজেদের কোনো মনোবেদনা জানাতে চেষ্টা করা, কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্যে তাদের সাহায্য

প্রার্থনা করা কিংবা তাদের কাছ থেকে রূহানী ফায়েজ হাসিল করতে চেষ্টা করা সম্পূর্ণ শির্ক। মূলত এ সেই কাজ, যা মুশরিকরা করে তাদের মনগড়া দেব-দেবী ও মাবুদদের নিকট। এ পর্যায়ে তাফসীরে জামেউত তাফসীর-এর সূরা ফাতির-এর তাফসীর থেকে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা একান্তই জরুরী। ঘটনাটি হযরত শাহ ইসহাক দিহলভী ইমাম আবু হানীফা (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এরূপ ঃ

ইমাম আবু হানীফা দেখলেন, এক ব্যক্তি নেক লোকদের কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে সালাম করছে, তাদের সম্বোধন করে বলছে ঃ

يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ هَلْ لَكُمْ مِنْ خَبَرٍ وَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ اَثَرٍ ؟ اِنِّىْ اَتَيْتُكُمْ وَنَادَيْتُكُمْ مِنْ شُهُوْرٍ وَ لَيْسَ سُوَالِىْ مِنْكُمْ اِلَّا الدُّعَاءَ فَهَلْ دَرَيْتُمْ اَمْ غَفَلْتُمْ -

হে কবরবাসীরা! তোমাদের কি কোনো খবর আছে ? তোমাদের আছে কোনো ক্ষমতা ? আমি তো তোমাদের কাছে কয়েক মাস ধরে আসছি, তোমাদের ডাকাডাকি করছি। তোমাদের নিকট আমার জন্য কোনো প্রার্থনা ছিল না, ছিল শুধু দো'আর প্রার্থনা। কিন্তু তোমরা কি কিছু টের পেয়েছ, না একেবারে গাফিল হয়ে পড়ে রয়েছ ?

এ কথা ইমাম আবু হানীফা (রহ) শুনতে পেলেন। তিনি লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস কলেন ঃ هَلْ اَجَابُوْاَلَكَ —কবরস্থ লোকেরা কি তোমার ডাকের কোনো জবাব দিলো ? লোকটি বলল ঃ না, কোনো জবাবই পাইনি। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বললেন ঃ

سُحْقًا وَتَرِبَتْ يَدَاكَ كَيْفَ تُكَلِّمُ اَجْسَادٌ الايَسْتَطِيْعُوْنَ جُوَابًا وَلَايَمْلِكُوْنَ صَوْتًا وَقَرءً- وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِىْ الْقُبُوْرِ -

বড় দুঃখ, বড় লজ্জার বিষয়, তোমার দু'টো হাতই ধ্বংস হয়ে যাক। তুমি এমন সব দেহকে লক্ষ্য করে কথা বলছো যারা কোনো জবাবই দিতে পারে না, যাদের কোনো কিছুই করবার ক্ষমতা নেই, (এমন কি) কোনো আওয়াজও যারা শুনতে পায় না। অতঃপর তিনি পড়লেন (সূরা ফাতির-এর ২২ নং আয়াত) ঃ তুমি শোনাতে পারবে না তাদের, যারা কবরে রয়েছে।

(جامع التقسير مصنفه نواب قطب الدين شارح مشكوة مظا هرحق، تعليمات مجدديه - ٣٩٥ غرابك فى تحقيق المذاهب)

ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর এই উক্তি প্রমাণ করে যে, তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, অলী ও নেক লোকদের কবরে গিয়ে তাদের সম্বোধন করে কথা বলা বা কিছুর জন্য প্রার্থনা করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। দ্বিতীয়— মৃত ব্যক্তি শুনে না, জবাবও দিতে পারে না। ভক্তদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা, নিঃসন্তানকে সন্তান দান করা বা চাকুরী-ব্যবসা ইত্যাদিতে উন্নতি দান করার কোনো সাধ্যই তাদের নেই— থাকতে পারে না।

ইমাম আবু হানীফা'র এই মতে কুরআনের ঘোষণার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান মুশরিকরা হযরত ঈসা, হযরত উজাইর ও ফেরেশতাদের ডাকত। তাদের নিকট সাহায্য চাইত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন ঃ

فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا -

না, ওরা তোমাদের বিপদ দূর করতে এবং তোমাদের জন্য আসা বিপদকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে কস্মিনকালেও পারবে না।

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের একটি আয়াত বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ - (الاحقاف : ٥)

যে লোক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে সে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকের জবাব দেবে না, তার চাইতে অধিক গুমরাহ্ আর কে হতে পারে? ওরা তো তাদের দো'আ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত।

এ পর্যায়ে সঠিক মসলা জানবার জন্যে সর্বপ্রথম দেখতে হবে কুরআন মজীদে স্বয়ং নবী করীম (স)-এর কি মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে। নবী করীমের যে মর্যাদা কুরআনে ঘোষিত হয়েছে— এ পর্যায়ে আকীদা ঠিক করার জন্যে সুন্নাতের সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্যে— তাই হবে ভিত্তি। কুরআনের পাঠক মাত্রই জানেন, কুরআন মজীদে স্বয়ং রাসূলের জবানীতে তাঁর নিজের মর্যাদা নানা স্থানে ঘোষিত হয়েছে। এ পর্যায়ের একটি আয়াত হচ্ছে এই ঃ

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -

(الاعراف : ١٨٨)

বলো হে নবী! আমি আমার নিজের জন্যে কোনো কল্যাণের ওপর কর্তৃত্বশালী নই, না কোনো ক্ষতির ওপর। তবে শুধু তা-ই এর বাইরে, যা আল্লাহ চাইবেন। আর আমি যদি গায়েব জানতাম, তাহলে আমি নিশ্চয়ই অনেক বেশি বেশি কল্যাণ লাভ করে নিতাম এবং আমাকে কোনো দুঃখ বা কষ্টই স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো শুধু ভয় প্রদর্শনকারী, শুধু সংবাদদাতা ঈমানদার লোকদের জন্যে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী লিখেছেন ঃ

اَلْمَفْهُوْمُ مِنَ الْاٰيَةِ نَفْىُ عِلْمِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةَ وَلسَّلَامُ اِذْ ذَاكَ بِالْغَيْبِ الْمُفِيْدِ لِجَلْبِ الْمَنَافِعِ وَ دَفْعِ الْمُضَارِّ الَّتِىْ لَاعِلَاقَةَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْاَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ وَمَا يَعْلَمُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغُيُوْبِ مِنْ ذٰلِكَ النَّوْعِ وَعَدَمُ الْعِلْمِ بِهٖ مِمَّا لَا يُطْعَنُ فِىْ مَنْصَبِهِ الْجَلِيْلِ - (تفسير روح المعانى :ج- ۹ ، ص - ۱۳۲)

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, নবী করীম (স) সে গায়েবের জ্ঞান জানেন না, যা ফায়দা লাভ ও ক্ষতির প্রতিরোধের জন্যে অনুকূল। কেননা তার সাথে এবং দ্বীনী হুকুম-আহকাম ও শরীয়তের বিধানের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এ জন্যে এ ধরনের গায়েবী জ্ঞান নবী করীম (স) জানেন না। আর এ জ্ঞান না-জানা তাঁর নবুয়্যতের মহান মর্যাদার পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতিকর বা দোষের নয়।

এ পর্যায়ে গায়েবী ইল্‌ম যে রাসূলের নেই, তা একটি বাস্তব ঘটনা থেকেও প্রমাণিত হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ লোকেরা খেজুর গাছের স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে মিলন ঘটাত। নবী করীম (স) বললেন ঃ এ কাজ যদি তোমরা না করো, তাহলে ভালোই হয়। কিন্তু পরবর্তী ফসল কালে তারা এ কাজ না করার দরুন খেজুরের ভালো ফসল ফললো না। এ কথা শুনে নবী করীম (স) বললেন ঃ 'তোমাদের এ সব বৈষয়িক ব্যাপার তোমরাই ভালো জানো অপর বর্ণনায় কথাটি এভাবে বলা হয়েছে ঃ 'দেখ, ব্যাপার যদি তোমাদের বৈষয়িক সংক্রান্ত হয়, তবে তা তোমাদের ব্যাপার। আর যদি দ্বীন সংক্রান্ত হয়, তাহলে তা আমার আওতাভুক্ত।

হানাফী মাযহাব সমর্থিত আকীদায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, নবী করীম (স) গায়েব জানতেন—এরূপ আকীদা যদি কেউ পোষণ করে, তবে সে হবে

সুস্পষ্ট কাফির। কেননা এরূপ আকীদা কুরআনের (পূর্বোদ্ধৃত এবং) এ আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আয়াতটি হলো ঃ

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ - (النمل : ٦٥)

বলো, আসমান-জমিনের কেউ-ই গায়েব জানে না আল্লাহ ছাড়া।

অর্থাৎ যা কিছু মানুষের অনুভূতি ও জ্ঞানের আওতার মধ্যের ব্যাপার নয় তা আসমান-জমিনের সমগ্র সৃষ্টিলোকের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই জানে না— জানতে পারে না।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

مَنْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدً اصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ النَّاس بِمَا يَكُوْنَ فِيْ غَدٍ - اَوْ يَعْلَمُ مَافِيْ غَدٍ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الْفِرْيَةَ - (روح المعانى - ج ٢٠ص)

যে লোক ধারণা করবে যে, মুহাম্মদ (স) লোকদের সে সব বৈষয়িক বিষয়ে খবর দেন বা জানেন, যা কাল ঘটবে, তবে সে আল্লাহ্র ওপর একটি অতি বড় মিথ্য আরোপ করে দিলো।

গায়েব জানা সম্পর্কিত এ সব অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীলসমূহের ভিত্তিতে বলা যায়, নবী করীম (স)-ই যখন গায়েব জানতেন না, তখন কোনো পীর-অলী-দরবেশের পক্ষে গায়ব জানার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। যদি কেউ তা মনে করে, তবে তা হবে আকীদার ক্ষেত্রে এক মহা শির্ক, কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণাবলীর সম্পূর্ণ খেলাফ এবং সুন্নাতী আকীদার বিপরীত এক সুস্পষ্ট বিদয়াত।

অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটানোর বিদয়াত

বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। এ সবের ওপর কর্তৃত্বও চলে একমাত্র আল্লাহ্রই। তিনি ছাড়া এ দুনিয়ায় অপর কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই। মানুষ জীবিত থাকা অবস্থায় শুধু ততটুকুই করতে পারে, যা করার অবকাশ রেখেছেন আল্লাহ্ তা'আলা। সে অবকাশও অসীম নয়, অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে আল্লাহ যাকে যা করার ক্ষমতা দান করেন, সে তা ততটুকুই করতে পারে, যতটুকু করার অনুমতি আল্লাহ দান করবেন। এ কারণে বলা যায়, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের এ ধরনের কিছু কিছু কাজ করার অনুমতি দেন কখনো কখনো, যে ধরনের কাজকে আমরা 'অলৌকিক কাজ' বলে থাকি। এর কতগুলো কাজ এমন, যা নবী রাসূলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলোকেই ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় 'মুজিযা'। নবী-রাসূলগণের মুজিযা সত্য। নবীর নবুয়্যতির সত্যতা প্রমাণের ব্যাপারে তা হয় এক অকাট্য দলীল। কিন্তু এ 'মুজিযা' অনুষ্ঠিত হয় সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের জন্যে, কোনো কোনো বিশেষ ফায়দায় পৌঁছাবার জন্য এবং তা হয় স্বয়ং আল্লাহ্র কুদরতে ও ইচ্ছায়, নবী-রাসূলের ইচ্ছায় নয়। তা করার ক্ষমতা নবী-রাসূলের নিজস্ব নয়, কেবল মাত্র আল্লাহ্রই দেয়া ক্ষমতা।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য নবী ও রাসূলগণকে যেমন মুজিয়া ও অকাট্য প্রমাণাদি দিয়েছেন তাঁদের নবুয়্যতের অকাট্যতা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে, তেমনি হযরত ঈসা (আ)-কেও বহু অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ঘটানর শক্তি দান করেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টানরা সেই সব নিদর্শন দেখে মনে করে নিয়েছে যে, এই সব করার ক্ষমতা স্বয়ং হযরত ঈসা (আ)-এর নিজস্ব এবং এই ক্ষমতা ও শক্তি ঠিক আল্লাহ্র ক্ষমতা ও শক্তি। এই কারণে সে মূর্খেরা মনে করেছে যে— নাউজুবিল্লাহ— মহান আল্লাহ্ই বুঝি হযরত ঈসার মধ্যে লীন হয়ে গেছেন। এক্ষণে আল্লাহ্ ও ঈসা অভিন্ন সত্তায় পরিণত, আল্লাহ্ ঈসা একাকার। আর এ-ই হচ্ছে খ্রিস্টানদের শির্কী আকীদা গ্রহণের মূলতত্ত্ব।

মুসলমানদের মধ্যে অলী-আল্লাহ নামে পরিচিত ব্যক্তিদের সম্পর্কেও ভক্তির আতিশয্যে— চরম মূর্খতার কারণে— মনে করেছে যে, আল্লাহ বুঝি তাদের মুঠোর মধ্যে এসে গেছেন; কিংবা তারা আল্লাহ (নাউজুবিল্লাহ্) হয়ে গেছেন বলেই তো তারা অসাধ্য সাধন করতে ও অস্বাভাবিক-অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটাবার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসেছেন। এও ঠিক শির্কে নিমজ্জিত

খ্রিস্টানদের মতো চরম মূর্খতারই পরিণতি। খ্রিস্টানরা যেমন বুঝেনি যে, হযরত ঈসা (আ)-এর যা কিছু ক্ষমতা, তা নবী হিসেবেই আল্লাহ্‌র দেয়া, তার নিজের কিছুই নয়, তেমনি মুসলমানদের মধ্যকার এই মূর্খ লোকেরাও বুঝেনা— বুঝতে প্রস্তুতই নয় যে, তারা যাদেরকে অলী-আল্লাহ্ বলে মনে করে প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্‌র অলী না-ও হতে পারে। আর হলেও অলৌকিক কিছু করার, আল্লাহ্‌র চলমান ও সদা কার্যকর স্বাভাবিক নিয়ম বিধান রদ-বদল করার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই। ওরাও ঠিক এই কারণেই খ্রিস্টানদের মতোই চরম শির্কের মধ্যে ডুবে আছে।

কিন্তু নবী-রাসূল ছাড়া অন্য মানুষের দ্বারা যদি কিছু অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়, তবে তা তিন প্রকারের হতে পারে ঃ

১. তা দ্বারা যদি কোনো দ্বীনী ফায়দা হয়, তবে তা নেক আমলসমূহের মধ্যে গণ্য।

২. যদি তা থেকে কোনো বৈধ ব্যাপার ঘটে, তবে তা আল্লাহ্‌র দেয়া এক বৈষয়িক নিয়ামত। সে জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উচিত আল্লাহ্‌র শোকর করা।

৩. অস্বাভাবিক ঘটনা যদি এমন কিছু ঘটে বা হারামের পর্যায়ে পড়ে যায়, তবে তা হবে আল্লাহ্‌র আযাবের কারণ। তার ফলে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ফেটে পড়ে।

মনে রাখতে হবে, অস্বাভাবিক ঘটনা দুনিয়ায় যেমন নেক বান্দাদেরকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়, তেমনি হয় অন্যান্য লোকদেরকে কেন্দ্র করেও। অতএব তা যেমন দ্বীনের দৃষ্টিতে ভালোও নয়, তেমনি মন্দও নয়। কিন্তু এমনও হয়, যা না ভালো, না মন্দ।

নেক লোকদেরকে কেন্দ্র করে তেমন কিছু ঘটলে তা যেমন তার নিজের গৌরবের কোনো বিষয় নয়, তেমনি তা-ই নয় তার বুজুর্গীর কোনো প্রমাণ। আর যাকে কেন্দ্র করেই এমন কিছু ঘটবে, তাকেই যে অলৌকিক ক্ষমতার মালিক মনে করতে হবে, মনে করতে হবে তাকে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা, তার কোনো দলীলই কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না।

কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে কে আল্লাহ্‌র অলী, কে তাঁর প্রিয় ব্যক্তি, নিম্নোক্ত আয়াত থেকে তা জানতে পারা যায়। ইরশাদ করেছেন ঃ

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ –

(يونس ٦٢-٦٣)

জেনে রেখো, আল্লাহ 'অলী' লোকদের কোনো ভয় নেই, নেই তাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ। এরা সেই লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) হাদীসে কুদসী বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্র-এ কথাটি বলেছেন ঃ

وَمَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِىْ بِالْمُحَارَبَةِ وَ مَا تَقَرَّبَ اِلَى عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَ لَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَ بَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَ يَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا فَبِىْ يَسْمَعُ وَبِىْ يُبْصِرُ وَبِىْ يَبْطِشُ وَبِىْ يَمْشِىْ - (بخارى)

যে লোক আমার 'অলীর' সঙ্গে শত্রুতা করবে, সে আমার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। বান্দার ওপর আমি যেসব ফরয ধার্য করে দিয়েছি কেবল সেগুলো আদায় করেই আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে— এ-ই আমার নিকট অধিক প্রিয়। নফল কাজ করেও বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আর আমি যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করি, তখন আমি তার সেই কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনে, সেই চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা দেখে, সেই হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে, সেই পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে। অতএব সে আমার দ্বারাই শুনে, আমার দ্বারাই দেখে, আমার দ্বারাই ধরে, আমার দ্বারাই চলে।

কুরআনের আয়াত এবং হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, অলী-আল্লাহ্ সেই হয় এবং তাকেই বলা যায়, যে মুমিন হবে এবং মুত্তাকী হবে! ঈমান ও তাকওয়া হওয়ার মানে পূর্ণ ঈমান এবং নির্ভুল-নির্ভেজাল তাকওয়া। আর হাদীস থেকে জানা গেল যে, সে হবে আল্লাহ্র আরোপিত ফরযসমূহের যথাযথ পালনকারী। কিন্তু সেই সঙ্গে তার যে কারামত হতে হবে এমন কথা না কুরআনে আছে, না হাদীসে। কুরআনের উক্ত আয়াতের পরবর্তী কথায় এই কারামতের কথা নেই। যা আছে তা হলো এই ঃ

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -

তাদের জন্যে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালের।

بُشْرٰى বা সুসংবাদ বলতে মূলত বোঝায় ঃ

اَلْخَبَرُ بِمَا يَظْهَرُ السُّرُوْرُ فِىْ بَشَرَةِ الْوَجْهِ وَ مِثْلُهَا الْبَشَارَةُ وَتُطْلَقُ عَلَى الْمُبَشَّرِ بِهِ مِنْ ذٰلِكَ -

بُشْرٰى মানে এমন খবর, যা শুনলে মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠে। এ থেকেই হচ্ছে বাশারাত— মানে সুসংবাদ। আর যে খবর দিলে এরূপ আনন্দ লাভ হয় তাকেও بشرى বলা যায়। আর এর সঠিক তাৎপর্য এই ঃ

لَهُمُ الْبُشْرٰى حَالَ كَوْنِهَا فِىْ الدُّنْيَا وَحَالَ كَوْنِهَا فِىْ الْاٰخِرَةِ اَىْ عَاجِلَةً وَاٰجِلَةً -

তাদের জন্যে সুসংবাদ তারা দুনিয়ায় থাকতেও এবং পরকালে চলে গেলেও। অর্থাৎ নগদ এবং বাকী উভয় ধরনেই।

আল্লামা আলূসী লিখেছেন ঃ

وَالثَّابِتُ فِىْ اَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ اَنَّ الْبُشْرٰى فِىْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هِىَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ الَّتِىْ هِىَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَّ اَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ - (روح المعانى ج ١١ ص ١٥١)

বহু সংখ্যক হাদীসের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের এ بشرى শব্দের অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে ভাল ও শুভ স্বপ্ন, যা নবুয়্যতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

রাসূল (স)-নিজের কথা থেকেই এ তাফসীর জানা গেছে অকাট্যভাবে। আর পরকালের ব্যাপারে তা হচ্ছে ঃ

بَشَارَةُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمَوْتِ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَلَكَ وَلِمَنْ حَمَلَكَ اِلٰى قَبْرِكَ - (اخرجه ابن ابى الدنيا وابو الشيخ وابو القاسم ابن منده من طريق الى جعفر عن جابر)

মুমিনকে মৃত্যুর মুহূর্তে সুসংবাদ দেয়া হবে যে, আল্লাহ তোমাকে এবং তোমাকে যারা তোমার কবর পর্যন্ত বহন করে নেবে তাদের মাফ করে দিয়েছেন।

আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা থেকেও জানা যায়, যার মানে হচ্ছে বেহেশত। (اخرج ابن جرير عن ابى هريرة مرفوعًا)

আর আতা থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ الْبُشْرٰى فِىْ الدُّنْيَا اَنْ يَّاْ تِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِالرَّحْمَةِ ..... وَ اَنَّ الْبُشْرٰى فِى الْاٰخِرَةِ فَتَلَقَّى الْمَلاَئِكَةُ اِيَّاهُمْ مُسْلِمِيْنَ مُبَشِّرِيْنَ بِالْفَوْزِ وَالْكَرَامَةِ وَ مَايَرَوْنَ مِنْ بَيَاضِ وُجُوْهِهِمْ وَاِعْطَاءِ الصَّحَائِف بِاَيْمَانِهِمْ وَيَقْرَءُوْنَ مِنْهَا وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْبَشَارَاتِ - (روح المعانى : ج -١١، ص -١٥٣)

দুনিয়ায় بشرى হচ্ছে এই যে, ফেরেশতারা মৃত্যুর সময় তাদের নিকট রহমত নিয়ে আসবেন। আর পরকালীন بشرى হচ্ছে এই যে, তখন ফেরেশতাগণ এ সব মুসলমানদের নিকট তাদের সাফল্য ও সম্মান-মর্যাদার সুসংবাদ বহন করে নিয়ে আসবেন। তারা তাদের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল দেখতে পাবেন এবং তাদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে, তারা তা পড়বে ইত্যাদি পর্যায়ের সুসংবাদ।

তাহলে অলী-আল্লাহ্দের যে কোনো কারামত লাভ হবে, যা নিয়ে এখানকার সময়ে সত্য পীরেরা ও মিথ্যা পীরেরা দাবি করছে এবং অন্ধ-অজ্ঞ মুরীদদের এ সব আজগুবী কথাবার্তা বলে সাচ্চা পীর আর ভণ্ড পীরের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট করে তোলা হচ্ছে।

অলী-আল্লাহ্দের জন্যে আল্লাহ্র এ সব দান বাস্তবিকই আল্লাহ্র অতি বড় অনুগ্রহ। কিন্তু সে অনুগ্রহ ব্যক্তিগতভাবে তাদের জন্যে। কেউ তা লাভ করে থাকলে তার উচিত আল্লাহ্র শোকর আদায় করা। কিন্তু তার প্রচারণার মারফতে পীর-মুরীদি ব্যবসা চালানর লিল্লাহিয়াতের কোনো প্রমাণ মেলে কি ? আকায়িদের কিতাবে যে কারামতের কথা বলা হয়েছে, তা হলো এগুলো। কারামত মানে সম্মান-মর্যাদা; আর এগুলোও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া সম্মান-মর্যাদা এবং কুরআন-হাদীসের ঘোষণায় প্রমাণিত এ সব কারামতকে কোনো মুসলমান অস্বীকার করতে পারে ! কিন্তু এখানে কারামতের কথা বলা হচ্ছে, তা এসব নয়। তা হলো কোন পীর বা অলী আল্লাহ্ কোনো অঘটন ঘটিয়েছে, কোনো অস্বাভাবিক কাজ সাধন করে মুরীদদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে, কে শূন্যে উড়ে গেছে, কে পানির ওপর দিয়ে পায়ে হেটে সমুদ্র পার হয়েছে, কে জেলখানার বন্দী থাকা অবস্থায়ও প্রতিদিন কাবায় গিয়ে নামায পড়েছে, এ সব প্রচারণার মানে কি ? এসব যে একেবারে ফাঁকা বুলি, কেবল অজ্ঞ-মূর্খদের জন্যেই তা বলা হয়, তাদের মধ্যেই তা প্রচার করা হয়, এটা যে-কোনো সুস্থ বুদ্ধির মানুষই স্বীকার করবেন।

মোটকথা, অলী-আল্লাহ্ হলেই যে তার কারামত— মানে অলৌকিক ঘটনা ঘটাবার ক্ষমতা থাকতে হবে, কারো 'কারামত' হলেই যে সে অলী-আল্লাহ্ গণ্য হবে আর কারামত না হলে তাকে অলী-আল্লাহ্ মনে করা যাবে না, সব কথাই ভিত্তিহীন। কুরআন হাদীসে এসব কথার কোনোই দলীল নেই।

মূর্খ পীরেরা ততোধিক মূর্খ মুরীদদের সামনে নিজেদের যে সব 'কারামত' জাহির করে, প্রকাশ করে যেসব অলৌকিক (?) কাণ্ড-কারখানা কিংবা মৃত্যুর পরও তারা অলৌকিকভাবে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার এবং সমাজের কাজে-কর্মে কোনোরূপ 'তাসাররুফ' করে বা করতে পারে কিংবা শায়খদের রূহ হাযির হয়, দুনিয়ার অবস্থা জানে, শুনে ইত্যাদি বলে যে দাবি করা হচ্ছে, সেগুলো সুস্পষ্টভাবে কুফরি ও শির্কী কথাবার্তা ছাড়া আর কি হতে পারে! এ ক্ষমতা স্বয়ং রাসূলকেও দেয়া হয়নি। এ পর্যায়ে কয়েকটি দলীলের উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

مَنْ قَالَ اَنَّ اَرْوَاحَ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ يَكْفُرُ - (بزازية)

যে বলবে— বিশ্বাস করবে— যে, মৃত পীরদের রূহ সমাজের নিকট হাজির হতে পারে এবং তাঁরা সবকিছু জানতে পারে, সে কুফরি কথা বলছে, সে কাফির হয়ে যাবে।

মুল্লা আলী-আল-কারী লিখেছেন ঃ

ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ تَصْرِيْحًا بِالتَّكْفِيْرِ بِاعْتِقَادِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِمُعَارَضَتِهِ قَوْلَهُ تَعَالٰى قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ - (شرح فقه اكبر)

হানাফী ইমামগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ নবী করীম (স) গায়েব জানেন—এরূপ আকীদা যে রাখে, সে কাফির। কেননা এরূপ আকীদা কুরআনের ঘোষণা 'আল্লাহ ছাড়া আসমান-জমিনের কেউই গায়েব জানে না' এর বিপরীত।[১]

---

১. قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ -

আয়াতের অর্থ হলোঃ যে সব বিষয় মানুষের অনুভূতি শক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিধির বাইরে অবস্থিত গায়েব, তা আসমান-জমিনের গোটা সৃষ্টিলোকের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। ইমাম ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

وَمِنْهَا اِنْ ظَنَّ اَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّفُ فِى الْاُمُوْرِ دُوْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ اِعْتِقَادُهٗ ذٰلِكَ كُفْرٌ -

(بحرالرئق ج -۲)

এমনিভাবে যে লোক বিশ্বাস করবে যে, মৃত লোকেরা দুনিয়ার ব্যাপারে 'তাসাররুফ' করে— (নিজেদের ইচ্ছামতো কোনো কার্য সম্পাদন ও ঘটনা সংঘটিত করে), আল্লাহ্ ছাড়া এরূপ আকীদা রাখা কুফরী।

বিবাহে যে লোক আল্লাহ্র রাসূল (স)-কে সাক্ষী বানায় ঃ তাকে হানাফী ফিকাহ্র কিতাবে কাফির বলা হয়েছে। কেননা সে এ কাজ রাসূলে করীমকে 'আলিমুল গায়েব' মনে করেই করেছে। (فاضى خان بحواله احسن الفتاوى:ص ۲۵)

কবরস্থানে যে শির্ক বিদয়াত অনুষ্ঠিত হয়, তার বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদে আলফেসানী আজীবন জিহাদ করেছেন। এ পর্যায়ে তিনি যা লিখেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

وَاِسْتِمْدَادْاز اصنام وطاغوت دررفع امراض واسقام كه درجهله اهل اسلام شائع گشت است، عين شرك وضلال است وطلب حوا ئج ازسنگهائے تراشيده وناتر شيده نفس كفر وانكار از واجب الوجو د تعالى وتقدس قال اللّٰهُ تَعَالٰى تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِشِكَايَةِ عَنْ حَالِ بَعْضِ اَهْلِ الضَّلَالِ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَا كَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا

يَقُوْلُ تَعَالٰى اٰمِرًارَسُوْلَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّقُوْلَ مُعَلِّمًا لِجَمِيْعِ الْخَلْقِ اَنَّهٗ لَا يَعْلَمُ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ -

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের শিক্ষা দান প্রসঙ্গে যেন বলে দেন যে, আসমান-জমিনের অধিবাসীদের মধ্যে কেউই গায়েব জানেন না— জানেন কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

অতঃপর লিখেছেন ঃ

وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى اِلَّا اللّٰهُ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ اَىْ لَا يَعْلَمُ اَحَدٌ ذٰلِكَ اِلَّا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّهُ الْمُنْفَرِدُ بِذٰلِكَ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ -

আল্লাহ্র কথা— 'আল্লাহ ছাড়া' পূর্ব কথা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে আলাদ করা হয়েছে। তার মানে হলো এই যে, গায়েব আল্লাহ্ ছাড়া কেউই জানে না। কেননা এ ব্যাপারে তিনি এক ও একক, এ ব্যাপারে তাঁর কেউই শরীক নেই।.(تفسير القران العظيم :ج -۳ ،ص -۳۷۲)

اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا - اكثرزنان بواسطۀ كمال جهل كه دارند باين استمدا دممنوع مبتلا اند وطلب دفع بليه ازين اسمائے بے مسمى مى نما يند وبادائے بر سم اہل شرك گر فتار اند على الخو صن اين معنى ازنيك ويد ايشاندروقت عروض مرض جدوى كه درزبان ہذيه به سيتله معوف است ومحسوس اسب كم زنے باشد كه ازدقائق اين شرك خالى بود وبرسمے ازرسوم ان اقدام ننمايد الا من عصمها الله تعالى - (مكتوبات شيخ مجدد دفتر سوم مكتوب - ٤١)

রোগ-শোক দূর করার ব্যাপারে মূর্তি দেব-দেবী ও বাতিল মা'বুদের নিকট সাহায্য চাওয়া, যা জাহিল মুসলমানদের মধ্যে রেওয়াজ পেয়ে গেছে— একেবারেই শির্ক ও গোমরাহী। নির্মিত ও অনির্মিত পাথরের নিকট নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে দো'আ করা মহান আল্লাহ্‌কে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করার সমান এবং একেবারেই কুফরী। আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো গোমরাহ লোকদের অবস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তারা নিজের ব্যাপারসমূহকে তাগুতী শক্তির নিকট পেশ করতে ইচ্ছা করে, অথচ আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, এ সব তাগুতি শক্তিকে অস্বীকার করতে হবে। আর শয়তান তাদের বিভ্রান্ত করে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করতে চায়।

অনেক মেয়েলোক চরম অজ্ঞতা বশত এ ধরণের সাহায্য প্রার্থনায় লিপ্ত হয়। কতক অলীক নামের কাছে রোগ শোক বিপদাপদ হতে মুক্তি চায়। তাতে মুশরিকদের রসম-রেওয়াজ জড়িত। বিশেষ করে যখন বসন্ত রোগ— ভারতে যা শীতলা বলে পরিচিত— দেখা দেয়, তখন ভালো-মন্দ সব মেয়েলোককেই এই সাধারণ মূর্খতা ও কুফরী কাজে নিমজ্জিত দেখা যায়। খুব কম মেয়েলোকই এই সূক্ষ্ম শির্ক থেকে রক্ষা পেয়েছে, আর এতদসংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদিতে শরীক হয় নি— অবশ্য আল্লাহ যাকে বাঁচিয়েছেন, সেই বেঁচেছে— এমন লোক নেই বললেও চলে।

বর্তমানকালে অলী-আল্লাহ বলে কথিত লোকদের কবরে যা কিছু ঘটছে, ঘটছে বিশেষ পীরের বিশেষ মুরীদরা জীবিত পীরের দরবারে বা মৃত পীরের কবরে গিয়ে যা কিছু করছে, তার কাছ থেকে রূহানী ফায়েজ হাসিল করছে, বিপদে-আপদে সাহায্য প্রার্থনা করছে, তা যে সম্পূর্ণরূপে শির্কী কাজ এবং মুসলিম সমাজে তা যে শির্ক-এর বিদ্‌য়াত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর কথার পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অথচ বড়ই আফসোস, তারই

পরবর্তীকালে মুরীদ ও তস্য মুরীদরা আজ ঠিক সেই সব কাজই করছে এবং তা সত্ত্বেও 'আহলে সুন্নাত আল-জামা'আত' হওয়ার দাবি করছে। মুজাদ্দিদে আলফেসানীর উপরোক্ত যুক্তিপূর্ণ কথার আলোকে এদেরকে 'আহলে সুন্নাত না বলে বরং বলা যায় আহলে সুন্নাত আল-বিদয়াত। মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ) এ ধরনের কাজকে স্পষ্ট ভাষায় শির্কী কাজ এবং এই লোকদেরকে মুশরিক বলে অভিহিত করেছেন। কেননা এ কাজ কেবল মুশরিকদের দ্বারাই সম্ভব। মুশরিক লোকেরা এ ধরনের কাজ করে বলেই তো তারা মুশরিক। এ ধরনের কাজ না করলে তো তারা নিশ্চয়ই মুশরিক হতো না। তাহলে এক শ্রেণীর মুসলিম বা পীর-আলিম নামধারী লোকেরা যদি এরূপ কাজ করে, তবে তা কোনো শির্কী কাজ হবে না এবং তারাই বা আল্লাহ্র দরবারে 'মুশরিক' রূপে নিন্দিত হবে না কেন ? দীর্ঘ আলোচনার শেষ পর্যায়ে এ কালের পীর-মুরীদ এবং 'অলী-আল্লাহ' বলে কথিত লোকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ)-এর নসীহত, যা তিনি করেছিলেন তদানীন্তন বিদয়াতী পীরদের প্রতি—তা হলো ঃ

صوفیا ئے وقت نیز اگر بر سرانصاف بیا یند وضعف اسلام وافشائے کذب ملا حظ کنند باید کہ ماورائے سنت تقلید پیران خو دنکنند وامور مخترعہ رابہانہ عمل شیوخ دیدن خود نگیر ند اتباع سنت البتہ منجی است ومثمر خیرات وبرکات ودرتقلید غیر سنت خطر درخطراست - (دفتر دوم مکتوب -۲۳)

এ কালের তাসাউফপন্থীরা যদি ইনসাফ করে এবং ইসলামের দুর্বল অবস্থা ও মিথ্যার ব্যাপক রূপ লক্ষ্য করে তাহলে তাদের উচিত সুন্নাতের বাইরে নিজেদের পীরদের পায়রুবী না করা। আর মনগড়া বিষয়গুলোকে নিজেদের পীরদেরকে আমল করতে দেখার দোহাই দিয়ে অনুসরণ না করা। বস্তুত নবী করীম (স)-এর সুন্নাত অনুসরণ করে চলা নিঃসন্দেহে মুক্তির বাহন, ভালো ও মঙ্গলময় ফলের উৎস। সুন্নাতের বাইরের বিষয় অন্ধভাবে মেনে চলার মধ্যে বিপদের ওপর বিপদ রয়েছে।

তাবিজ তুমার ও কবজ বাঁধার বিদয়াত

আমাদের সমাজের একদিকে সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের মাঝে তাবিজ কবজ এবং এক শ্রেণীর বড় লোকদের মাঝে, বিশেষ করে বিদেশ সফর কালে 'ইমামে জামেন' বাঁধার একটা ব্যাপক রেওয়াজ রয়েছে দেখা যায়। এ সব লোক ইসলামের মৌলিক আদর্শের বড় একটা ধার ধারে না, বুঝেও না তেমন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপদে পড়লে বা বিপদ দেখা দিলে অথবা বিপদের আশংকা হলে হাতে, গলায় কবজ-তাবিজ ও 'ইমামে জামেন' না বেঁধে তারা পারে না। এরা মনে করে, এতে করে বিপদ কেটে যাবে কিংবা বিপদ আসতেই পারবে না। কিন্তু কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে এসব যে ইসলামের তওহিদী আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং মুসলমানদের মাঝে এটা যে একটা সম্পূর্ণ বিদয়াত ও শির্‌কী কাজ, সে কথা তারা ভেবে দেখবারও অবসর পায় না। একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায়, মূলত দোষ এ লোকদের নয়, এক শ্রেণীর আলিম বেশধারী মোল্লা-মৌলবীরাই সাধারণ লোকদের মাঝে এ জিনিসের প্রচলন করেছে এবং এতে করে তারা দু'পায়সা রোজগার করে খাচ্ছে। তারা অজ্ঞ-মুর্খ লোকদের মনে তওহিদী আকীদার কোনো ধারণা সৃষ্টি করতেই চেষ্টা করেনি। বরং তার বিপরীত এ ধারণা দিয়েছে যে, বিপদ কেটে যাবে। বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। অর্থাৎ তওহিদী আকীদার পরিবর্তে স্পষ্ট শির্‌কী আকীদাই তাদের মন-মগজে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এক আল্লাহ্‌র ওপর সর্বাবস্থায় নির্ভর করার, আল্লাহ্‌র নিকট বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে দো'আ করার কথা না শিখিয়ে তাদের পরিচালিত করা হয়েছে সুস্পষ্ট শির্‌কের পথে। এতে করে মুসলিম সমাজে তাবিজ-কবজ ও 'ইমামে জামেন' বাঁধার রেওয়াজ দিয়ে এক সুস্পষ্ট বিদয়াতকেই চালু করা হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে।

অথচ যে কোনো আলিম কুরআনের দিকে তাকালে দেখতে পেত, কুরআন মুসলমানদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে ওজস্বিনী ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ – (بنى اسرائيل : ٥٧)

মুমিন-মুসলমানরা কেবল আল্লাহ্‌রই রহমত পওয়ার আশা করে এবং কেবল তারই আজাবকে ভয় করে।

অন্য কথায় তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট, কোনো জিনিসের নিকট একবিন্দু সাহায্য, শান্তি ও নিরাপত্তা পেতে চায় না। তাদের মন কোনো অবস্থায়ই অন্য কারো দিকে, কিছুর দিকে আশান্বিত হয় না। অপর কারো ক্ষতির একবিন্দু ভয়ও তাদের মনে জাগে না। তারা যেমন কোনো মৃত্যু ও অনুপস্থিত ব্যক্তি বা কোনো প্রাণহীন জিনিসের আশ্রয় লয় না— না কোনো ফায়দা লাভের আশায়, না কোনো বিপদ বা ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে। বস্তুত এই তওহিদী আকীদা এবং এ-ই হচ্ছে তওহীদবাদী মুমিনদের পরিচয়।

কিন্তু তাবিজ-তুমার-কবজ বাঁধা এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের স্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ اَفَرَءَ يْتُمْ مَّاتَدْ عُوْنَ مِنْدُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهٖ اَوْ
اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهٖ - (الزمر - ٣٨)

বলো হে নবী! তোমরা কি লক্ষ্য করছো তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাকে যাকে ডাকো, আল্লাহ যদি আমাকে কোনো ক্ষতি করতে চান তাহলে তারা কি তা রোধ বা দূর করতে পারবে ? কিংবা আল্লাহ্ যদি আমাকে কোনো রহমত দিতে চান তাহলে তারা কি আল্লাহ্র এ রহমতকে বাধা দিতে পারবে?

ক্ষতি বা রহমত দেয়ার একমাত্র নিরঙ্কুশ মালিক এক আল্লাহ্ই, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নয়। আল্লাহ চাইলে ক্ষতি করে দেবেন, সে ক্ষতি থেকে সে বাঁচতে পারবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ যদি কাউকে রহমত দান করতে চান, তা হলেও সে রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে না, কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না, যার জন্যে রহমত নির্দিষ্ট, সে রহমত অন্য কাউকেও দিতে পারবে না কেউ। অবস্থা যখন এই, তখন বুদ্ধিমান লোকেরা কেন আল্লাহ ছাড়া অপর কোনো ব্যক্তি, শক্তি বা জিনিসের কাছে কিছু পেতে চাইবে, পেতে চাইবে তাঁর দয়া-সাহায্য, পেতে চাইবে বিপদ থেকে তার কাছে নিষ্কৃতি ? আমাদের সমাজে তাবিজ-কবজ 'ইমামে জামেন' কি এ ধরনেরই জিনিস নয় ?

তাবিজ তুমার ইমামে জামেন ইত্যাদি সম্পর্কে তো হাদীসে স্পষ্ট নিষেধ বাণী উচ্চারিত হয়েছে। যে কোনো আলিম এ হাদীস দেখতে পারেন, দেখলে বুঝতে পারবেন যে, হাদীসের দৃষ্টিতেই এ সব শির্কী কাজ। এখানে আমরা কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করছি।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلًا

فِىْ يَدِهٖ حَلْقَةٌ مِّنْ صَفَرٍ فَقَالَ مَاهٰذِهٖ .... قَالَ مِنَ الْوَاهِنَةِ فَقَالَ اَنْزِعْهَا فَاِنَّهَا لَا تَزِيْدُكَ اِلَّا وَهْنًا فَاِنَّكَ لَوْمِتَّ وَ هِىَ عَلَيْكَ مَا اَفْلَحْتَ اَبَدًا - (رواه احمد)

হযরত ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, সে পিত্তরসের রোগ থেকে বাঁচার জন্য একটা আংটি হাতে পড়ে রেখেছে। তিনি অসন্তোষের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি পরেছ? বললো, রোগ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যে এটা পড়েছি। রাসূল (স) বললেন, ওটা খুলে ফেল। কেননা ওটা তোমার হাতে পরা থাকলে তোমার বিপদ বাড়িয়ে দেবে— কমাবে না একটুও। আর এটা হাতে রাখা অবস্থায় যদি তুমি মরে যাও তাহলে তুমি কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلَا اَتَمَّ اللّٰهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ اللّٰهُ لَهٗ - (احمد)

যে ব্যক্তি কোনো তাবিজ-তুমার ঝুলাবে, আল্লাহ তাকে কোনো ফায়দা দেবেন না। আর যে কোনো কবজ ঝুলাবে, আল্লাহ তার বিপদ দূর করবেন না কখনো (কোন শক্তি পাবে না সে)।

অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَدْرَكَ - (ايضا)

যে লোক কোনো তাবিজ-কবজ বাঁধবে, সে শির্ক করলো।

পরপর উল্লেখ করা এ তিনটি হাদীস থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কোনো ক্ষতি— নোকছান বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কিংবা কোনো স্বার্থ-উদ্দেশ্য লাভের আশায় তাবিজ-কবজ বাঁধা সুস্পষ্ট শির্ক। ঈমানের বুনিয়াদ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা বান্দার নিকট যে ইখলাস দাবি করে, এ কাজ তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা যে লোক সত্যিকার ইখলাস-সম্পন্ন মুমিন সে তো কারো নিকট থেকে ফায়দা পাওয়ার বা কারো নোকছান থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে মনকে উম্মুখ করবে না। অতএব এ সব ত্যাগ না করলে পূর্ণ তওহীদের দাবি পূরণ হতে পারে না। এটা ছোট শির্ক বলে অনেকেই এর গুনার মারাত্মকতা লক্ষ্য করে না, বরং উপেক্ষা করে। কিন্তু আসলে এ ছোট

শির্ক হলেও অত্যন্ত সাংঘাতিক। হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে নবী করীমের জীবদ্দশায় কোনো সাহাবীর নিকট এর মারাত্মক রূপ অস্পষ্ট বা অজানা ছিল। তা হলে বর্তমান কালের কম ইল্মের ও দুর্বল ঈমানের লোকদের নিকট তা গোপন থাকায় আশ্চর্যের কি আছে— বিশেষত যখন চারদিকে শির্ক ও বিদয়াত ব্যাপকভাবে ছেয়ে গেছে।

হযরত হুযায়ফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে জ্বরের তীব্রতার কারণে তাবিজ স্বরূপ একটি সূতা হাতে বেঁধে রেখেছে। তখন তিনি তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ -

তারা অধিকাংশ লোকই আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনেনি বরং তারা মুশরিক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) শির্ক ও বিদয়াতের বিরুদ্ধে বড় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে গেছেন। যখন যেখানেই যে বিদয়াত বা শির্ক দেখেছেন, তারই বিরুদ্ধে তিনি দ্রুত প্রতিবাদের আওয়াজ তুলেছেন, ক্ষিপ্র-কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। একদা তিনি তার ঘরের মধ্যে গিয়ে তার স্ত্রীর গলায় একটা তাগা ঝুলতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করায় স্ত্রী জবাবে বললেন ঃ এটা অমুক অসুখের টোটকা চিকিৎসার জন্য গলায় বেঁধেছি। তিনি সেটি ধরে এত শক্তভাবে টান দিলেন যে, তাগাটি ছিড়ে গেল। নতুবা তাঁর স্ত্রীই উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পেতেন।

(حضرت عبد اللّٰہ بن مسعود اور ان کی فقہ مصنف اکثر حنیفۃ رضی :ص -۱۳۲ - ۱۳۳

চরিত্রের রূঢ়তার কারণে তিনি এরূপ করেননি বরং শির্ক-বিদয়াতের বিরুদ্ধে দ্বীনী দায়িত্ব পালনের জন্যই করেছিলেন।

জাহিলিয়াতের যুগে 'যাতে আনওয়াত' নামক একটি বৃক্ষ ছিল, সেখানে কুরাইশ ও সমস্ত আরব প্রতি বছর একবার একত্রিত হতো এবং তাদের তরবারি সেই বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে দিত, তারই নিকটে জন্তু যবাই করতো এবং একদিন তথায় সকলেই অবস্থান করতো।

মক্কা বিজয়ের পর মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমান ও মদীনা থেকে আগত সাহাবী সমভিব্যাহারে নবী করীম (স) হুনায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সেই বৃক্ষটি দেখতে পেয়েই মক্কার নবদীক্ষিত মুসলিমগণ পার্শ্ব থেকে বলে উঠলঃ হে রাসূল (স) আমাদের জন্যও একটি 'যাতে আনওয়াত' বানিয়ে

দিন, যেমন ওদের জন্য 'যাতে আন্‌ওয়াত' রয়েছে। এই কথা শুনেই নবী করীম (স) বললেন ঃ আল্লাহু আকবর তোমরা তো সেই রকমের কথা বলছো, যেমন মূসার সঙ্গীরা বলেছিল ঃ 'ওদের যেমন পূজ্য দেবতা রয়েছে আমাদের জন্যও অনুরূপ দেবতা বানিয়ে দাও হে মূসা! অর্থাৎ ওদের এই কথা যেমন ইসলামের তওহিদী আকীদার পরিপন্থী ছিল, আজকের তোমাদের এই কথাও তেমনি তওহিদী ঈমানের বিপরীত। কেননা ওদের কথার মতো এদের কথাও মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। ফলে তা একটি অতি বড় শিরকী কথা। ওদের মতো 'যাতে আনওয়াত' বানিয়ে তার সাথে তরবারি ঝুলানো, তার নিকট জন্তু যবাই করা এবং একটা দিন তার নিকট অবস্থান করা এক আল্লাহ্‌র সাথে আর একজন ইলাহ বানানই সমতুল্য গণ্য হওয়ায় রাসূলে করীম (স) ওদের কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। (তিরমিযী, মুসনাদের আহমাদ, ইবনে জরীর ও ইব্‌নে ইসহাকে ফীসীরাতে নবী)

এ ঐতিহাসিক কথা যদি সত্যি হয়— কে বলবে যে, তা সত্যি নয় ? তাহলে এ কালের মুসলিমরা যে বড় বড় নামকরা অলী-পীর-গাওসের (?) কবরের নিকট অবস্থান করছে, তার নিকট দো'আ করছে, তাকে ডাকছে এবং তার দো'আ চাচ্ছে, তা পরিষ্কার শির্‌ক ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য হবে না কেন ?

এই দু'টি কাজের মধ্যে শির্‌ক হওয়ার দিক দিয়ে পূর্ণ মিল রয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই ইমাম মালিকের ছাত্র আবু বকর তাতুশী লোকজনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা যেখানেই এরূপ কোনো বৃক্ষ দেখতে পাবে, যাতে কেন্দ্র করে জনতা একত্রিত হয়, বৃক্ষটির প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, রোগ ও বিপদে মুক্তি চায় তার নিকট এবং বৃক্ষটিকে কেন্দ্র করে ওরস করে— সেই বৃক্ষটিকে অবিলম্বে কেটে ফেলবে এবং শির্‌কের এই আড্ডাখানা ভেঙ্গে নির্মূল করে ফেলবে। (مختصرة الرسول صلى الله عليه وسلم: ص- ٣١٥)

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, হযরত হুযায়ফার দৃষ্টিতে জ্বর ইত্যাদি রোগ থেকে বাঁচার জন্যে তাবিজ তুমার বাঁধা পরিষ্কার শির্‌ক। এটা ছোট শির্‌ক হলেও সাহাবায়ে কিরাম তার প্রতিবাদে এমন সব আয়াত দলীল পেশ করতেন, যা বড় শির্‌কের প্রতিবাদে নাযিল হয়েছে। কেননা ছোট হলেও সেটা যে শির্‌ক তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। এ জন্যে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ -

তোমাদের ব্যাপারে আমি সবচাইতে বেশি ভয় করি ছোট ছোট শির্‌ককে।

অতএব শির্ক যত ছোটই হোক না কেন, আসলে তা আদৌ ছোট নয়। বরং সাহাবীদের দৃষ্টিতে ছোট শির্কও ছিল কবীরা গুনাহর চাইতেও বড় কঠিন।

কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহের দৃষ্টিতে আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত তাবিজ-তুমার-কবজ— ইমামে জামেন বাঁধার রেওয়াজটি সম্পর্কে চিন্তা করলে দুঃখে কলিজা ফেটে যায়। কেবল জাহিল লোকেরাই যদি এ সব করতো, তাহলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু বড় বড় আলিম নামধারী লোকদেরকেও এই শির্ক-এ নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি। রাষ্ট্রপ্রধানের বিদেশ গমনকালে বিমান বন্দরে বিদায়কালে যখন একজন আলিম নামধারী ব্যক্তি ঘটা করে তার হাতে 'ইমামে জামেন' বেঁধে দেন, যখন বিদেশে বিবাহিতা মেয়ে রুখসত করার সময় মা কন্যার হাতে 'ইমামে জামেন' বাঁধে এবং তার খবর খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ করা হয়, তখন তওহীদে বিশ্বাসী মানুষের মস্তক লজ্জায় ও দুঃখে নত না হয়ে পারে না।

আমাদের গ্রাম্য মূর্খ সমাজে দেখা যায়, সদ্যজাত সন্তানের গলায়-হাতে রাজ্যের বাজ্যে জিনিস বেঁধে দেয়া হয়। বড়ইর আটি, তামার পয়সা, মোল্লার দেয়া তাবিজের ঢোল, নানা গাছ-গাছড়ার পাতা বা শিকড়ের টুকরা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। হাটা-চলা করতে পারে— এমন ছেলে মেয়ের পায়ে মল, ঝুন ঝুনি পরিয়ে দেয়া হয়— পুকুরের দিকে যেতে লাগলে টের পাওয়া যাবে, পানিতে পড়ে মরা থেকে তাকে বাঁচানো যাবে এই আশায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, যার মৃত্যু শিশুকালে নির্ধারিত তাকে এসব আবর্জনার বোঝা রক্ষা করতে পারে না, মল বা ঝুন-ঝুনি পরা ছেলে মেয়েও পানিতে পড়ে মরে যায়। কেননা মৃত্যু এগুলোর ওপর নির্ভরশীল নয়। বস্তুত মানুষের ক্ষেত্রে এ সবের শির্ক হওয়া এবং সব রেওয়াজের বিদয়াত হওয়ার কোনোই সন্দেহ নেই।

নবী করীম (স) এসব বিষয়ে যেমন স্পষ্ট উক্তি করেছেন, নিষেধ বাণী উচ্চারণ করেছেন, তেমনি কার্যতও তিনি জাহিলিয়াতের জমানায় প্রচলিত এ সব রীতির প্রতিবাদ করেছেন। এমন কি তিনি জন্তু-জানোয়ারের গলায়ও এ সব বাঁধতে নিষেধ করেছেন, বাঁধা থাকলে তা ছিঁড়ে ফেলেছেন।

জাহিলিয়াতের জমানায় একটি রেওয়াজ ছিল, ভালো ভালো উটকে লোকদের নজরের দোষ থেকে বাঁচার জন্যে উটের গলায় নানা তাবিজ-তুমার বাঁধা হতো। হযরত আবু বুশাইর— কুরাইশ ইবনে উবাইদ বলেন, একবার বিদেশ যাত্রাকালে তিনি রাসূল (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। নবী করীম (স) যাত্রার পূর্বেই একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন এই বলে ঃ

لَا يُبْقِيَنَّ فِى رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ اَوْ قِلَادَةٌ اِلَّا قُطِعَتْ -

কোনো উটের গলায় যেন এ ধরনের কোনো সূতা ইত্যাদি বাঁধা না থাকে, থাকলে যেন তা ছিঁড়ে ফেলা হয়।

ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ الرُّقٰى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ -

তাবিজ-তুমার ও নির্ভরতার জিনিসগুলো ব্যবহার স্পষ্ট শিরক।

এ হাদীসের শব্দ তিনটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। تمائم হচ্ছে এমন জিনিস, যা শিশু সন্তানের গলায় বা হাতে লোকদের কুনজর থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বাঁধা হয়। আর رقى হচ্ছে লোকদের কুনজর, যা কোনো রোগ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বাঁধা হয়। আর تولة হছে এমন কিছু তদবীর করা, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় বলে মনে করা হয়। এসব কয়টি কাজই উপরোক্ত হাদীসের সুস্পষ্ট ঘোষণানুযায়ী পরিষ্কার শিরক।

এ আলোচনার শেষভাগে একটি সন্দেহের অপনোদন প্রয়োজন। পূর্বের আলোচনা পাঠে কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ বানালেও কি শিরক হবে? এর সংক্ষিপ্ত জবাব এই যে, সলফে-সালেহীনের মধ্যে কেউ কেউ কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ-কবজ বানান জায়েয বলেছেন। কিন্তু কেউ কেউ এ কাজকেও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এই শেষের লোকদের অন্যতম। ফিকহ্‌বিদদের মধ্যে কাতাদাহ্‌, শাবী, সাঈদ ইবনে জুবাইর ও এক বড় দল বলেছেন ঃ

يَكْرَهُ الرُّقٰى وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اَنْ يَّتْرُكَ ذٰلِكَ اِعْتِصَامًا بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ ثِقَةً بِهٖ اِنْقِطَاعًا اِلَيْهِ وَعِلْمًا بِاَنَّ الرُّقْيَةَ لَاتَنْفَعُهٗ وَاَنَّ تَرْكَهَا لَايُضِرُّهٗ -

(عمدة البخارى :ج -١٢، ص - ١٠٠)

তাবীজ-তুমার ব্যবহার মাকরূহ (তাহরীম)। মুমিন মাত্রেই কর্তব্য এগুলো পরিহার করা, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান দৃঢ় রেখে তাঁর ওপর নির্ভর ও ভরসা করা এবং এই জ্ঞান সহকারে যে, তার কোনো ফায়দা দেয় না, তা ত্যাগ করলে কোনো ক্ষতি হবে না।

আমার মনে হয় এ সব কাজের পিছনে যে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা থাকে, তা চিন্তা করলে সবাই স্বীকার করবেন, এসব কাজ হারাম ও তওহীদ-বিরোধী না হয়ে

পারে না— তা কুরআনের আয়াত দ্বারা বানানো হলেও নয়। কেননা একজন যখন বিপদে পড়ার আশংকায় এসব কাজ করবে, তার মনের লক্ষ্য আল্লাহ থেকে অ-আল্লাহ্ জিনিসের দিকে কেন্দ্রীভূত হবে। আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে সে এই জিনিসের ওপর নির্ভরতা গ্রহণ করবে। আর তওহীদের দৃষ্টিতে এটাই শির্ক। দ্বিতীয়ত এ কাজে কুরআনের আয়াত ব্যবহৃত হলে, তা যে কুরআনের সঠিক ব্যবহার নয়, কুরআন যে 'তাবিজ' হয়ে থাকার জন্যে দুনিয়ায় আসেনি, কুরআনের উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে তাকে অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে ? এত কুরআনের প্রকাশ্য অপমান, কুরআনের অপব্যবহার, কুরআনের এও এক প্রকার তাহরীফ— ব্যবহারিক তাহরীফ (বিকৃতি সাধন), কুরআনের অভিজ্ঞ তওহীদ বিশ্বাসী মানুষের নিকট তা কিছু মাত্র অস্পষ্ট নয়। তাই এ কাজ যত শীগগীর বন্ধ হবে মানুষ তা ত্যাগ করে খালিস তওহীদবাদী তওহীদপন্থী হয়ে উঠবে, ততই মঙ্গল। অন্তত সমাজের আলিমদের যে এ জন্যে বিশেষ তৎপর হওয়া উচিত এবং এসব জিনিসকে একটুও প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়, তা আমি জোর গলায় বলতে চাই।

অবশ্য এ থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, কোনো আকস্মিক বিপদে কুরআনের আয়াত পড়ে আল্লাহ্র রহমত চাওয়া যাবে না কিংবা বিপদগ্রস্তের ওপর আল্লাহ্র শিফা লাভের জন্যে ফুঁ দেয়া যাবে না। তা যে করা যাবে, তা হাদীস থেকেই প্রমাণিত এবং বহু সংখ্যক ফিকহ্বিদ সে মতও জাহির করেছেন।

মিলাদ অনুষ্ঠান বিদয়াত

মুসলমান সমাজে বহু দিন থেকে মিলাদ পাঠ ও মিলাদের মজলিস অনুষ্ঠানের রেওয়াজ চলে আসছে। সাধারণভাবে মুসলমানরা একে বড় সওয়াবের কাজ বলে মনে করে এবং খুব আন্তরিকতা সহকারে তা পালন করে। কিন্তু কোনো এক সময় মুহূর্তের জন্যেও বোধ হয় মুসলমানরা— মুসলিম সমাজের শিক্ষিত সচেতন জনতা— ভেবে দেখতেও রাজি হয় না যে, এ কাজ ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক কি না, সেই সুন্নাত মুতাবিক কি না, যা মুসলমানরা লাভ করেছে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকট থেকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার কারণে। এমন কি এ দেশের আলিম সমাজেও সমাজের এ আবহমানকাল থেকে চলে আসা রেওয়াজের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। কখনো তাকিয়ে দেখে না— আমরা সুন্নাত মুতাবিক কাজ করছি, না এ বিদয়াত করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে খানিকটা বিস্তারিত আলোচনা করা এ গ্রন্থে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে।

এ কথা সবাই জানেন ও স্বীকার করেন যে, প্রচলিত মিলাদের কোনো রেওয়াজ রাসূলে করীম (স)-এর জীবনে ছিল না, ছিল না সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তীকালের মুজাহিদদের সময়ে। এ মিলাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো এই যে, নবী করীম (স)-এর প্রায় দু'শ বছর পরে এমন এক বাদশা এর প্রচলন করে, যাকে ইতিহাসে একজন ফাসিক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জামে' আজহারের এর শিক্ষক ডঃ আহমাদ শারবাকী লিখেছেন ঃ চতুর্থ হিজরীতে ফাহিমীয় শাসকরা মিসরে এর প্রচলন করেন। একথাও বলা হয় যে, শায়খ উমর ইবনে মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি ইরাকের মুসল শহরে এর প্রথম প্রচলন করেছেন। পরে আল-মুজাফফর আবু সাঈদ বাদশাহ ইরাকের এরকেল শহরের মীলাদ চালু করেন। ইবনে দাহ্ইয়া এ বিষয়ে একখানি কিতাব লিখে তাকে দেন। বাদশাহ্ তাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার দেন (يسئلونك عن الدين والحياة, ১ম খণ্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

এ পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বর্তমানে মিলাদ সুন্নাতের ব্যবস্থা নয়, সুন্নাত মুতাবিক ব্যবস্থাও এটি নয়। বরং তা সুস্পষ্টরূপ বিদয়াত।

এর বিদয়াত হওয়ার সবচাইতে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল হচ্ছে এই যে, এ কাজ রাসূলে করীম (স)-এর জামানায় ছিল না, রাসূলের পরে খুলাফায়ে রাশেদুন তথা সাহাবায়ে কিরামের যুগেও তা একটি সওয়াবের কাজরূপে চালু

হয়নি। এমন কি তার পরবর্তী যুগেও তাবেয়ী-মুজতাহিদদের সময়েও এর প্রচলন হতে দেখা যায়নি। আর এ ইসলামী যুগে যে কাজ একটি ইবাদত বা সওয়াবের কাজ হিসেবে প্রচলিত হয়নি, পরবর্তীকালের কোনো লোকের পক্ষে তেমন কোনো কার্জকে সওয়াবের কাজরূপে চালু করা সম্ভব হতে পারে না, সে অধিকারও কাউকে দেয়া হয়নি।

একে তো ইসলামের জায়েয-নাজায়েয, সওয়াব-গুনাহ এবং আল্লাহ ও রাসূলের সন্তোষ-অসন্তোষের বিধি-ব্যবস্থা কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতেই প্রমাণিত হবে। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত নয়, অথচ তাকে বড় সওয়াবের কাজ বলে মনে করা হবে, তার কোনো অবকাশই ইসলামে নেই। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কাজই হয় বিদয়াত। আর যে কাজ মূলতই বিদয়াত, সে কাজ কোনোরূপ সওয়াব হওয়ার আশা করাই বাতুলতা মাত্র। রাসূলে করীম (স) যে কয় যুগের কল্যাণময়তা সম্পর্কে নিজে সাক্ষ্য দিয়েছেন এই বলে ঃ

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ -

অতীব কল্যাণময় ইসলামী যুগ হলো আমার এ যুগ, তারপর পরবর্তীকালের লোকদের যুগ এবং তারপরে তৎপরবর্তীকালে লোকদের যুগ।

এ তিনটি যুগের কোনো এক যুগেই অর্থাৎ রাসূলের নিজের সহাবীদের এবং তাবেয়ীদের যুগে মিলাদের এ অনুষ্ঠানের রেওয়াজ মুসলিম সমাজে চালু হয়নি, হয়েছে তারও বহু পরে। কাজেই এ কাজে কোনো প্রকৃত কল্যাণ আছে বলে মনে করাই একটা বড় বিদয়াত। বিশেষত কয়েকটি বিশেষ কারণে মিলাদের এ অনুষ্ঠান মুসলমানদের আকীদা ও দ্বীনের দিক দিয়ে খুবই মারাত্মক হয়ে উঠে। কারণ কয়টি সংক্ষেপে এই ঃ

(ক) এ অনুষ্ঠানে নবী করীম (স)-এর জন্মবৃত্তান্ত যেভাবে আলোচিত হয় বা আরবী উর্দূ বা বাংলা আলোচনায় পঠিত হয়, তা মূলতই ঘৃণার্হ। অথচ ঠিক এই সময়েই নবী করীম (স) মজলিসে স্বশরীরে উপস্থিত হন বলে লোকদের আকীদা রয়েছে। কিন্তু সব বিশেষজ্ঞের মতেই এ ধরনের আকীদা সুস্পষ্ট কুফরী। কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণায় এবং ফিকাহর দৃঢ় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এরূপ আকীদার হারাম হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়েছে।

নবী করীম (স) দুনিয়া থেকে চিরদিনের তরে বিদায় গ্রহণ করে চলে গেছেন। তাঁর পক্ষে এ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকীদা (নাউজুবিল্লাহ তাঁর আল্লাহ হওয়ার আকীদা)। এ কাজ কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষেই সম্ভব। আর আল্লাহ্‌র কুদরতের কাজ কোনো বান্দার জন্যে ধারণা করা পরিষ্কার শির্‌ক। এ পর্যায়ে

ফতোয়ায়ে বাজ্জাজিয়ার কথা আবার উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে লেখা হয়েছে ঃ

ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ تَصْرِيْحًا بِالتَّكْفِيْرِ بِاعْتِقَادِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلَمُ الْغَيْبَ بِمُعَارِضِهٖ قَوْلَهٗ تَعَالٰى قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ - (شرح فقه اكبر، احسن الفتاوى :ص - ١٢٤)

হানাফী মাযহাবে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম (স) গায়েবের ইল্ম জানেন— এরূপ আকীদা যে রাখবে, সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা এরূপ আকীদা আল্লাহ্র ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ আসমান জমিনে যারাই রয়েছে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই গায়েব জানে না।

যদি কেউ বিবাহের অনুষ্ঠানে বলে যে, আমার এ বিবাহের সাক্ষী হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ ও রাসূল, তবে সে কাফির হয়ে যাবে বলে ফিকহ্র কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা সেতো রাসূল (স)-কে 'আলিমুল গায়েব' বলে বিশ্বাস করলো। (فتاوى قاضى خان، بحر الرائق)

(খ) মিলাদ মহফিলে শিরনী মিঠাই বন্টন করাকে একান্তই জরুরী মনে করা হয়। আর মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানকে ওয়াজিবের পর্যায়ে গণ্য করা হয়। এভাবে কোনো নাজায়েয কাজকে ওয়াজিব বা জরুরী মনে করা হলে তা মাকরূহ হয়ে যাবে। ফিকহর কিতাবে বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ مُبَاحٍ يُؤَدِّىْ اِلَيْهِ اِلَى الْوُجُوْبِ فَمَكْرُوْهٌ - (درمختار : ١)

যে মুবাহ কাজই ওয়াজিব গণ্য হবে, তা মাকরূহ হবে (আর মাকরূহ মানে মাকরূহ তাহরীম)

(গ) নির্দিষ্ট দিন ও তারিখে মিলাদ করাকে জরুরী মনে করা হয়। অথচ শরীয়তে যখন কোনো তারিখ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি এ কাজের জন্যে, তখন এরূপ করা তো শরীয়তের বিধানের ওপর নিজেদের থেকে বৃদ্ধি করার শামিল। হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

لَا تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِىْ وَلَا تَخْتَصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْاَيَّامِ - (مسلم صحيح)

রাত্রিসমূহের মধ্যে কেবল জুম'আর রাত্রিকেই তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে এবং দিনসমূহের মধ্য হতে কেবল শুক্রবারের দিনটিকেই নফল রোযার জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে নিও না।

অতএব নফল নামায-রোযার জন্যেই যখন কোনো রাত বা দিন নিজেদের থেকে নির্দিষ্ট করে নিতে রাসূলে করীম (স) সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন, তখন মিলাদের জন্যেই বা নিজেদের থেকে এ নির্ধারণ কেমন করে জায়েয হতে পারে!

(ঘ) মিলাদ মজলিসের সাজ-সজ্জার জন্যে খুব আলো-বাতির ব্যবস্থা করা হয়, মোমবাতি আর আগরবাতির ধুম পড়ে যায়। এ সব নিতান্তই বেহুদা কাজ। আর এ কাজে যে পয়সা খরচ করা হয়, তাও বেহুদা খরচ। এ কাজ নিষিদ্ধ, এর ওপরই আরোপিত হয় আল্লাহ্‌র ঘোষণা ঃ

وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا- اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ -

বেহুদা অর্থ খরচ করো না। কেননা বেহুদা খরচকারী শয়তানের ভাই।

এসব করা হয় যে অনুষ্ঠানে, যাতে করে আল্লাহ্ কালামের স্পষ্ট বিরোধিতা করা হয়, তা করে কোনোরূপ সওয়াব হতে পারে বলে মনে করা কি নিতান্ত আহাম্মকী নয়?

মওলানা রশীদ আহমাদ গংগুহী মিলাদ সংক্রান্ত এক সওয়ালের জবাবে লিখেছেন ঃ

مجلس مروجه مولود بد عت ومكروه - (فتاوى رشيديه ص -٤١٥)

প্রচলিত ধরনের মিলাদ অনুষ্ঠান বিদয়াত এবং মাকরূহ।

এ জবাবকে সমকালীন বহু গণ্যমান্য আলিম 'সহীহ্' বলে সমর্থন করেছেন এবং ফতোয়ার দস্তখতও দিয়েছেন। মওলানা গংগুহী অন্যত্র বলেছেন ঃ

শরীয়তে যা বিনা শর্তে রয়েছে, তাকে শর্তাধীন করা এবং যা শর্তাধীন রয়েছে তাকে শর্তমুক্ত করাই হলো বিদয়াত। যেমন মিলাদের মজলিস অনুষ্ঠান করা। আসলে আল্লাহ্‌র যিকির কিংবা রাসূলের জীবন-চরিত বর্ণনা ও আলোচনা করা শরীয়তে মুস্তাহাব ও জায়েয। কিন্তু ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই কোনো মজলিস অনুষ্ঠান করা বিদয়াত ও হারাম। আল্লাহ্ ও রাসূলের কথা বলা তো মুস্তাহাব; কিন্তু বিশেষভাবে মিলাদের আলোচনার শর্ত করা বিদয়াত।

(فتاوى رشيد يه :ص-٤-٥)

ইমাম আল্লামা ইবনুল হাজ্জ (রহ) লিখেছেন ঃ

وَمِنْ جُمْلَةِ مَا اَحْدَثُوْهُ مِنَ الْبِدَعِ اِعْتِقَادُهُمْ اَنَّ ذٰلِكَ مِنْ اَكْبَرِ الْعِبَادَاتِ وَ اِظْهَارِ الشَّعَائِرِ -مَايَفْعَلُوْنَهُ فِىْ شَهْرِ الرَّبِيْعِ الْاَوَّلِ مِنَ الْمَوْلِدِ وَقَدْ اِحْتَوٰى ذٰلِكَ عَلٰى بِدَعٍ وَ مُحَرَّمَاتٍ اِلٰى اَنْ قَالَ وَهٰذِهِ الْمَفَاسِدُ مُتَرَتِّبَةٌ عَلٰى فِعْلِ الْمَوْلِدِ فَهُوَ بِدْعَةٌ بِنَفْسِ نِيَّةٍ فَقَطْ لِاَنَّ ذٰلِكَ زِيَادَةٌ فِىْ الدِّيْنِ وَلَيْسَ مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ الصّٰلِحِيْنَ وَاتِّبَاعُ السَّلَفِ اَوْلٰى وَلَمْ يَنْقُلْ مِنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اَنَّهُ نَوَى الْمَوْلِدَ وَنَحْنُ نَتَّبِعُ السَّلَفَ فَسَعِيْنَا مَا وَسَعَهُمْ - (المدخل)

তারা যে সব বিদয়াত রচনা করে নিয়েছে, তন্মধ্যে একটি তাদের এই আকীদা যে, তারা এ পর্যায়ে যা কিছু করছে তাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইবাদত এবং আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর বহিঃপ্রকাশ। আর তা হচ্ছে এই যে, রবিউল আউয়াল মাসে তারা মিলাদের অনুষ্ঠান করে, যাতে কয়েক প্রকারের বিদয়াতের অনুষ্ঠান করে, হারাম কাজ করে। এমন কি, এতদূর বলেছেন যে, এ সব মিলাদেরই সৃষ্ট বিপর্যয়। তাতে কোনোরূপ সুর-গান হোক আর মিলাদের নিয়্যত করা হয়, লোকদের সেজন্যে দাওয়াত দেয়া হয়, উপরোল্লিখিত কোনো দোষের কাজ যদি তাতে নাও থাকে তবু শুধু এ কাজের নিয়্যত করার কারণেও তা বিদয়াতই হবে। কেননা মূলতই এ জিনিস দ্বীন-ইসলামে অতিরিক্ত বৃদ্ধি। অতীতকালের নেক ও দ্বীনদার লোকদের আমল এরূপ ছিল না অথচ তাদের অনুসরণ করাই উত্তম। তারা কেউ মিলাদের নিয়্যত করেছেন বলে কোনোই উল্লেখ নেই। আমরা তো তাঁদেরই অনুসরণ করি। কাজেই তাঁদের কাজের যতদুর সুযোগ-সুবিধে ও ক্ষেত্র বিশালতা ছিল, আমাদেরও তো ঠিক ততোদূরই থাকবে।

মওলানা আবদুর রহমান আল-মাগরিবী আল-হানাফী (রহ) তাঁর ফতোয়ায় লিখেছেন ঃ

اِنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ وَلَمْ يَنْقُلْ بِهِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم وَالْخُلَفَاءُ وَالْاَئِمَّةُ وَكَذَا فِىْ الشَّرِيْعَةِ الْاِلٰهِيَةِ - (فتاوى رشيد يه :ص -٤١٧)

মিলাদ অনুষ্ঠান করা বিদয়াত। নবী করীম (স) খুলাফায়ে রাশেদীন এবং ইমামগণ তা করেনও নি, করতে বলেনও নি। 'শরীয়াতিল ইলাহিয়া' গ্রন্থেও এমনিই লেখা হয়েছে।

মওলানা নাসির উদ্দীন আল-আওদী শাফেয়ী এক প্রশ্নের জবাবে এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

لَا يُفْعَلُ لِاَنَّهٗ لَمْ يَنْقُلْ عَنِ السَّلْفِ الصّٰلِحِ وَاِنَّمَا اَحْدَثَ بَعْدَ الْقُرُوْنِ الثَّلٰثَةِ فِىْ الزَّمَانِ الطَّالِحِ وَنَحْنُ لَا نَتَّبِعُ الْخَلَفَ فِىْ مَا اَهْلُ السَّلَفِ لِاَنَّهٗ يَكْفِىْ بِهِمِ الْاِتِّبَاعُ فَاَىُّ حَاجَةٍ اِلَى الْاِبْدَاعِ -

মিলাদ পাঠের অনুষ্ঠান করা যাবে না। কেননা সলফে সালেহীন থেকে কেউই এ কাজ করেছেন বলে বর্ণিত হয়নি। বরং তিন যুগ (তাবেয়ী পরবর্তী যুগ) পরে এক খারাপ জমানার লোকেরা এ কাজ নতুন করে উদ্ভাবন করেছে। যে কাজ সলফে সালেহীন করেন নি, তাই আমরা পরবর্তীকালের লোকদের অনুসরণ করতে পারি না। কেননা সলফে সালেহীনের অনুসরণই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। এ বিদয়াতী কাজ করার প্রয়োজন কোথায় ?

হাম্বলী মাযহাবের শায়খ শরফুদ্দীন (রহ) বলেছেন ঃ

اِنَّ مَايَعْمَلُ بَعْضُ الْاُمَرَاءِ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ اِحْتِفَالًا لِمَوْلِدِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَعْ اِشْتِمَالِهٖ عَلَى التَّكَلُّفَاتِ الشَّنِيْعَةِ بِنَفْسِهٖ بِدْعَةٌ اَحْدَثَهٗ مَنْ يَتَّبِعُ هَوَاهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا اَمَرَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ الشَّرِيْعَةِ وَنَهَاهُ - (القول المعتمد)

দেশের এই শাসকমণ্ডলী প্রতি বছর নবী করীম (স)-এর মিলাদের যে উৎসব অনুষ্ঠান করে, তাকে খুব খারাপ ধরনের বাড়াবাড়ি ছাড়াও তা মূলতই একটা বিদয়াতী কাজ। নফসের খাহেশের অনুসরণ করে তারাই এ কাজ নতুন করে উদ্ভাবন করেছে। তারা জানে না নবী করীম (স) কি করতে আদেশ করেছেন, আর কি করতে নিষেধ করেছেন। অথচ তিনিই শরীয়তের বাহক ও প্রবর্তক।

কাযী শিহাবুদ্দীন (রহ) এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন ঃ

لَا يَنْعَقِدُ لِاَنَّهٗ مُحْدِثٌ وَكُلُّ مُحْدِثٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ وَمَا يَفْعَلُوْنَ مِنَ الْجُهَّالِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فِىْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ لَيْسَ بِشَىْءٍ وَيَقُوْمُوْنَ عِنْدَ ذِكْرِ

مَوْلِدِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزْعُمُوْنَ اَنَّ رَوْحَهُ صلعم يَجِئُ وَحَاضِرٌ فَزَعْمُهُمْ بَاطِلٌ بَلْ هٰذَا الْاِعْتِقَادُ شِرْكٌ وَقَدْ مَنَعَ الْاَئِمَّةُ عَنْ مِثْلِ هٰذَا -

না, তা করা যাবে না। কেননা তা বিদয়াত। আর সব বিদয়াতই সুস্পষ্ট গোমরাহী। সব গোমরাহীরই পরিণাম জাহান্নাম। জাহিল লোকেরা রবিউল আউয়াল মাসে প্রত্যেক বছরের শুরুতে যা কিছু করে, তা শরীয়তের কোনো জিনিসই নয়। আর নবী করীমের জন্মের কথা উল্লেখ করার সময় তারা যে দাঁড়ায়, মনে করে নবী করীমের রূহ তশরীফ এনেছে এবং উপস্থিত আছে, এ এক বাতিল ধারণা মাত্র, বরং এ আকীদা পরিষ্কার শির্‌ক। ইমামগণ এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করেছেন।

শামী চরিত গ্রন্থ প্রণেতা লিখেছেন ঃ

جَرَتْ عَادَةُ كَثِيْرٍ مِنَ الْمُحِبِّيْنَ اِذَا اسَمِعُوْا بِذِكْرِ وَضْعِهِ صلعم اَنْ يَّقُوْمُوْا تَعْظِيْمًا لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذَ الْقِيَامُ بِدْعَةٌ لَا اَصْلَ لَهُ -

রাসূল (স)-এর প্রেমিকদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তারা যখন নবী করীম (স)-এর জন্ম-বৃত্তান্ত শুনতে পায় তখন তারা তাঁর তাজীমের জন্যে দাঁড়িয়ে যায়। অথচ এই দাঁড়ানো বিদয়াত, এর কোনো ভিত্তি নেই।

মওলানা ফজলুল্লাহ জৌনপুর বলেন ঃ

مَا يَفْعَلُ الْعَوَامُّ فِىْ الْقِيَامِ عِنْدَ ذِكْرِ وَضْعِ خَيْرِ الْاَنَامِ عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَلسَّلَامُ لَيْس بِشَيْئٍ بَلْ هُوَ مَكْرُوْهٌ - (بهجة العشاق)

নবী করীমের ভূমিষ্ঠ হওয়ার কাহিনী শুনবার সময় সাধারণ মানুষ যে কেয়াম করে, তার কোনো দলীল নেই; বরং তা মাকরূহ।

কাযী নসিরউদ্দীন গুজরাটি লিখেছেন ঃ

وَقَدْ اَحْدَثَ بَعْضُ جُهَّالِ الْمَشَائِخِ اُمُوْرًا كَثِيْرً الا نَجِدُ لَهَا اَثَرًا وَ لَا رَسْمًا فِىْ كِتَابِ وَ لَا فِىْ سُنَّةٍ مِنْهَا الْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَةِ سَيِّدِ الْاَنَامِ عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَلسَّلَامُ -

(طريقة السلف)

কোনো কোনো জাহিল পীর এমন বহু বিদয়াত চালু করেছেন, যার সমর্থনে কোনো হাদীস বা কোনো নীতি কুরআন-সুন্নাতে পাওয়া যায় না। তার মধ্যে একটি হচ্ছে রাসূলে করীমের জন্ম-বৃত্তান্ত বলার সময় দাড়ান।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমদ সরহিন্দী লিখেছেন ঃ

بنظر انصاف بینید اگر حضرت ایشاں فرضا دریں زمان موجوده بودند ودردنیا زنده می بو دند وایں مجالس واجتماع که منعقد می شد آیا بایں راضی می شد ند وایں اجتماع را می پسند ید ند یقین آنست که ہرگز ایں معنی را تجو یز نمی فر مو دند بلکه انکار می نمودند - (مکتوبات)

ইনসাফের দৃষ্টিতে বিচার করে দেখো, মনে করুন নবী করীম (স) যদি এ সময়ে বর্তমান থাকতেন, দুনিয়ায় জীবিত থাকতেন আর এ ধরনের মজলিস অনুষ্ঠিত হতে দেখতেন, তবে কি তিনি এতে রাজি হতেন, এ অনুষ্ঠান পছন্দ করতেন ? এটাই নিশ্চিত যে, তিনি কিছুতেই এ কাজকে পছন্দ করতেন না, বরং এ কাজের প্রতিবাদই করতেন।

এ সব মজলিস সম্পর্কে কুরআন মজীদের এ আয়াতটি বিশেষভাবে প্রযোজ্যঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِيْ الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ - (النساء - ١٤٠)

আল্লাহ তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ জারি করেছেন, তোমরা যখন আল্লাহ্‌র আয়াতকে অমান্য করা হচ্ছে শুনতে পাও এবং তার ঠাট্টা বিদ্রূপ হতে দেখতে পাও, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না— যতক্ষণ না তারা অপর কোনো কাজে মনোযোগী হয়ে পড়ে। অন্যাথায় সে সময় তোমরাও তাদেরই মতো গুনাহগার হবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী ও মুহীউস-সুন্নাহ ইমাম বগভী লিখেছেন ঃ

قَالَ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) دَخَلَ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ كُلُّ مُحْدَثٍ فِيْ الدِّيْنِ وَ كُلُّ مُبْتَدِعٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

(معالم التنزيل، الجامع لاحكام القران :ج -٥، ص- ٤١٨)

যহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বলেছেন যে, এ আয়াতের আওতায় পড়ে গেছে দ্বীন-ইসলামের নতুন উদ্ভাবিত সব কাজ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু বিদয়াত রচনা করা হবে তা সবই।

আয়াতের শেষাংশ ঃ

اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا -

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক ও কাফির সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন, বিদয়াতী ও কাফির উভয়ের জন্যে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী।

এ পর্যায়ে আমার শেষ কথা হলো, নবী করীম (স) দুনিয়ার মুসলমানের আদর্শ, সর্বাধিক প্রিয়, আল্লাহ্‌র হেদায়েত ও রহমত লাভের একমাত্র মাধ্যম। এ জন্যে রাসূলে করীমের জীবনী, তাঁর চরিত্র ও কর্মাদর্শই এ অন্ধকার দুনিয়ায় একমাত্র মুক্তির আলোকস্তম্ভ। তাই সব মানুষের জন্যে বারে বারে তা আলোচনা করতে হবে, পড়তে হবে, জানতে হবে, অন্যদের সামনে তা বিস্তারিতভাবে তুলেও ধরতে হবে, বাস্তব জীবনের কদমে কদমে তাঁকেই অনুসরণ করে চলতে হবে, তাঁকেই মানতে হবে, ভালোবাসতে হবে, তারই কাছ থেকে চলার পথের সন্ধান ও নির্দেশ লাভ করতে হবে। এ ছাড়া মুসলমানের কোনোই উপায় নেই, থাকতে পারে না। কুরআন-হাদীসে রাসূল (স) সম্পর্কে যেসব বুনিয়াদী হেদায়েত দেয়া হয়েছে, তার সারকথা এ-ই। কিন্তু রাসূলে করীম (স)-কে 'পূজা' করা চলবে না। তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণা রাখা যাবে না, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেবল আল্লাহ্‌র সম্পর্কেই রাখা যেতে পারে।

রাসূলে করীমের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা ঈমানদার ব্যক্তির ইসলামের পথে চলার জন্যে সবচেয়ে বড় পাথেয়। সে ভালোবাসা নিশ্চয়ই এত মাত্রাতিরিক্ত হবে না, যা কেবল আল্লাহ্‌র জন্যেই হওয়া উচিত। রাসূল (স)-কে সে মর্যাদা, সে গুরুত্ব এবং সে ভালোবাসাই দিতে হবে, যা দিতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসূল (স) যা করার জন্যে উপদেশ দিয়েছেন।

এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় হেদায়েত হচ্ছে রাসূলে করীমকে অনুসরণ করার। আয়াত হলো ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (ال عمران : ٣١)

বলে দাও হে নবী! তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাস, তাহলে তোমরা হে মুসলমানরা! আমার অনুসরণ করে চলো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন, তিনি তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

এ আয়াতের মূল কথা হলো আল্লাহ্কে ভালোবাসলে নবীর অনুসরণ করতে হবে। নবীর অনুসরণ করলে আল্লাহ্র ভালোবাসা এবং ক্ষমা লাভই হচ্ছে বান্দার সবচেয়ে বেশি— সবচেয়ে বড়— কাম্য। আর তা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর সার্বিক অনুসরণ।

রাসূল (স)-এর প্রতি উম্মতের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে দরূদ পাঠ। কুরআন মজীদের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে মুমিন লোকেরা! তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।

নবীর প্রতি এই দরূদ পাঠানো একটি মহৎ কর্তব্য, একটি অতি সওয়াবের কাজ। আল্লাহ নিজে যে নবীর প্রতি 'দরূদ' পাঠান, পাঠান ফেরেশতাগণ, সে নবীর প্রতি দরূদ পাঠানো যে কতো বড় মুবারক কাজ, কতো বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে এ থেকে, তার ব্যাখ্যা করে শেষ করা সম্ভব নয়।

এ ছাড়া নবীর প্রতি উম্মতের আর কি করণীয় থাকতে পারে ? নবীর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা এবং নবীর জননীর প্রসব বেদনকালীন ঘটনাবলীর উল্লেখ যে সওয়াব হবে এ কথা কে বললো ? কেমন করে তা জানা গেল ? আর এই যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দল বেঁধে 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' 'ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা' বলতে হবে আর তাতে বড় সওয়াব পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে, এ কথা তো কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। অনেকের মতে এসব কাজ অনেকটা হিন্দুদের এক ধরনের পূজা অনুষ্ঠানের মতোই ব্যাপার। আর ইবাদত পর্যায়ের কোনো কাজেই অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সাদৃশ্য হওয়া মুসলমানদের জন্যে সবচেয়ে বেশি বর্জনীয়। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -

যে লোক অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করে চলবে, কিয়ামতের দিন সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।

মিলাদের মহফিলে নবী করীমের 'রূহ' হাযির হয়, এ কথা যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেয়া হয়, তবু প্রশ্ন এই যে, তখন সে কথা মনে করে মজলিসে সকলকে দাঁড়াতে হবে কেন ? রাসূলের জীবদ্দশায়ও কি সাহাবীগণ রাসূলের আগমনের তাজীমের জন্যে দাঁড়াতেন এবং এ দাঁড়ানোয় রাসূলে করীম (স) খুশি হতেন কিংবা তিনি কি দাঁড়িয়ে তাঁর তাজীম করতে বলেছেন কোনো দিন ? এ পর্যায়ে আমরা সহীহ্ হাদীসে সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস দেখতে পাই। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, আনাস (রা) সাহাবীদের সম্পর্কে বলেন ঃ

مَاكَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْالِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهٖ لِذٰلِكَ -

সাহাবীদের নিকট রাসূলে করীম (স) সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যখন রাসূলকে উপস্থিত দেখতে পেতেন, তাঁরা তাঁর জন্যে দাঁড়াতেন না। কেননা তাঁরা জানতেন যে, তাঁর তাজীমের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোকে তিনি অপছন্দ করেন।[১]

আবু মাজলাজ বলেন ঃ 'হযরত মুআবিয়া (রা) এমন একটি ঘরে প্রবেশ করলেন, যেখানে হযরত ইবনে আমের ও ইবনে যুবায়র উপস্থিত ছিলেন। মুআবিয়ার আগমনে ইবনে আমের দাঁড়ালেন ঃ কিন্তু ইবনে যুবায়র বসে থাকলেন। তখন মুআবিয়া (রা) তাঁকে বললেন ঃ

اِجْلِسْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّمْثُلَ لَهُ الْعِبَادُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّا بَيْتًا فِى النَّارِ - (مسند احمد)

তুমি বসো। কেননা আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট শুনেছি তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার সম্মানার্থে লোকেরা দাঁড়াক— এটা চায় এবং এতে খুশি হয়, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঘর বানিয়ে নেয়।

---

১. তিরমিযী শরীফে হযরত আনাসের এই বর্ণনাটির ভাষা এই ঃ

لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوْ اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهٖ لِذٰلِكَ -

ইমাম তিরমিযী লিখেছেন ঃ এ হাদীসটি حسن صحيح غريب

নবী করীম (স) নিজে মোটেই পছন্দ করতেন না, চাইতেন না যে, তাঁর তাজীমের জন্যে লোকেরা উঠে দাঁড়াবে। তার প্রমাণ হযরত আবু ইমামার বর্ণনা। তিনি বলেন ঃ

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَكَّاءُ عَلٰى عَصًا فَقُمْنَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَا تَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهُ بَعْضًا -

নবী করীম (স) লাঠির ওপর ভর দিয়ে আমাদের সামনে আসলেন। তখন আমরা তার তাজীমের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। নবী করীম (স) বললেন ঃ অমুসলিম লোকেরা যেমন পরস্পরের তাজীমের জন্যে দাঁড়ায়, তোমরা তেমনি করে দাঁড়াবে না।

রাসূলে (স)-এর কথাটিকে কেউ কেউ তাঁর স্বভাবজাত বিনয় বলে অভিহিত করতে পারেন। বলতে পারেন, রাসূলে করীম (স) বিনয়বশত তাঁর তাজীমার্থে কাউকে দাঁড়াতে বলেন নি বা দাঁড়ালেও নিষেধ করেছেন। তাই বলে আমরা কি দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সম্মান দেখাব না ?

এরূপ কথার প্রকৃত তাৎপর্য যে কতো ভয়াবহতা এ লোকেরা বুঝতে পারে না। তাঁর মানে এই হয় যে, তিনি নিষেধ করেছেন কৃত্রিমভাবে, আসলে দাঁড়ানটাকেই তিনি পছন্দ করতেন, দাঁড়ালে তিনি খুশি হতেন, তাতে সওয়াবও হয়। অথচ প্রশ্ন এই যে, যে যে কাজ করলে মুসলমানরা সওয়াবও পেতে পারে কিংবা তাদের তাজীমার্থে দাঁড়ালে যদি সওয়াবই হতো বা তা যদি নবীর প্রতি মুসলমানদের কর্তব্যই ছিল, তবে এভাবে নিষেধ করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তিনি অকপটে তা বলতে পারতেন, যেমন বলেছেন তাঁর জন্যে দরূদ পড়তে, তাঁকে অনুসরণ করতে, এ ব্যাপারে কৃত্রিমতার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। আর নবীর পক্ষে কৃত্রিমতা করা কৃত্রিমতা করেছেন বলে মনে করা— দ্বীনের মূলের ওপরই কুঠারাঘাত। কোনো ঈমানদার লোকের পক্ষেই এরূপ ধারণা করা সম্ভবপর নয়।

মনে রাখা আবশ্যক— রাসূলে করীমের রূহ মিলাদে হাযির হয় মনে করে তাঁর তাজীমার্থে দাঁড়ানোর ব্যাপারটিই এখানে আমাদের আলোচ্য। নতুবা সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের আগমনে সাময়িকভাবে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রসন্ন চিত্তে সম্বর্ধনা জানানো এবং তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার জন্য দাঁড়ানো এ থেকে ভিন্ন কথা। সহীহ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত সায়াদ ইবনে মুয়ায (রা) যখন তাঁর জন্তুযানে চড়ে আসছিলেন, তখন খোদ নবী করীম (স) আনসারদের

নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ —তোমরা তোমাদের নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়াও। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানো নাজায়েয নয়। বরং জমহুর আলিমগণ তা মুস্তাহাব বলেছেন। এই পর্যায়ে কোনো নিষেধ পাওয়া যায়নি।

(فقه السيرة ج ٣٣٤ النووى على معلم)

খোদ নবী করীম (স) স্নেহের অতিশয্যে তদীয় দুহিতা হযরত ফাতিমা (রা)-র জন্যও দাঁড়িয়েছেন। এই দাঁড়ান নিষিদ্ধ নয়। বরং নিষিদ্ধ হচ্ছে সেই দাঁড়ানো, যে সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - (بخارى)

যে লোক পছন্দ করবে যে লোকেরা তার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়াক, সে যেন তার আসন জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

কোনো প্রকৃত ঈমানদারই তা পছন্দ করতে এবং দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দেখালে নিশ্চয়ই খুশি হতে পারে না। অতএব কোনো নেতা বা ব্যক্তি খুশি হবে— এ জন্য দাঁড়ানো সম্পূর্ণ হারাম।

এ বিস্তারিত আলোচনার দৃষ্টিতে বর্তমানে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক মিলাদ মহফিল এবং প্রতি বছর অতীব ধুম-ধামের সাথে ১২ই রবিউল আওয়ালের 'ফাতিহা-ই-দোয়াজদহম' নামের অনুষ্ঠান জাতীয় উৎসবরূপে পালন করা যে সুস্পষ্টরূপে বিদয়াত, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের যুগে এর কোনো একটিরও কোনো দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে না। কুরআন-হাদীস থেকেও এর অনুকূলে কোনো দলীল পেশ করা সম্ভব নয়। কাজেই এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহ্র কোনো সওয়াব পাওয়ার আশা করাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এগুলোকে জাতীয় অনুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পালন করার, পালন করে রাসূলের প্রতি একটা বড় কর্তব্য পালন করা হলো বলে আত্মশ্লাঘা লাভ করা কিংবা এ সবের মাধ্যমে নিজেদেরকে রাসূলের বড় অনুসারীরূপে জাহির করে জনগণকে ধোঁকা দেয়া শুধু বিদয়াতই নয়, বিদয়াত অপেক্ষাও অধিক বড় ধৃষ্টতা, সন্দেহ নেই।

কদমবুসির বিদয়াত

বর্তমানকালে পীর ও আলিমদের দরবারে কদমবুসির বড় ছড়াছড়ি দেখা যায়। মুরীদ হলেই পীরের কদমবুসি করতে হয়, মাদ্রাসার ছাত্র হলেই ওস্তাদ-হুযুরের কদমবুসি করতে বাধ্য। তা না করলে না মুরীদ 'ফায়েজ' পেতে পারে পীরের, না ছাত্র ওস্তাদের কাছ থেকে লাভ করতে পারে 'ইল্‌ম'। বরং উভয় দরবারেই সে বেআদব বলে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই 'বড় কুরআনের (?)' দলীল পেশ করে বলা হয় ঃ

بےادب محروم گشت ازفضل رب

বেআদব লোক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

কদমবুসি না করলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয় কি হয় না— তা আল্লাহ্‌ই জানেন। কিন্তু এ ধরনের মুরীদ আর ছাত্র যে পীর ও ওস্তাদের স্নেহ দৃষ্টি থেকে মাহরুম হয়ে যায় তা বাস্তব সত্য। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এ কদমবুসি করা কি সত্যিই শরীয়ত মুতাবিক কাজ ? এ জিনিস মুসলিম সমাজে কোত্থেকে এসে প্রবেশ করলো ? এর ফলাফলই বা কি ?

সাহাবায়ে কিরামের সামনে নবী করীম (স)-এর যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল এবং নবী করীম (স)-কে সাহাবায়ে কিরাম (রা) যতদূর ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন, তার তুলনা অন্য কোথাও হতে পারে না এবং সে রকম সম্মান শ্রদ্ধা অন্য কাউকেই কেউ দিতে পারে না। কিন্তু সেই সাহাবীগণ নবী করীমের প্রতি বাহ্যত কিরূপ সম্মান দেখাতেন ? এ পর্যায়ে হাদীসে শুধু এতোটুকুরই উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সাহাবীদের কেউ কেউ নবী করীমের হাত ও কপালে হালকাভাবে চুমু দিয়েছেন। এই চুমু'য় ভক্তির চাইতে ভালোবাসাই প্রকাশ পেত সমধিক। তাঁদের কেউ কোনো দিন রাসূলে করীমের পা হাত দিয়ে স্পর্শ করে সে হাত দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল মলে দেয়ার যে কদমবুসি, তা করেছেন বলে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে না হাদীসের বা জীবন চরিতের কিতাবে।

এ পর্যায়ে হাদীসে শুধু এতটুকুরই উল্লেখ পাওয়া যায় যে, কোনো কোনো সাহাবী কখনো কখনো ভালোবাসার আতিশয্যে পড়ে নবী করীমের হাত-পা চুম্বন করেছেন। কিন্তু নির্বিশেষ সব সাহাবীর মধ্যে এ জিনিসের কোনো প্রচলন ছিল না। তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের যুগেও মুসলিম সমাজে এর কোনো

রেওয়াজ হতে দেখা যায়নি। এ কদমবুসির কোনো নাম-নিশানাই পাওয়া যায় না ইসলামের এ সোনালী যুগের ইতিহাসে। তাহলে এ কাজটি যে ইজমা ও মুতাওয়াতির ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তা অনস্বীকার্য।

তা ছাড়া ইসলামী শরীয়তের একটি মূলনীতি হলো কোনো মুবাহ বা সুন্নাত মুতাবিক কাজও যদি আকীদার বা আমলের ক্ষেত্রে খারাবী পয়দা করার কারণ হয়ে পড়ে, তাহলে তা করার পরিবর্তে না করাই বরং ওয়াজিব। এ কারণেই হযরত ওমর ফারূক (রা) সে গাছটি কেটে ফেলেছিলেন, যার পাদদেশে বসে নবী করীম (স) ঐতিহাসিক 'বায়'আতে রেজওয়ান' গ্রহণ করেছিলেন। কেননা তাঁর সময়কার লোকেরা এ গাছের নিকট সমবেত হওয়াকে সুন্নাতী কাজ বলে মনে করতো এবং তার নিকট রীতিমত হাজিরা দেয়াকে একান্ত জরুরী ও সওয়াবের কাজ বলে মনে করতে শুরু করেছিল। অথচ এ জামানা ছিল ইসলামের উজ্জ্বলতম যুগ। এ জন্যে ইলমে ফিকহ্‌র মূলনীতি দাঁড়িয়েছে ঃ

كُلُّ مُبَاحٍ يُؤَدِّيْ اِلَيْهِ (الْوَجُوْبِ) فَمَكْرُوْهٌ - (در مختار)

যে মুবাহ কাজ ওয়াজিবের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তা করা মাকরূহ।

তা ছাড়া কদমবুসি করার সময় মানুষ ঠিক সে অবস্থায় পৌঁছে যায়, যে অবস্থায় পৌঁছায় নামাযের 'রুকূ' ও 'সিজদার' সময়ে, আর ইচ্ছে করে কারো জন্যে এরূপ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

কাযী ইয়াজ লিখেছেন ঃ

كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلُ السَّجْدَةِ الْاِنْحِنَاءِ عَلٰى هَيْئَةِ الرُّكُوْعِ نُدِيْنَا عَنْهُ - (ثفاء)

(আল্লাহ ছাড়া অন্য কোউকে) সিজদা করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি রুকূর ধরনে কারো সামনে মাথা নত করাও নিষিদ্ধ।

আর মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ) লিখেছেন ঃ

كَادَالْاِنْحِنَاءُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا - (حشى مكتوبات مام ربانى دفتراول ص -٧٧)

কারো সামনে মাথা নোয়ান কুফরীর কাছাকাছি।

আর ফিকাহবিদদের মত হলো ঃ

اَنَّهٗ يَكْرَهُ الْاِنْحِنَاءُ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهٖ - (درالمختار، المحيط)

রাজা বাদশাহ বা অন্য কারো জন্যে মাথা নোয়ানো মাকরূহ। আর মাকরূহ মানে মাকরূহ তাহরীম।

এ সব কথা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, পীর, ওস্তাদ বা অন্য কোনো মুরব্বী— তিনি যেই হোন না-কেন, তার যে কদমবুসি করতে হবে ইসলামী শরীয়তে তার কোনো নিয়ম নেই। আর এ কাজ রাসূলে করীমের সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী— এক অতি বড় বিদয়াত।

'কদমবুসি' সম্পর্কে আর একটি কথা হলো, এর রেওয়াজ কেবল এই পাক-ভারতের আলিম ও পীরের দরবারেই দেখা যায়। অন্যান্য মুসলিম সমাজে এর নাম-নিশানাও নেই। এ কারণে এ কথা অনায়াসেই মনে করা যেতে পারে যে, কদমবুসির এ কাজটি এতদ্দেশীয় হিন্দু সমাজ থেকে মুসলিম সমাজে এসে তা মুসলমানী রূপ পরিগ্রহ করেছে। মুসলিম সমাজের বর্তমান কদমবুসি আসলে ছিল 'ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণিপাত।' এখনো তা দেখা যায় এখানে সেখানে। যজমান ব্রাহ্মণের সামনে আসলেই ব্রাহ্মণ তার বাঁ পায়ের বুড়ো অঙ্গুলি উঁচু করে ধরবে, আর যজমান তার কপাল সে অঙ্গুলির অগ্রভাগে স্থাপন করবে। অতঃপর যখন ইচ্ছে ব্রাহ্মণ তারা পা টেনে নেবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে এ রীতি আদিম। কেননা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-দর্শনে ব্রাহ্মণরাই মানুষ আর অন্যান্যারা ব্রাহ্মণের দাসানুদাস। অতএব ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণিপাত করাই তাদের কর্তব্য।

পরবর্তীকালে এ দেশের হিন্দুরা মুসলমান হয়ে এ হিন্দুয়ানী ব্রাহ্মণ্য প্রথাকেই— এ 'পদপ্রান্তে প্রণিপাতকে'ই 'মুসলমান' বানিয়ে কদমবুসিতে পরিণত করে দিয়েছে। এক কথায় সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী ব্রাহ্মণ্য প্রথাকে মুসলিম সমাজে— বিশেষ করে পীর সাহেবান ও আলিম-ওস্তাদ সাহেবানের দরবারে বড় সওয়াবের কাজ হিসেবে চালু করে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু এর কুফল, যা মুসলিম সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে, তওহীদের দৃষ্টিতে তা খুবই ভয়াবহ। পীর-মুরীদী আর ওস্তাদ-শাগরিদীর পরিবেশে এ কদমবুসি রীতিমত শির্কী ভাবধরা বিস্তার করে দিয়েছে। মুরীদ আর ছাত্র মনে করে এ কাজ অপরিহার্য। অন্যথায় হুযুরের নেক-নজর পাওয়া যাবে না, হুযুর খুশি হবেন না। দ্বিতীয়ত, হুজুর তো এমন উঁচু মর্যাদার যে, তিনি যা-ই বলবেন, অথবা যাতে তাঁর দিল খুশি হবে তাই করা আমার কর্তব্য। তার উপর 'টু' শব্দ করাও চরম বেয়াদবী। আর তাতে আল্লাহ্ বেজার হবেন। অথচ ইসলামের তওহিদী আকীদায় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র এবং বাস্তব আমলের ক্ষেত্রে রাসূল (স) ছাড়া এ মর্যাদা আর কারোই হতে পারে না।

অপর দিকে 'হযরত পীর কিবলা' এবং ওস্তাদ-হুযুরের মনে এ বাসনা স্পষ্টত বর্তমান থাকে— তারা তো আর ফেরেশতা নয়, মানুষই— যে, মুরীদ বা ছাত্র আমার কদমবুসি করবেই। অনেক হুজুরকে এমনভাবে প্রস্তুত হয়েই আসন গ্রহণ

করতে দেখা যায় যে, মুরীদ বা ছাত্রের পক্ষে পায়ে হাত দিতে যেন কোনো অসুবিধে না হয়। বরং অনায়াসেই যেন এ কাজ সম্পাদিত হতে পারে। তাই বলে তাঁরা মুখে কাউকে কদমবুসি করতে বলেন, এমন নয়; বরং তাঁরা নিষেধই করে থাকেন। তবে সে নিষেধ বাণীটা উচ্চারিত হয় কদমবুসির কাজটা যথারীতি সম্পন্ন হয়ে যাবার পর, তার আগে নয়। আর সে নিষেধও ঠিক আদেশেরই অনুরূপ।

সবচেয়ে বড় কথা, কদমবুসি করার যে রূপটি, তা সিজদার মতোই। আল্লামা শামী তাঁর সময়কার অবস্থা অনুযায়ী এ ধরনের কাজকে 'সিজদা' বলেই অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

وَكَذَا يَفْعَلُوْنَهُ مِنْ تَقْبِيْلِ الْاَرْضِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ فَحَرَامٌ وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِيْ بِهٖ اٰثِمَانِ لِاَنَّهٗ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الْوَثَنِ - (درمختار)

এমনিভাবে লোকেরা যে আলিম ও বড় লোকদের জমিনবুসি করে, এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম। আর যে এ কাজ করে এবং যে তাতে রাজি থাকে— খুশি হয়, উভয়ই গুনাহগার হয়। কেননা এ কাজ ঠিক মূর্তি পূজা সদৃশ্য।

দেওবন্দের মুফতী মাওলানা রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী-ও এরূপই ফতোয়া দিয়েছেন। (আহসানুল ফতোয়া দ্রষ্টব্য)

বস্তুত কুরআন হাদীসে কদমবুসির কোনো উল্লেখ নেই, ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে এর কোনো স্থান নেই। এর পরিবর্তে কুরআন-হাদীসে সালাম দেয়ার ও মুসাফাহা করার উল্লেখ এবং সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়।

কুরআন মজীদে 'সালাম' সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا - (النساء ٨٦)

তোমাদেরকে যখন কোনো প্রকার সম্ভাষণে সম্ভাষিত করা হবে, তখন তোমরা তার অপেক্ষা উত্তম সম্ভাষণে সম্ভাষিত করো, অথবা অতটুকুই ফিরিয়ে দাও। মনে রেখো, আল্লাহ সর্ব বিষয়ের নিশ্চিত হিসাব গ্রহণকারী।

এ থেকে সুস্পষ্ট বোঝা গেল, মুসলমানদের পরস্পরের যখন দেখা-সাক্ষাত হবে, তখন পরস্পরে সম্ভাষণের আদান-প্রদান করবে। এ সম্ভাষণ মৌখিক হতে হবে এবং এ সম্ভাষণের ব্যাপারে পরস্পরে ঐকান্তিক নিষ্ঠা পোষণ করতে হবে

এবং কোনোরূপ কৃপণতা পোষণ করা চলবে না। বরং প্রত্যেককে অপরের তুলনা উত্তম সম্ভাষণ দানে প্রস্তুত থাকতে হবে অকুণ্ঠিতভাবে। আয়াতের শেষ অংশ এ সম্ভাষণের গুরুত্ব এবং তা যথারীতি আদান-প্রদান করার জন্যে সতর্কতাবলম্বন করার নির্দেশ দিচ্ছে।

হাদীসে নবী করীম (স) বারবার নানাভাবে পারস্পরিক সালাম আদান-প্রদানের জন্যে তাগিদ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَ لَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا ثُمَّ قَالَ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ فَعَمِلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - (مسند احمد)

আমার প্রাণ যে আল্লাহ্‌র মুষ্টিবদ্ধ, তাঁর কসম করে বলছি ঃ তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে, আর তোমরা ঈমান আনতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। অতঃপর বললেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন একটা কাজের পথ দেখাব, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে ? তা হলো এই যে, তোমরা তোমাদের পরস্পরের মাঝে সালাম দেয়ার প্রচলনকে চালু করবে।

নবী করীম (স) হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হলে মদীনার মুসলমানগণ তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এ সম্বর্ধনার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ اِنْجَفَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَكُنْتُ فِيْمَنْ اِنْجَفَلَ فَكَانَ اَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَفْشُوْا السَّلَامَ - (مسند احمد)

নবী করীম (স) যখন মদীনায় উপস্থিত হলেন, তখন জনগণ তাকে সম্বর্ধনা করার উদ্দেশ্যে দ্রুততা সহকারে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। যারা এই সময় সামনে এগিয়ে গিয়েছিল, আমিও তাদের মধ্যে একজন।... এই সময় আমি তাঁকে যে কথা সর্বপ্রথম বলতে শুনেছিল তা হলো ঃ তোমরা পরস্পরের প্রতি সালাম আদান-প্রদান করো।

কুরআনের আয়াত থেকে পারস্পারিক সম্ভাষণের যে হেদায়েত পাওয়া যায়, সে সম্ভাষণ যে কি এবং কিভাবে, কি কথা দিয়ে তা করতে হবে, তার সঠিক সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় এ হাদীস থেকে। অতএব নতুন সাক্ষাতকালে একজন মুসলমানের অপর মুসলমানের প্রতি প্রথম জরুরী কর্তব্য হচ্ছে সালাম দেয়া, বলা আসসলামু আলাইকুম। আর অপর পক্ষে জবাবে বলবে ঃ ওয়া আলাইকুমুস

সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। বুখারী শরীফের একটি হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত আদম (আ) সৃষ্ট হওয়ার পরই আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে ফেরেশতাদের সাথে এই সালামের আদান-প্রদান করেছিলেন।

শেষোক্ত হাদীস থেকে একজন নবাগত মহাসম্মানিত মেহমানকে সম্বর্ধনা জানাবার সঠিক নিয়ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ জানতে পারা যায়। এই পর্যায়ে অপর হাদীস থেকে জানা যায় এ সালাম করার সময় কি ধরনের আচরণ অবলম্বন করা উচিত এবং কি ধরনের অনুচিত।

এই পর্যায়ে যত হাদীসই বর্ণিত হয়েছে, তা সব সামনে রেখে চিন্তা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, 'সালাম' মুখে উচ্চারণ করার— কথার মাধ্যমে বলে দেবার ব্যাপার। এ জন্যে কোনোরূপ অঙ্গভঙ্গি করা জরুরী নয়, সুন্নাত থেকে তা প্রমাণিতও নয়।

দ্বিতীয় যে কাজ নবাগত মুসলিমের সাথে করার কথা হাদীস থেকে সুন্নাত বলে প্রামাণিত, তা হলো মুসাফাহা করা। বুখারীর একটি হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) বলেন ঃ

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا ابِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ اِلٰى طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يُهَرْوِلُ فَصَافَحَنِىْ وَهَنَّاْ نِىْ -

আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম সেখানে নবী করীম (স) রয়েছেন। আমাকে দেখেই তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ দাঁড়িয়ে আমার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসলেন। আমার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বসালেন।

বুখারীর অপর হাদীস থেকে জানা যায়, তাবেয়ী কাতাদাহ হযরত আনাস (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

اَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِىْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

নবী করীমের সাহাবীদের পরস্পরে মুসাফাহা করার রীতি বহুল প্রচারিত ছিল কি ? হযরত আনাস (রা) জবাবে বলেন 'হ্যা', তা চালু ছিল।

আবদুল্লাহ হিশাম বলেন, আমরা নবী করীমের সঙ্গে ছিলাম। আর তিনি হযরত উমরের হাত ধরে ছিলেন।

এ পর্যায়ের হাদীস থেকে নবাগতের সাথে সালামের পরে মুসাফাহার সুস্পষ্ট

উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তা রাসূল (স)-এর সাহাবীদের সমাজে পুরা মাত্রায় চালু ছিল বলে অকাট্যভাবে জানা যায়।

এই সম্পর্কে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস সর্বাধিক স্পষ্টভাষী। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرَّجُلُ مِنَّا يَلْقٰى اَخَاهُ اَوْصَدِ يْقَهٗ اَيَنْحَنِىْ لَهٗ قَالَ لَا قَالَ اَفَيَلْتَزِمُهٗ فَيَلْزِمُهٗ وَيُقَبِّلُهٗ قَالَ لَا قَالَ اَفَيَاْ خُذُ بِيَدِهٖ وَيُصَافِحُهٗ قَالَ نَعَمْ - (مسند احمد)

ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের একজন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে যখন সাক্ষাত করে, তখন কি সে তার জন্যে মাথা নুইয়ে দেবে ? রাসূল (স) বললেন ঃ না। জিজ্ঞেস করলো, তবে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে ও তার মুখমণ্ডলে চুমু খাবে ? রাসূল (স) বললেন ঃ না। জিজ্ঞেস করলো ঃ তবে কি তার হাত ধরে মুসাফাহা করবে ? রাসূল (স) বললেন ঃ হ্যাঁ।

এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেছেন هٰذَا احَدِ يْثٌ حَسَنٌ 'মুসাফাহা' হাতে হাত ধরা ও পরস্পরের জন্যে দো'আ করা يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ 'আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাফ করে দিন'— বলবে।

এর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَفَّحَانِ اِلَّاغُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَّتَفَرَّقَا -

দু'জন মুসলমান পরস্পরের সাক্ষাতকালে যদি মুসাফাহা করে, তাহলে দু'খানি হাত বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই সে দুজনকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

হাদীসে তৃতীয় যে জিনিসের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা হলো 'মুয়ানাকা'— কোলাকুলি। তিরমিযী শরীফে এ সম্পর্কে যে একমাত্র হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে, তাহলো হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

قَدِمَ زَيْدُبْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَيْتِىْ فَاَتَا فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... فَعَا نَقَهٗ وَقَبَّلَهٗ -

যায়দ ইবনে হারিসা [রাসূল (স)-এর পালিত পুত্র] মদীনায় উপস্থিত হলো। তখন নবী করীম (স) আমার ঘরে ছিলেন। যায়দ তাঁর সাথে দেখা করার

জন্যে এলো ও দরজায় ধাক্কা দিলো। নবী করীম (স) তার কাছে উঠে গেলেন এবং তিনি তার সাথে গলাগলি করলেন, একজন আরেকজনের গলা জড়িয়ে ধরলেন এবং তাকে স্নেহের চুম্বন দিলেন।

এ পর্যায়ে আরো কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করে আল্লামা আহমাদুল বান্না লিখেছেন ঃ

وَهٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ تَدُلُّ عَلٰى مَشْرُوْعِيَةِ الْمُعَانَقَةِ خُصُوْصًا لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ -

এ সব হাদীস প্রমাণ করে যে, মুয়ানাকা (গলাগলি বা কোলাকুলি) শরীয়তে জায়েয। বিশেষ করে যে আসবে তার সাথে।

আল্লামা তিবরানী আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَلَاقُوْا فَصَافَحُوْا وَ اِذَا قَدِمُوْا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوْا -

(اورده الهيثمى وقال رجاله رجال الصحيح، الفتح الربانى ج -١٧، ص -٣٤٨)

নবী করীম (স)-এর সাহাবীদের তরীকা এই ছিল যে, যখন তাঁরা পরস্পরের সাথে দেখা করতেন, পরস্পরের মুসাফাহা করতেন। আর যখন বিদেশ সফর করে ফিরে আসতেন, তখন তাঁরা পরস্পরে গলাগলি করতেন।

এ আলোচনা থেকে জানা গেল, ইসলামের সুন্নাত হচ্ছে এই যে, দু'জন মুসলমান যখন পরস্পরে সাক্ষাত করবে তখন সালাম করবে, মুসাফাহা করবে এবং গলাগলিও করবে— বিশেষ করে বিদেশাগত ব্যক্তির সাথে। এই সব কয়টি কথাই সুস্পষ্ট হাদীস থেকে প্রমাণিত। রাসূলে করীম (স) তাই করেছেন, সাহাবাদের সমাজের এই ছিল স্থায়ী রীতি, বস্তুত এই হচ্ছে সুন্নাত! কিন্তু এই কদমবুসি এলো কোত্থেকে ? কে কদমবুসি করতে বলেছে ? কে তা রেওয়াজ করেছে ইসলামী সমাজে ? কুরআন নয়, হাদীস নয়, রাসূল নয়, রাসূলের গড়া সমাজ নয়। অতএব এটি বিদয়াত ও মুশরিকী রীতি হওয়ার কোনোই সন্দেহ থাকে না। অথচ আমাদের সমাজের তথাকথিত পীরবাদী আহলে সুন্নাত (?)-দের সমাজে 'কদমবুসি' একটি অপরিহার্য রীতি। আর তা হবেই বা না কেন ? এখানে ইসলাম ও সুন্নাত কুরআন, হাদীস, রাসূল ও সাহাবীদের আমল থেকে গ্রহণ করা হয় না, গ্রহণ করা হয় মরহুম বা বর্তমান পীর সাহেবানদের কাছ থেকে। আর এ ধরনের পীর-মুরীদী যেহেতু বেদান্তবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে গৃহীত, তাই কদমবুসির ব্রাহ্মণ্য রীতিও এখানে চালু হতে বাধ্য। কেউ যদি বলেন যে, ওস্তাদ, পীর ও মুরুব্বীদের তাজীম করার জন্যেই এ রীতি চালু হয়েছে, তাহলে

বললো ঃ ওস্তাদ, পীর ও মুরব্বীদের তাজিমের তরীকা সুন্নাত থেকে যা প্রমাণিত, তাই দিয়ে তাজীম করতে হবে। নিজেদের মনগড়া একটা রীতিকে চালু করার বিশেষ করে যদি তাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে ভয়ানক খারাবী থাকে— কারো অধিকার থাকতে পারে না। করলে তাই তো হবে বিদয়াত। যারা চলতি প্রথার দোহাই দিয়ে শরীয়তের বাইরের জিনিসকে শরীয়ত সম্মত বলে চালু করতে চাইবে, তারাই তো বিদয়াতী। আল্লাহ এই বিদয়াতীদের প্রভাব থেকে বাঁচান ঈমানদার ও তওহীদবাদী মুসলিম সমাজকে।

কদমবুসি পর্যায়ে আলোচনার শেষ ভাগে একটি কথার উল্লেখ করে তার জবাব না দিলে এ দীর্ঘ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কোনো কোনো পীরের অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত তাসাউফ সংক্রান্ত কদমবুসি— বিশেষ করে পীর ওস্তাদের কদমবুসি— করা জায়েয বলে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। এ ফতোয়ার দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে দুটো হাদীস। একটি হাদীস তিরমিযী থেকে, অপরটি আবু দাঊদ থেকে। প্রথম হাদীসটিতে দু'জন ইয়াহুদীর কথা বলা হয়েছে ঃ তারা রাসূলে করীমের নিকট দ্বীন ইসলামের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ঃ

فَقَبَّلُوْا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ نَبِىٌّ -

অতঃপর তারা রাসূলে করীমের দু'হাত ও দু'পা চুম্বন করলো এবং বললো ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নবী।

এ সম্পর্কে আমাদের প্রথম কথা হলো, ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে حسن صحيح উত্তম বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন বটে, কিন্তু ইমাম নাসায়ী এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন حديث منكر অগ্রাহ্য হাদীস। আর মুনযেরী বলেছেন, এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে সালেমার কারণেই যয়ীফ। কেননা হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে তাঁর দোষ বের করা হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের সুস্পষ্ট কথা হলো হাত ও পা চুম্বনের এই কাজটি দু'জন ইয়াহুদী করেছে। ইয়াহুদীর কাজ মুসলমানদের জন্য অনুকরণীয় অনুসরণীয় হতে পারে না। আবু দাউদ বর্ণিত অপর এক হাদীসে উমামাতা ইবনে শরীক (রা)-এর এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ وَرِجْلَيْهِ -

আবু দাউদে উদ্ধৃত হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর হাত বা পা নয়, কটিদেশে চুম্বনের কথা বলা হয়েছে।[১]

১, হযরত উসাইদ ইবনে উজাইর (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণিত। একজন আনসারের কথায় রাসূলে করীম (স) তাঁর পরিহিত জামা পিছনের দিক দিয়ে তুলে ধরলে ঃ

দ্বিতীয় কথা, এ পর্যায়ের সব কয়টি হাদীসকে একত্রিত করে বিচার করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ সবের মূল প্রতিপাদ্য কথা সব হাদীসে একই রকম নয়। কোনোটিতে শুধু দু'হাত চুম্বনের কথা বলা হয়েছে, কোনোটিতে এক হাত এক পা চুম্বনের কথা বলা হয়েছে। এমন কি হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে শুধু হাত চুম্বনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَقَبَّلْنَا يَدَهٗ قَالَ وَقَبَّلَ اَبُوْ لُبَابَةَ وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ وَصَاحِبَاهُ يَدَ النَّبِيِّ صلعم حِيْنَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ذَكَرَهُ الْاَبْهَرِىُّ - (تحفة الاحوذى شرح الترمذى)

অতঃপর আমরা তাঁর হাত চুম্বন করলাম। তিনি বললেন ঃ এবং আবু লুবাবা ও কাব ইবনে মালিক এবং তাঁর দু'জন সঙ্গীও নবী করীম (স)-এর হাত চুম্বন করলেন, যখন আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন। এ কথা আবহারীও উল্লেখ করেছেন।

ইবনে উমর বর্ণিত এ হাদীসটি ইমাম বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' নামক কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, জনৈক বৃদ্ধ লোক রাসূলে মস্তক ও দু'পা চুম্বন করার অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলে করীম (স) তাকে অনুমতি দেন। আবদুর রহমান ইবনে রুজাইন বলেছেন, সালেমা ইবনুল আক্ওয়া তাঁর উটের হাতের মতো হাঁত বের করলেন, আমরা তা চুম্বন করলাম। সাবিত থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আনাসের হাত চুম্বন করলেন। আর হযরত 'আলী নাকি' হযরত আব্বাসের হাত ও পা চুম্বন করেছিলেন। (تحفة الاحوذى ج ٧ ص ٥٢٨)

এভাবে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে ঠিক সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না। মূলত হাত পা দু'টোই চুম্বন করার কথা ঠিক, না শুধু হাত চুম্বনের কথাই ঠিক। কাজেই এ সব হাদীসের ভিত্তিতে কদমবুসি করা জায়েয কিছুতেই বলা যায় না। আবু মালিক আল-আশজায়ী বলেন ঃ আমি আবু আওফ (রা)-কে বললাম, আপনি যে হাত দিয়ে রাসূলের বায়'আত করেছেন, তা বের করুন। তিনি সে হাত বের করেন। অতঃপর আমরা তা চুম্বন করি।

فَاحْتَضَنَهٗ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهٗ - (معالم السنن شرح ابو داؤد ج -١٤)

তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তার কটিদেশে চুম্বন করতে লাগলেন।

এ ধরনের হাদীস থেকে কোনো আবিদ-জাহিদ ব্যক্তির হাত ভক্তিভরে চুম্বন করা জায়েয প্রমাণিত হয় বটে;[১] কিন্তু কদমবুসি প্রমাণিত হয় না। ইমাম নববীও এ মত প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয়, কোনো নওমুসলিম যদি ভক্তিশ্রদ্ধায় ভারাক্রান্ত হয়ে রাসূলে করীমের হাত ও পা উভয়ই চুম্বন করে থাকেন, তবে তার ভিত্তিতে আজকের পীর-ওস্তাদেরা ভক্ত মুরিদ ও ছাত্রদের দ্বারা নিজেদের হাত-পা চুম্বন করাতে পারেন না। তাঁরা কি নিজেদের রাসূলের মর্যাদাভিষিক্ত মনে করে নিয়েছেন?

বস্তুত কদমবুসির বর্তমান রেওয়াজ রাসূলে সুন্নাতের বিপরীত; মানবতার পক্ষে চরম অপমানকর। অনতিবিলম্বে এ প্রথা বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

---

১. ইমাম গাযযালী লিখেছেন ঃ

وَلَابَأْسَ بِقُبْلَةِ يَدِ الْمُعَظَّمِ فِي الدِّيْنِ تَبَرُّكًا بِهِ وَتَوَقُّرًا بِهِ -

দ্বীনের দিক দিয়ে অতীব মহান কোন ব্যক্তির হাত বরকত পাওয়া ও তার প্রতি সম্মান দেখানর উদ্দেশ্যে চুম্বন করায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু তাতে পা চুম্বনের কথা নেই।

(يسئلو نك فى الدين والحية ٢، ص -٦٤٢)

সমাজে নারীদের প্রধান্যও বিদয়াত

ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা সুপতিষ্ঠিত, কুরআন দ্বারা ঘোষিত এবং রাসূলে করীম (স) দ্বারা বাস্তবায়িত। তাতে নারীদের নারী হিসেবে মর্যাদা ও অধিকার পুরোপুরি স্বীকৃত। কিন্তু নারীদের মর্যাদা পুরুষদের ওপরে নয়, নীচে— প্রথম নয়, দ্বিতীয়— নিরংকুশ নয়, শর্তাধীন।

এ পর্যায়ে কুরআনের ঘোষণা ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ - (النساء ٣٤)

পুরুষগণ নারীদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ঃ আল্লাহ কতক মানুষকে অপর কতক মানুষের ওপর অধিক মর্যাদা দিয়েছেন এই নিয়মের ভিত্তিতে এবং এ জন্যও যে, পুরুষরাই তাদের ধন-সম্পদ নারীদের জন্য ব্যয় করে।

নারীদের তুলনায় পুরুষদের মর্যাদা অধিক হওয়ার একটি কারণ স্বাভাবিক গুণ-বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব। আর দ্বিতীয়, পরিবার পরিচালনা ও আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্য নারীদের তুলনায় পুরুষরাই দায়ী— তারাই তা করে থাকে। এটাই পারিবারিক জীবনে ক্ষুদ্র-সংকীর্ণ পরিসরে এবং বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠুতা ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য কার্যকর নিয়ম। এর ব্যতিক্রম হলে সামাজিক শৃঙ্খলা চুর্ণ-বিচূর্ণ হতে বাধ্য। তাই রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَاتَرَكْتُ بَعْدِىْ عَلٰى اُمَّتِىْ مِنْ فِتْنَةٍ اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ - (بخارى مسلم)

আমার পরে আমার উম্মতের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকর ফিতনা পুরুষদের ওপর আসতে পারে নারীদের প্রাধান্যের কারণে।

নারী প্রাধান্যের কারণেই বহু সমাজ ও রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হয়েছে; ইতিহাসই তার অকাট্য প্রমাণ।

لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَّلَّوْ اَمْرَ هُمْ اِمْرَأَةٌ - (بخارى)

হযরত আবু বকর (রা) নবী করীম (স)-এর কথাটি বর্ণনা করেছেন ঃ যে জনসমষ্টি তাদের সামষ্টিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ও কর্তৃত্ব কোনো নারীকে অর্পণ করবে, তা কখনোই কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِيْنَ اَطَاعَتِ النِّسَاءَ -

পুরুষ যখন নারীদের আনুগত্য করতে থাকে, মনে করো তখনই পুরুষরা ধ্বংসের মধ্যে পড়ে গেছে।

এ কথার সত্যতা বর্তমানে পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থা যেমন প্রমাণ করে। আমাদের এতদ্দেশীয় সমাজ ও পরিবারের অবস্থা থেকেও তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। নারীকে যদি নৌকার হাল ধরতে দেয়া হয়, ড্রাইভারকে বসিয়ে যে ড্রাইভিং জানে না বা যোগ্যতা নেই তাকে মোটর চালনা করতে দিয়ে যে অবস্থা দেখা দেয়, স্বাভাবিক নারী প্রাধান্যের পরিণতিও তা-ই হবে। এটা সুন্নাতে রাসূলের পরিপন্থী।

(এটাই সাধারণ সত্য। ব্যতিক্রম থাকা অসম্ভব নয়)

পোশাক-পরিচ্ছদের বিদয়াত

আমাদের দেশে বর্তমানে 'সুন্নাতী লেবাস' বলে এক ধরনের বিশেষ কাটিং ও বিশেষ পরিমাণের লম্বা কোর্তা পরিধান করা হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে যে, এই হলো সুন্নাতী পোশাক। আর এ সুন্নাতী পোশাক যে না পরবে সে ফাসিক বলে বিবেচিত হবে এবং এমন লোক যদি আলিম হয়, তাহলে তার পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে না। এ ধারণার কারণে সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর লোক— আলিম ও পীরগণ এ ধরনের কোর্তা পরাকেই সুন্নাত মনে করেন, 'সুন্নাতী পোশাক' বলেই তারা এর প্রচারও করেন। শুধু নিজেরাই তা পরিধান করেন না, তাঁদের ছাত্র এবং মুরীদানকেও অনুরূপ কাটিং ও লম্বা মাপের কল্লিদার কোর্তা পরিধান করতে বাধ্য করে থাকেন।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সুন্নাতী পোশাক বলতে কি বোঝায়, কোনো বিশেষ কাটিং-এর এবং বিশেষ মাপের লম্বা জামা পরা কি সত্যিই সুন্নাত ? সে 'সুন্নাত' কোন দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হলো ? কুরআন থেকে ? হাদীস থেকে ? কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা বিষয়টিকে বুঝতে চেষ্টা করবো।

পোশাক কি রকম হতে হবে এ বিষয়ে কুরআন মজীদের সবচেয় গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হলো এই ঃ

يٰبَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ
خَيْرٌ ط ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ - (الاعراف-٢٦)

হে আদম সন্তান! নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জন্যে এমন পোশাক (পরিধানের বিধান) নাযিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে এবং যা হবে ভূষণ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা-ই কল্যাণময়। এ হচ্ছে আল্লাহ্র আয়াতসমূহের অন্যতম; এবং তা বলা হচ্ছে এ আশায় যে, তারা নসীহত কবুল করবে।

এ আয়াত থেকে কয়েকটি মৌলিক কথা জানতে পারা যায়। প্রথম এই যে পোশাক মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ দান। অতএব পোশাক সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সে পোশাক কি রকমের হতে হবে; সে বিষয়ে এ আয়াত থেকে দুটো কথা জানতে পারা যায়।

একটি হলো, পোশাক এমন হতে হবে যা অবশ্যই মানুষের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে রাখবে। যে পোশাক মানুষের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে না, তা মানুষের পোশাক হতে পারে না। আর দ্বিতীয় কথা হলো, সে পোশাককে 'ভূষণ' হতে হবে।[১] পোশাক পরলে যেন মানুষকে দেখতে ভালো দেখায়, বদসুরত যেন না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বস্তুত পোশাকই মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, পোশাকের মাধ্যমে মানুষের সৌন্দর্যবোধ, ভদ্রতা, শালীনতা ও রুচি-সুস্থতা প্রমাণিত হয়। আর পোশাক যদি সে রকম না হয়, তা হলে আল্লাহ্র দেয়া এক সুন্দর ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করা হবে, হবে আল্লাহ্র নাশোকরী।[২] এর সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, ভূষণ ও শোভার ব্যাপারে মানুষের রুচি পরিবর্তনশীল এবং স্থান, কাল ও মানসিক অবস্থার দৃষ্টিতে রুচির ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য ও পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। অতএব কুরআনের মতে পোশাকের ধরণ ও কাটিং পরিবর্তনশীল। কোন ধরাবাঁধা কাটিং-এর পোশাক ইসলামী পোশাক বলে অভিহিত হতে পারে না।

এ আয়াতের তৃতীয় কথা হলো ঃ তাকওয়ার লেবাস। তাকওয়ার লেবাস কাকে বলে এ বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। কাতাদাহ বলেছেন, 'লেবাসুত-তাকওয়া' বলে এখানে ঈমান বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুটি পরিচয়সহ পোশাক পরতে হবে, কিন্তু এই ব্যাপারে সর্বাধিক কল্যাণময় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঈমানকে তাজা রাখা, সঠিকরূপে বহাল রাখা। হাসান বসরী এর মানে বলেছেন ঃ লজ্জা, লজ্জাশীলতা, শালীনতা। কেননা, এই লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধই মানুষকে তাকওয়া অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ তা হলো নেক আমল। ওসমান ইবনে আফফান (রা) বলেছেন, তা হলো নৈতিক পবিত্রতা। আর আয়াতের মানে হলো ঃ

---

১. ريش শব্দের মানে হল উজ্জ্বল্য, চাকচিক্য, শোভাবর্ধক পোশাক। আভিধানিকদের মতে ريش শব্দের আসল অর্থ হলো পাখির পালক, যা চাকচিক্যময় ও শোভাবর্ধক হয়ে থাকে। আর মানুষের পোশাকও যেহেতু পাখির পক্ষ ও পালকের মতোই, এ কারণে মানুষের পোশাক বাহ্যত কিরূপ হবে, তা বুঝবার জন্যে ريش শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

২. নতুন পোশাক পরে যে দো'আটি পড়তে রাসূলে করীম (স) বলেছেন তা হলো এই ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ وَ اَتَجَمَّلُ بِهٖ حَيَاتِيْ -

প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাকে এমন পোশাক পরিয়েছেন, যা দ্বারা আমি আমার লজ্জাস্থান আবৃত করি ও আমার জীবনে শোভা ও সৌন্দর্য লাভ করি।
এ দো'আতেও সেই ছতর ঢাকা ও সৌন্দর্য লাভের লক্ষ্যের কথাই বলা হয়েছে, পোশাক পরার মূলে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। এ ঠিক কুরআনের আয়াতেরই ব্যাখ্যা যেন।

لِبَاسُ التَّقْوٰى خَيْرٌ لِّصَاحِبِهٖ اِذَا اَخَذَ بِهٖ مِمَّا خَلَقَ لَهٗ مِنَ اللِّبَاسِ التَّجَمُّلِ -

তাকওয়ার পোশাক ভালো— কল্যাণময়, যদি তা গ্রহণ করা হয় আল্লাহ্র সৃষ্ট পোশাক ও সৌন্দর্য-ব্যবস্থা থেকে।

মোটকথা, পোশাককে প্রথম লজ্জাস্থান আবরণকারী হতে হবে। এ জন্যে নারী ও পুরুষের পোশাকে মৌলিকভাবে পার্থক্য হতে বাধ্য এ কারণে যে, পুরুষের লজ্জাস্থান এবং নারী দেহের লজ্জাস্থানে পরিধির দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তা অবশ্যই ভূষণ বা শোভাবর্ধক ও সৌন্দর্য প্রকাশক হবে। যে পোশাক মানুষের আকার-আকৃতিকে কিম্ভূতকিমাকার বা বীভৎস করে দেয়, চেহারা বিকৃত করে দেয়, সে পোশাক কুরআন সমর্থিত পোশাক নয়, কোনো মুসলমানের পক্ষেই তা ব্যবাহারযোগ্য হতে পারে না।

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদ থেকে দ্বিতীয় যে আয়াতটি উদ্ধৃত করা যায় তা হলো এই ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ - (الاعراف-۳۲)

বলো হে নবী! আল্লাহ্র সৌন্দর্য— যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য বের করেছেন— তা কে হারাম করে দিলো ?

'আল্লাহ্র সৌন্দর্য' মানে মানুষের জন্যে আল্লাহ্র সৃষ্টি করে দেয়া সৌন্দর্যের সামগ্রী, আর তা হলো পোশাক ও অন্যান্য সৌন্দর্য্যের উপাদান, সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী জিনিসপত্র। অর্থাৎ পোশাক ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী দ্রব্যাদি তো আল্লাহ্রই সৃষ্টি এবং তিনি তা সৃষ্টি করেছেন তাঁর বান্দাদের জন্যে। তিনি তা ভোগ-ব্যবহার করার জন্যেই বানিয়েছেন, মূলগতভাবেই তা সকলের জন্যে জায়েয। এ জায়েয জিনিসকে কে হারাম করে দিতে পারে। আল্লাহ্র সৃষ্টি জিনিস হারাম করার একমাত্র ক্ষমতা হলো আল্লাহ্র। আর তিনিই একে হালাল করে দিয়েছেন— শুধু হালাল-ই করে দেন নি, তা গ্রহণ ও ব্যবহার করার নির্দেশও দিয়েছেন এই বলে ঃ

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ -

তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী জিনিস— পোশাক— তোমরা তা গ্রহণ করো প্রতি নামাযের সময়।

এ আয়াতেও সেই পোশাক গ্রহণেরই কথা বলা হয়েছে যা হবে জিনাত, শোভামণ্ডিত, সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী। অতএব পোশাক গ্রহণের ব্যাপারে কুরআনের

নির্দেশ অনুযায়ী মুলগতভাবে তিনটি জিনিসের দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবেঃ প্রথমত লজ্জাস্থান আবরণকারী, দ্বিতীয় ভূষণ, শোভাবর্ধনকারী এবং তৃতীয় সে পোশাক শালীনতাপূর্ণ হতে হবে, লজ্জাশীলতার অনুভূতির প্রতীক হতে হবে, নির্লজ্জতাব্যঞ্জক হবে না তা।

কুরআন মজীদে পোশাক সম্পর্কে যে হেদায়েত পাওয়া যায়, তা এই। এ ছাড়া কুরআন থেকে পোশাক পর্যায়ে আর কিছু জানা যায় না। কুরআন থেকে যা জানা গেল, তাতে কিন্তু পোশাকের কাটিং, ধরন, আকার ও পরিমাণ দৈর্ঘ্য প্রস্থ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

অতঃপর দেখতে হবে এ পর্যায়ে হাদীস থেকে কি জানা যায়। সর্বপ্রথম বুখারী শরীফের 'কিতাবুল-লিবাস' এ উদ্ধৃত হাদীস লক্ষণীয়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَالْبَسُوْا تَصَدَّ قُوْا فِيْ غَيْرِ اِسْرَافٍ وَ مُخَيِّلَةٍ - (بخاری ترجمة الباب)

> তোমরা খাও, পান করো, পোশাক পরো এবং দান-খয়রাত করো। (আর এসব কাজ করবে দুটো শর্তে) না বেহুদা খরচ করবে, না অহংকারের দরুন করবে।

খাওয়া, পান করা, পোশাক পরা এবং দান-খয়রাত করা সম্পর্কে রাসূলে করীমের এ নির্দেশ। এ কাজ অবাধ ও উন্মুক্ত— কেবলমাত্র দুটো শর্তের অধীন। একটি হলো, এর কোনোটাই বেহুদা বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকারী হবে না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে অহংকারের বশবর্তী হয়ে এ কাজগুলো করবে না। إسراف মানে ঃ صَرْفُ الشَّيْئِ، زَائِدًا عَلٰى مَا يَنْبَغِىْ বাঞ্ছনীয় নয় এমন পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয় করাই হলো 'ইসরাফ'। আর مخيلة মানে تكبر অংহকার করা, খুব বেশি দামী পোশাক এবং বাহাদুরী ও বড় মানুষী প্রকাশ হয় যে পোশাকে তা নিষিদ্ধ। আর পোশাক পর্যায়ে আমাদের জন্যে হেদায়েত এই যে, প্রথম বেহুদা খরচ হয় যে পোশাকে, যে ধরনের যে পরিমাপের পোশাক, তা পরিধান করা সুন্নাতের খিলাফ। পোশাককে অবশ্যই এ থেকে মুক্ত হতে হবে। আর দ্বিতীয়ত গৌরব-অহংকারবশত কোনো পোশাক পরা এবং যে ধরনের, যে আকারের ও যে পরিমাপের পোশাক পরলে গৌরব-অহংকার, বড় মানুষী ও বাহাদুরী প্রকাশ পায়, যা মানুষকে সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে দেয়, তা পরা যাবে না। তা পরলে হবে সুন্নাতের বিপরীত কাজ। অতএব ব্যয়-বাহুল্য ও অহংকার বিবর্জিত যে কোনো আকারের, প্রকারের ধরনের, কাটিং-এর এবং পরিমাপের

পোশাকই সুন্নাত অনুমোদিত পোশাক। সুন্নাতী লিবাস তা-ই, যা হবে এরূপ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَاشِئْتَ مَا اَخْطَأَتْكَ ثِنْتَانِ سَرَفٌ اَوْ مُخَيَّلَةٌ -

তুমি খাও যা-ই চাও, তুমি পরো যা-ই তোমার ইচ্ছা, যতক্ষণ পর্যন্ত দুটো জিনিস থেকে তুমি ভুলে থাকবে ঃ ব্যয় বাহুল্য বেহুদা খরচ ও গর্ব অহংকার প্রকাশক বস্ত্র।

অর্থাৎ এ দুটি বিকার থেকে মুক্ত যে-কোন পোশাকই হাদীস মুতাবিক পোশাক এবং তা পরা সম্পূর্ণ জায়েয। আকার, ধরন, কাটিং ও লম্বা-খাটোর ব্যাপারে হাদীস কোনো বিশেষ নির্দেশ দেয় নি, আরোপ করেনি কোনো বাধ্যবাধকতা।

বুখারী শরীফেই এরপর যে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে, তা হলো এই ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى مَنْ جَرَّثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ -

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ এমন কোনো ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টি দেবেন না, যে তার ঝুলিয়ে দেয়া বা ঝুলে পড়া পোশাক টানতে টানতে চলবে অহংকারের কারণে।

তার মানে পরিধেয় বস্ত্র এমনভাবে মাটিতে ঝুলিয়ে দেয়া যে, তা টেনে টেনে চলতে হয়— তা অহংকার প্রকাশকারী আচরণ। এ রকম আচরণ যে লোক গ্রহণ করবে, তার প্রতি আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি দেবেন না, সে আল্লাহ্র রহমত থেকে হবে বঞ্চিত। মনে রাখতে হবে, এ হাদীস থেকে জামা-কাপড়ের আকার, কাটিং বা দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কোনো হেদায়েত পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু মানসিক ব্যাপারেই নির্দেশ করা হয়েছে। কাপড় পরার বাহ্যিক ধরন কি হবে, কি না হবে তা-ই বলা হয়েছে। আর অহংকারের ভাব নিয়ে যাই করা হবে, যেভাবেই অহংকার প্রকাশ পাবে, তা-ই নিষিদ্ধ হবে।

অতঃপর বুখারী শরীফের সব কয়টি হাদীস আপনি পড়ে যান, কোনো একটি হাদীসেও পোশাক সম্পর্কে বিশেষ কোনো কাটিং বা পরিমাপ গ্রহণের নির্দেশ পাবেন না। তবে হাদীস থেকে এ কথা জানা যাবে যে, নবী করীমের কোর্তার আস্তিন বা হাত ছিল খুবই সংকীর্ণ। তা থেকে এখানকার চুরিদার আস্তিনের জামা পরা জায়েয প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স) যে কামীস পরতেন তা কতখনি লম্বা ছিল ? একটি হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, তা খুব লম্বা ছিল না। হাদীসটির ভাষা হলো এই ঃ

كَانَ قَمِيصُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُطْنًا قَصِيْرَ الطُّوْلِ وَالْكُمِّ -

(دمياطى قوله مرقاة ج -٤ ، ص- ٤٢٣)

নবী করীমের কামীস সাধারণত সূতীর কাপড় দিয়ে তৈরী হতো এবং তার ঝুল খুব কম হতো ও আস্তিন চুরিদার হতো।

এ থেকে অকাট্যভাবে জানা গেল যে, যারা বলে বেড়ায় যে, নবী করীম (স) অর্ধেক নলা পর্যন্ত ঝুল কোর্তা পরেছেন, তারা বানানো মিথ্যে কথা বলেছেন। সত্য কথা হলো তিনি লুঙ্গি পরলে খাটো কোর্তা পরিধান করতেন।

তিরমিযী শরীফে পোশাক পর্যায়ে যে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম হাদীস হলো এই ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ وَ اَحَلَّ لِاِنَاثِهِمْ -

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের পুরুষ লোকদের জন্যে রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে, আর মেয়েদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

অর্থাৎ পুরুষদের জন্যে রেশমী পোশাক হারাম।

এছাড়া মুসনাদে আহমাদ এর একটি হাদীস থেকে পরিধেয় বস্ত্রের ঝুল কতখানি হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা মেলে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ

قَالَ اَبُوْالْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِزَارَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ اَنْصَفِ السَّاقَيْنِ فَاَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ اِلٰى مَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ فَمَا كَانَ مِنْ اَسْفَلِ مِنْ ذٰلِكَ فَفِىْ النَّارِ -

ঈমানদার লোকদের ইজার পায়ের দুই নলার মাঝ বরাবর ঝুলতে পারে। এর নীচে যেতে পারে পায়ের গিরা ওপর পর্যন্ত। এর নীচে গেলে তা হবে জাহান্নামে যাওয়ার কাজ।

হাদীসে ازار শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে পরিধেয় বস্ত্র, যা কোমরের নীচের দিক ঢাকার জন্যে পরা হয়। তা লুঙ্গি হতে পারে, পাজাম হতে পারে, হতে পারে আজকালকার পোশাক প্যান্ট বা অন্য কিছু। এগুলোর ঝুল হাঁটু থেকে গিরা পর্যন্তকার মাঝ বরাবর نصف ساق পর্যন্ত হতে পারে। 'নিসফে সাক'-এর

নীচে পায়ের 'গিরা' পর্যন্তও ঝুলতে পারে; কিন্তু এর নীচে গেলে তা জায়েয হতে পারে না।

নবী করীম (স)-এর এ পর্যায়ের হাদীসসমূহকে ভিত্তি করে হযরত ইবনে উমর (রা) বলেছেন ঃ

مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم فِىْ الْاِزَارِ فَهُوَ فِى الْقَمِيْصِ -(زاد المعاد :ج-١، ص -٥٢)

রাসূলে করীম (স) ইজারকে পায়ের গিরার নীচে ঝুলবার ব্যাপারে যে আযাবের কথা বলেছেন, তা-ই তিনি বলেছেন কামীস-এর ব্যাপারেও।

'কামীস' হলো গাত্রাবরণ, শরীরের ঊর্ধ্ব ভাগ ঢাকবার জন্যে যাই পরিধান করা হয়, তাই কামীস (قميص) তার কাটিং বা ধরন যাই হোক না কেন। তা এখনকার পাঞ্জাবী, শার্ট, কোর্ট বা কল্লিদার জামা— যে কোনোটাই হতে পারে। তার কাটিং কি হবে, সে বিষয়ে হাদীস কিছুই বলছে না। বলছে শুধু একথা যে, তা যেনো এতদূর লম্বা না হয় যে, তদ্দ্বারা পায়ের গিরাও ঢেকে যায়। হযরত ইবনে উমরের কথা থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, পায়ের গিরার নীচে ইজার বা কামীস যাই ঝুলবে, তাই হারাম হবে। মনে রাখতে হবে যে, তদানীন্তন আরব সমাজে সাধারণত একখানি কাপড় দিয়েই সব শরীর ঢাকবার রীতি চালু ছিল। কখন একখানা কাপড় দিয়ে শরীরের ওপর থেকে হাটুর নীচের ভাগ পর্যন্ত ঢেকে ফেলত। এমন কি, বর্তমানেও আরবদের পোশাক এ রকমই। নীচে ছোট-খাটো একটা পরে, আর তার ওপর দিয়ে পায়ের গিরা পর্যন্ত লম্বা একটা জামা পরে— এই হলো এখনকার আরবদের সাধারণ পোশাক। এর কোনোটিকেই যে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে পায়ের গিরা ঢেকে ফেলা যাবে না তাই বলা হচ্ছে এ সব হাদীসে। বস্তুত 'নিসফে সাক' বলতে কোনো কিছুর উল্লেখ থাকলে তা হলো এই।

কিন্তু একটি লুঙ্গি বা পা'জামা পরা সত্ত্বেও 'নিসফে সাক'— নলার মাঝ বরাবর পর্যন্ত একটি কোর্তাও ওপর থেকে ঝুলে পড়তে হবে এবং এরূপ কোর্তা পরা সুন্নাত হবে— একথা কোত্থেকে জানা গেল ? কুরআন থেকে নয়, হাদীস থেকে নয়। আর কুরআন ও হাদীস থেকে যখন তা প্রমাণিত নয়, তখন তা ফিকাহ্‌র কিতাব থেকেও প্রমাণিত হতে পারে না। বর্তমান আরবদের রেওয়াজ থেকেও তা প্রমাণিত নয়। অতএব বর্তমানে এক শ্রেণীর আলিম ও পীর সাহেবানদের 'সুন্নাতী লেবাস' বলে চালিয়ে দেয়া 'নলার অর্ধেক পর্যন্ত' লম্বা কল্লিদার কোর্তা শরীয়তের মূল দলীল থেকে প্রমাণিত জিনিস নয়। এ হলো সম্পূর্ণ মনগড়া একটা জিনিস। আর শরীয়তের সুন্নাত রূপে প্রমাণিত নয়—

এমন একটি পোশাককে 'সুন্নাতী লেবাস' বলে চালিয়ে দেয়ার এক অতি বড় বিদয়াত।[১] তা বিদয়াত এ জন্যেও যে, তাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশি খরচ হয়। আর বেহুদা খরচ থেকে দূরে থাকা পোশাকের ব্যাপারে প্রথম শর্ত। বর্তমানে এই বিদয়াত চালু হয়ে রয়েছে সমাজের একশ্রেণীর জনগণের মাঝে। তারা মনে করছে 'সুন্নাতী পোশাক পরছি আমরা; রাসূলের পায়রবী করছি আমরা। কিন্তু এ যে রাসূলে করীমের সুন্নাত নয়, নয় তাঁর সুন্নাতের পায়রবী, সে কথা এই লোকদের খেয়ালেই আসে না। বস্তুত এ চরম অন্ধত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

আমার এ দলীলভিত্তিক আলোচনায় এ পোশাকের প্রতি কোনো বিদ্বেষ প্রচার করা হয়নি, তা পরতে নিষেধও করা হয়নি। আমার বক্তব্য শুধু এতটুকু যে, এ ধরনের পোশাককে 'সুন্নাতী পোশাক' বলাটাই বিদয়াত। এ পোশাক শুধু পরাকে কিন্তু আমি বিদয়াত বলিনি— বিদয়াত বলতেও চাই না।

---

১. এ দেশের এক শ্রেণীর আলিম ও পীর সাহেবান যে পাজামা বা লুঙ্গির ওপর কল্লিদার নিসফে সাফ কোর্তা পরেন, তাকে 'সুন্নাতী লেবাস' বলা একটা মনগড়া কথা। এ পোশাককে বড় জোর এতদ্দেশীয় পরহেযগার আলিম ও পীর সাহেবানের পছন্দনীয় পোশাক— লিবাসুল-ওলামা— বলা যেতে পারে মাত্র।

স্বপ্নের ফয়সালা মেনে নেয়ার বিদয়াত

পীর সাহেবদের দরবারের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এখানে সব সময় স্বপ্নের রাজত্ব কায়েম হয়ে থাকে। কে কত বেশি এবং ভাল স্বপ্ন দেখতে পারে, মুরীদ-মুসাহিবদের মাঝে তা নিয়ে যেন প্রবল প্রতিযোগিতা চলে। ফলে তাদের কেউ কেউ যে বানানো স্বপ্নও না বলে, এমন কথা জোর করে বলা যায়না। কেননা যে যত ভালো স্বপ্ন দেখবে এবং স্বপ্নযোগে হুজুর কিবলার বেলায়েত ও উচ্চ মর্যাদা প্রমাণ করতে পারবে, হুজুরের দোয়া ফায়েজ এবং স্নেহাশীষ সেই পাবে সবচাইতে বেশি। কাজেই এ দরবারে স্বপ্ন দেখতেই হবে;—স্বপ্ন না দেখে কোনো উপায় আছে? এ দরবারের লোকেরা চোখ বুঝলেই স্বপ্ন দেখতে পায়, স্বপ্ন যেন এদের জন্যে এমন পাগল হয়ে বসে থাকে যে, যে কোনো সময়ই তা এদের চোখের সামনে ভেসে ওঠার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা জেগে জেগেও স্বপ্ন দেখে অনেক সময় এবং তা হুজুর কিবলাকে খুশি করার জন্যে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দরবারে পেশ করে। শুধু তা-ই নয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ জায়েয-নাজায়েয সম্পর্কেও এখানে স্বপ্ন দ্বারাই ফয়সালা গ্রহণ করা হয়। একজন হয়ত বললো ঃ আমি অমুক হুজুরকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি এই কাজটি করতে নিষেধ করেছেন; অমনি সে কাজটি পরিত্যাগ করা হলো। কিংবা তিনি অমুক কাজ করতে বলেছেন। অতএব সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ করতে শুরু করা হলো।

কেউ বললো ঃ আমি নবী করীম (স)-কে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি আমাকে এ কাজটি করতে আদেশ করেছেন, আর অমনি সে কাজ করতে শুরু করে দেয়া হলো। কিংবা কোনো কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন বলে তা বন্ধ করা হলো। এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা যে কি, সে দিকে আদৌ তাকিয়েও দেখা হয় না; শরীয়ত কি বলে সে কথা জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন তারা বোধ করে না।

এভাবে স্বপ্নের ওপর নির্ভরতা, স্বপ্ন দ্বারা পরিচালিত হওয়া, স্বপ্নের ভিত্তিতে কোনো কাজ করা বা কোনো কাজ না করা পীর-পূজকদের নীতি, কোনো শরীয়ত পন্থীর এ নীতি নয়। কেননা সাধারণ মানুষের স্বপ্ন— সত্যিকারভাবে তা যদি কেউ দেখেই— কোনো শরীয়তের বিধান হতে পারে না। স্বপ্ন সত্য হতে পারে। কোনো স্বপ্ন যদি কেউ সত্যিই দেখে তবে তা থেকে সে নিজে কোনো আগাম সুখবর লাভ করবে, না হয় কোনো বিষয়ে সতর্কতাবলম্বনের ইঙ্গিত

পাবে। সে জন্যে তার উচিত আল্লাহ্র শোকর করা। কিন্তু এ স্বপ্ন দ্বারা ফরয-ওয়াজিব, হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয কিংবা করণীয় কি, না-করণীয় কি, তা প্রমাণিত হতে পারে না। স্বপ্ন থেকে শরীয়তের অনুকূল কোনো কথা জানতে পারলে সে তো ভালোই; কিন্তু শরীয়তের বিপরীত যদি কিছু জানা যায় তবে তা কিছুতেই অনুসরণ করা যাবে না। করা যাবে না এ জন্যে যে, শরীয়তের বিপরীত কারো কোনো হুকুম দেয়ার অধিকার নেই, স্বপ্নের কি দাম থাকতে পারে শরীয়তের মুকাবিলায় ?

অবশ্য স্বপ্ন ইসলামের দৃষ্টিতে একেবারে ফেলবার জিনিস নয়— এ কথা ঠিক। স্বপ্নযোগে নবী করীম (স)-এর দর্শন লাভ করা যায়, তাও হাদীস থেকে প্রমাণিত। কিন্তু প্রথম কথা হলো, স্বপ্নযোগে শয়তান যদি নবী করীমের নিজের বেশ নয়— যে কোনো একটা বেশ ধারণ করে তাকেই 'নবী করীম' বলে জাহির করে, তবে স্বপ্ন দ্রষ্টা কি করে বুঝতে পারবে যে এ প্রকৃত রাসূল নয় ?

এ পর্যায়ে রাসূলে (স)-এর হাদীসের ভাষা ও তাতে ব্যবহৃত শব্দগুলো লক্ষণীয়। হযরত আবদুল্লাহ (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ رَآنِىْ فِىْ الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِىْ - (ترمذى)

যে লোক স্বপ্নযোগে আমাকে দেখলো, সে ঠিক আমাকেই দেখলো। কেননা শয়তান আমার রূপ ও প্রতিকৃতি ধারণ করতে পারে না। (তিরমিযী)

শয়তান রাসূলের রূপ ও প্রতিকৃতি ধারণ করতে পরবে না— বলে যদি কেউ স্বপ্নযোগে রাসূলে করীম (স)-কে দেখল, তবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে ঠিক রাসূলকেই দেখেছে, অন্য কাউকে নয়— হাদীসের শব্দ ও ভাষা থেকে এ কথাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ শব্দ ও ভাষার ভিত্তিতেই দু'টো দিক এরূপ থেকে যায়—যার স্পষ্ট মীমাংসা হওয়ার প্রয়োজন। একটি হলো রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ যে লোক আমাকে দেখল, সে আমাকেই দেখল, কিন্তু যদি কেউ অন্য কাউকে দেখে এবং তার মনে ভ্রম হয় শয়তান ভ্রম জাগিয়ে দেয় যে, ইনি রাসূল (স) তাহলে কি হবে ? এরূপ হওয়ার অবকাশ কি এ হাদীসের ভাষা থেকে বের হয় না ?

দ্বিতীয় রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ শয়তান আমার রূপ ও প্রতিকৃতি ধারণ করতে পারে না, কিন্তু শয়তান যদি অন্য কারো রূপ প্রতিকৃতি ধারণ করে স্বপ্ন দ্রষ্টার মনে এই ভ্রম জাগিয়ে দেয় যে, ইনি রাসূলে করীম তাহলে কি হবে ?

এরূপ হওয়া সম্ভব কিনা এ হাদীসের স্পষ্ট ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে ? আমার মনে হয়, এ হাদীসে এই দুটো সম্ভাবনার পথ বন্ধ করে দেয় নি। এখানে এ সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই কথা বলা হচ্ছে। আল-মাজেরী ও কাযী ইয়াজ প্রমুখ হাদীস বিশারদ এ হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। (তিরমিযীর শরাহ 'তুহফাতুল-আহ-ওয়াযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কাজেই স্বপ্ন দেখলেই তদনুযায়ী কাজ করতে হবে, ইসলামে এমন কথা অচল। আর দ্বিতীয় কথা হলো, নবী করীম (স)-এর যা কিছু বলবার ছিল তা তো তাঁর জীবিত থাকাকালে তিনি সম্পূর্ণরূপে বলেই দিয়ে গেছেন, তাঁর জীবদ্দশায়ই তো দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন নতুন করে তাঁর কিছুই বলবার থাকতে পারে না। হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয বলে দেয়া নবীর দায়িত্ব। আর নবীর এ দায়িত্ব নবীর জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। নবীর জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ পর্যায়ের কোনো দায়িত্বই থাকতে পারে না তাঁর ওপর। আর শেষ নবী তো তাঁর জীবদ্দশায়ই 'খাতামুন্নাবীয়ীন' ছিলেন। নবীর জীবন শেষ হয়ে গেছে, তার পূর্বেই নবুয়্যতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালিত হয়ে গেছে। অতঃপর স্বপ্নযোগে শরীয়তের কোনো নতুন বিধান দেয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। তাই স্বপ্নযোগে নবী করীম (স)-কে দেখলেও এবং তার নিকট থেকে কোনো নির্দেশ পেলেও তা পালন করার কোনো দায়িত্ব স্বপ্ন-দ্রষ্টারও নেই, নেই উম্মতের কোনো লোকেরই। দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ। এখন বিশ্ব মানবের জন্যে তা-ই একমাত্র চূড়ান্ত বিধান। সবকিছু তা থেকেই জানতে হবে, তা থেকেই গ্রহণ করতে হবে, চলতে হবে তাকে অনুসরণ করেই।

শরীয়তে স্বপ্নের যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকেই প্রমাণিত। এ পর্যায়ে দুটো হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلَّاالْمُبَشِّرَاتِ قَالُوْا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ - (بخارى)

নবী করীম (স) বলেছেন, নবুয়্যতের কোনো কিছুই বাকী নেই— সবই শেষ হয়ে গেছে, এখন আছে শুধু 'সুসংবাদ দাতাসমূহ।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ সুসংবাদ-দাতাসমূহ বলতে কি বোঝায় ? নবী করীম (স) বললেনঃ তা হলো ভালো স্বপ্ন ।

দ্বিতীয় হাদীস হলো হযরত আনাস (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَّ اَرْبَعِيْنَ جُزْاً مِّنَ النُّبُوَّةِ - (بخارى مسلم)

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ ভালো স্বপ্ন নবুয়্যতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

প্রথম হাদীস থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ভালো স্বপ্ন বান্দার জন্যে সুসংবাদ লাভের একটি মাধ্যম মাত্র। আর দ্বিতীয় হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবুয়্যতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ মর্যাদার অধিকারী হলো এই 'শুভ স্বপ্ন'। তা হলে বাকি পঁয়তাল্লিশ ভাগ কি ? তা হলো নবুয়্যতের মাধ্যমে লব্ধ কুরআন ও সুন্নাত।[১] অতএব এই কুরআন ও সুন্নাহই হলো দ্বীনের আসল ও মূল ভিত্তি। তা-ই বাস্তব জিনিস, তার মুকাবিলায় স্বপ্নকে পেশ করা কল্পনা বিলাসী লোকদেরই কাজ। যারা বাস্তব জীবনের ব্যাপারগুলোকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক, তাদের কর্তব্য হলো স্বপ্নের পেছনে না ছুটে কুরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করে অগ্রসর হওয়া। যারা কুরআন-হাদীসের বাস্তব বিধানকে ভিত্তি করে কাজ করে না, তা থেকে গ্রহণ করে না জীবন পথের নির্দেশ ও ফয়সালা; বরং যারা স্বপ্নের ভিত্তিতেই সব বিষয়ে ফয়সালা গ্রহণ করে, তারা আসলেই ঈমানদার নয়, ঈমানদার নয় আল্লাহ্র কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাতের প্রতি। অতএব তারা বিদয়াত পন্থী, বিদয়াতী লোক।

১. এ হাদীসে শুভ স্বপ্নকে নবুয়্যতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'শুভ স্বপ্ন' নবুয়্যতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ, ইবনে উমর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে সত্তর ভাগের এক ভাগ। কাজেই এ সব কথা কোনো নির্দিষ্ট জিনিস নয়। দ্বিতীয়, শুভ স্বপ্নকে নবুয়্যতের অংশ বলার মানে এ নয় যে, শুভ স্বপ্নও বুঝি ঠিক নবুয়্যতের মতোই নির্ভুল বিধান দানকারী জিনিস। এখানে নবুয়্যতের সঙ্গে শুভ স্বপ্নের শুধু সাদৃশ্য দেখানোর জন্যেই এ কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় শুভ স্বপ্ন কখনো নবুয়্যতের সমান হতে পারে না। (জুরকানী লিখিত মুয়াত্তার শরাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সুন্নাত ও বিদয়াতের এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শই হচ্ছে সুন্নাত এবং এরই বিপরীতকে বলা হয় বিদয়াত। সুন্নাত হচ্ছে 'উসওয়ায়ে হাসান' নিখুঁত, উৎকৃষ্টতম ও উন্নততর আদর্শ; যা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার প্রত্যেকটি মানুষের জন্যেই একান্তভাবে অনুসরণীয়। বস্তুত ইসলামী আদর্শবাদী যে, সে এই আদর্শকে মনে মগজে ও কাজে-কর্মে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ এবং অনুসরণ করে চলে। আর সেই হচ্ছে প্রকৃত মুসলিম।

পক্ষান্তরে ইসলামের বিপরীত চিন্তা-বিশ্বাস ও বাস্তব রীতি-নীতি যাই গ্রহণ করা হবে, তাই হবে বিদয়াত। তাই সে জাহিলিয়াত, যা খতম করার জন্যে দুনিয়ায় এসেছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি নিজে তাঁর নবুয়্যতের জীবন-ব্যাপী অবিশ্রান্ত সাধনার ফলে একদিকে যেমন জাহিলিয়াতের বুনিয়াদ চুর্ণ করেছেন এবং বিদয়াতের পথ রুদ্ধ করেছেন চিরদিনের তরে। অপর দিকে তেমনি করেছেন সুন্নাতের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। সাহাবীদের সমাজকেও তিনি এ আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলেছিলেন পুরো মাত্রায়। তিনি নিজে এ পর্যায়ে এত অসংখ্য ও মহামূল্য হেদায়েত দিয়ে গেছেন, যার বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তিনি একান্তভাবে কামনা করেছিলেন তাঁর তৈরী সমাজ যেন কোনো অবস্থায় বিদয়াতের প্রশ্রয় না দেয়, বিচ্যুত না হয় সুন্নাতের আলোকোজ্জ্বল আদর্শ রাজপথ থেকে। শুধু তাই নয়, তাঁর তৈরী সমাজ যেন প্রতিনিয়ত বিদয়াতের প্রতিরোধে এবং সুন্নাতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে ব্যতিব্যাস্ত ও আত্মনিয়োজিত থাকে— এই ছিল তাঁর ঐকান্তিক কামনা। তাঁর এ পর্যায়ের বাণীসমূহের মধ্য থেকে কিছু কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

নবী করীম (স) হযরত বিলাল ইবনুল হারিস (রা)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছিলেন ঃ

اِعْلَمْ اَنَّهٗ مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِىْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِىْ فَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا

يَرْضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ اِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِ النَّاسِ شَيْئًا - (ترمذى، حديث حسن)

জেনে রাখো, যে লোক আমার পরে আমার কোনো সুন্নাতকে যা মরে গেছে পুনরুজ্জীবিত করবে, তার জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে সেই পরিমাণ সওয়াব ও প্রতিফল, যা পাবে সে, যে তদনুযায়ী আমল করেছে। কিন্তু যারা তদানুযায়ী আমল করবে তাদের প্রতিফল থেকে বিন্দুমাত্র সওয়াব হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে যে লোক কোনো গোমরাহীপূর্ণ বিদয়াতের উদ্ভাবন ও প্রচলন করবে যার প্রতি আল্লাহ্র এবং তাঁর রাসূল কিছুমাত্র রাজি নন— তার গুনাহ হবে সেই পরিমাণ, যতখানি গুনাহ হবে তার, যে তদনুযায়ী আমল করবে। কিন্তু তাদের গুনাহ থেকে কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না।

এ পর্যায়ে তাঁর আর একটি হাদীস হলো এই ঃ হযরত আনাস (রা) কে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন ঃ

يَابُنَىَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِىْ لَيْسَ فِىْ قَلْبِكَ غَشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَىَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِىْ وَ مَنْ اَحْيٰى سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِىْ الْجَنَّةِ - (ترمذى، حديث حسن)

হে প্রিয় পুত্র! তুমি যদি পারো সকাল-সন্ধ্যা সর্বক্ষণই কারো প্রতি মনে কোনো ক্লেদ কালিমা রাখবে না, তবে অবশ্যই তা করবে। হে প্রিয় পুত্র! এ হচ্ছে আমার উপস্থাপিত সুন্নাতের অন্যতম। আর যে লোক আমার সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করলো, সে আমাকে ভালোবাসল, আর যে আমাকে ভালোবাসল, সে পরকালে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।

প্রথমোক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, রাসূলে করীমের উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতও কোনো এক সময়ে মরে যেতে পারে, পরিত্যক্ত হতে পারে মুসলিম সমাজ কর্তৃক, তা তিনি ভালো করেই জানতেন এবং বুঝতেন। কিন্তু সে সুন্নাত চিরদিনের তরেই মৃত হয়ে থাকবে ও মিটে যাবে, কোনো দিনই তা পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না— তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। এই কারণেই তিনি তাঁর তৈরী করা উম্মতকে মরে যাওয়া সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন সাধনের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন এ হাদীসসমূহের মাধ্যমে। অনুরূপ কোনো

সুন্নাত-ই যখন মরে যেতে পারে, তখন অবশ্যই তাঁর গড়া উম্মতের মাঝে বিদয়াতের উদ্ভাবন ও অনুপ্রবেশও ঘটতে পারে, এ কথাও তিনি বুঝতেন স্পষ্টভাবে। এ কারণেই তিনি বিদয়াত উদ্ভাবন ও প্রচলন করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে গেছেন তাঁর উম্মতকে।

শেষোক্ত হাদীসে প্রথমে নবী করীম (স)-এর একটি বিশেষ সুন্নাতের বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে। সুন্নাতটি হলো ঃ মুসলিম সমাজের কোনো লোকের মনেই অপর লোকের বিরুদ্ধে কোনোরূপ হিংসা বা বিদ্বেষের স্থান না দেয়া। এ হিংসা-বিদ্বেষ যে বড় মারাত্মক ঈমান ও আমলের পক্ষে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে, এ হাদীসাংশ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নবী করীম (স) বলেছেন যে, এরূপ পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে কাল যাপন করাই আমার আদর্শ, আমার সুন্নাত। কোনো সময় যদি সমাজ— সমাজের ব্যক্তিগণ— এ অতি উন্নত সুন্নাত পালনের গুণ হারিয়ে ফেলে, তাহলে তা হবে সামগ্রিকভাবে জাতির লোকদের আদর্শ বিচ্যুতি। আর মুসলমানদের আদর্শ বিচ্যুতি রাসূলের নিকট কিছুতেই মনোপূত হতে পারে না। তাই তিনি ছোট্ট ধরনের এ সুন্নাতকে উপলক্ষ করে সমগ্র মুসলিম উম্মতকে এক মহামূল্য নীতি বাণী শুনিয়েছেন। তা হলো এই যে, যে আমার কোনো সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে, অ-চালু সুন্নাতকে চালু করবে, সে-ই রাসূলকে ভালোবাসল। অন্য কথায়, যে লোক রাসূলকে ভালোবাসে তার পক্ষেই রাসূলের সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করা— পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হতে পারে, অন্য কারো পক্ষে নয়। শুধু তাই নয়, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা পোষণের অকৃত্রিমতা ও নিষ্ঠা সে-ই প্রমাণ করতে পারল। যে লোক তাঁর সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করার কোন চেষ্টা করলো না, তার মনে রাসূলের প্রতি একবিন্দু পরিমাণ ভালোবাসা যে আছে, তার কোনো প্রমাণ-ই থাকতে পারে না। তা দাবি করারও তার কোনো অধিকার নেই। অথচ রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা পোষণ করা ঈমানের মৌল শর্ত। অতএব যারাই রাসূলের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, তারাই ভালোবাসে রাসূলের সুন্নাতকে এবং যারাই রাসূলের সুন্নাতকে ভালোবাসে তারা যেমন তাঁর সুন্নাতকে উপেক্ষা করতে পারে না, পারে না সে সুন্নাতের মরে যাওয়া মিটে যাওয়াকে বরদাশত করতে, পারে না তার মিটে যাওয়ার পর নির্বাক, নিশ্চুপ এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে। রাসূলের প্রতি ঈমান ও ভালোবাসাই তাকে সুন্নাত প্রতিষ্ঠার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে এবং বিদয়াতকে প্রতিরোধ করার জন্যে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করবে, নিশ্চিন্তে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে দেবে না একবিন্দু সময়ের তরেও। নবীর প্রতি এরূপ গভীর ভালোবাসা এবং নবীর সুন্নাতের এরূপ অকৃত্রিম মমত্ব বোধ মুমিন মাত্রেরই দিলে বর্তমান থাকা একান্ত

প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন এ মুমিনদের সমন্বয়ে গড়া এক জনসমষ্টির, যারা ঈমানী শক্তিতে হবে বলিয়ান, সুন্নাতের ব্যাপারে হবে ক্ষমাহীন এবং বিদয়াত প্রতিরোধে হবে অনমনীয়। নবী করীম (স) এমনি এক সুসংবদ্ধ জনসমষ্টি গড়ে গিয়েছিলেন। যতদিন এ জনসমষ্টি দুনিয়ায় ছিল ততদিন পর্যন্ত মুসলিম সমাজে কোনো বিদয়াত প্রবেশ করতে পারে নি, পারেনি কোনো সুন্নাত পরিত্যক্ত হতে। কিন্তু উত্তরকালে ইতিহাসে এমন এক অধ্যায় আসে, যখন মুসলিম সমাজে বিদয়াত প্রবেশ করে এবং সুন্নাত হয় পরিত্যক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো পর্যায়েই এমন অবস্থা দেখা যায় নি, যখন মুসলিম সমাজে বিদয়াতের প্রতিবাদ এবং সুন্নাত প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টানুবর্তী লোকের অভাব ঘটেছে। অতীতে সুন্নাত ও বিদয়াতের মাঝে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছে। কখনো বিদয়াত পন্থীরা বাহ্যত জয়ী হয়েছে, আর কখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সুন্নাত প্রতিষ্ঠাকামীরা। এ জয়-পরাজয়ও এক শাশ্বত সত্য। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজে বিদয়াতের প্রভাব প্রচণ্ডরূপে দেখা যাচ্ছে, বিদয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এখানে অবাধে। প্রতিবাদ হচ্ছে না তা নয়; কিন্তু বিদয়াত যে প্রবল শক্তিতে বলিয়ান হয়ে আসছে, প্রতিবাদ হচ্ছে তার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে, অসংবদ্ধ ভাবে প্রায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে। অথচ প্রয়োজন সুসংবদ্ধ এক প্রবল প্রতিরোধের। শুধু নেতিবাচক প্রতিরোধই নয়, প্রয়োজন হচ্ছে ইতিবাচকভাবে সুন্নাত প্রতিষ্ঠার এক সামগ্রিক ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার। এরূপ এক সর্বাত্মক ও পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টাই এখন মুসলিম সমাজকে রক্ষা করতে পারে বিদয়াতের এ সয়লাব স্রোতের মুখ থেকে। অন্যথায় এ সমাজ বিদয়াতের স্রোতে ভেসে যেতে পারে রসাতলে। তাই আজ 'সুন্নাত ও বিদয়াত' পর্যায়ে এ দীর্ঘ আলোচনা সমাজের সামনে উপস্থাপিত করা হলো। বিদয়াত প্রতিরুদ্ধ হোক, প্রতিরুদ্ধ হোক কেবল আংশিক বিদয়াত নয় বিদয়াতের কতগুলো ছোটখাটো অনুষ্ঠান নয়, প্রতিরুদ্ধ হোক সম্পূর্ণরূপে সর্বাত্মকভাবে, মূলোৎপাটিত হোক বিদয়াতের এ সর্বগ্রাসী বিষবৃক্ষ। আর সে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হোক সুন্নাত। কেবল পোশাকী সুন্নাত নয়, প্রকৃত সুন্নাত, সম্পূর্ণ সুন্নাত। সেই সুন্নাত, যা দুনিয়ায় রেখে গেছেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) চিরদিনের তরে। বিশ্ব মানবের জন্য এই হচ্ছে আমার একমাত্র কামনা, অন্তরের একান্ত বাসনা। এ দাওয়াতই আজ আমি পেশ করছি সাধারণভাবে সব মুসলমানের সামনে, বিশেষ করে আলিম সমাজের সামনে এবং আরো বিশেষভাবে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী যুব শক্তির সামনে।

সুন্নাত ও বিদয়াত সম্পর্কে এই দীর্ঘ আলোচনায় দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কুরআন ও সুন্নাত-বহির্ভূত কোনো কাজ, বিষয়, ব্যাপার, নিয়ম-প্রথা ও পদ্ধতিকে ধর্মের নামে নেক আমল ও সওয়াবের কাজ

বলে চালিয়ে দেয়াই হলো বিদয়াত— যে সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাত থেকে কোনো সনদ পেশ করা যাবে না, যার কোনো নজীর পাওয়া যাবেনা খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে।

বস্তুত নিজস্বভাবে শরীয়ত রচনা এবং আল্লাহ্র কুদরাত ও উলুহীয়াতে অন্যকে শরীক মনে করা, ও শরীক বলে মেনে নেয়াই হচ্ছে বিদয়াত। আর আল্লাহ্র শরীক বানানো বা শরীক আছে মনে করা যে কত বড় গুনাহ তা কারোই অজানা নয়। এই পর্যায়ে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓـؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ط وَلَوْ لَا كَلِمَـةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - (الشورى - ٢١)

তাদের এমন সব শরীক আছে না কি, যারা তাদের জন্যে দ্বীনের শরীয়ত রচনা করে এমন সব বিষয় যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি ? চূড়ান্ত ফয়সালার কথা যদি আগেই সিদ্ধান্ত করে না নেয়া হতো, তাহলে আজই তাদের ব্যাপার চূড়ান্ত করে দেয়া হতো। আর জালিমদের জন্যে কঠিন পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

এ আয়াতের অর্থ হলো ঃ আল্লাহ্র শরীয়তকে যারা যথেষ্ট মনে করে না, অন্যদের রচিত আইন ও 'শরীয়ত' মেনে চলা যারা জরুরী মনে করে এবং আল্লাহ্র দেয়া শরীয়তের বাইরে— তার বিপরীত— মানুষের মনগড়া শরীয়ত ও আইনকে যারা আল্লাহ্র অনুমোদিত সওয়াবের কাজ বলে বিশ্বাস করে তারা জালিম। আর এ জালিমদের জন্যেই কঠিন আযাব নির্দিষ্ট।

আল্লাহ্র শরীয়তের বাইরে মানুষের মনগড়া শরীয়ত ও আইন পালন করাই হলো বিদয়াত। আর এই আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী এ বিদয়াত হলো শির্ক। কেননা আসলে তো আল্লাহ্র শরীক কেউ নেই, কিছু নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বানানো শরীয়ত বা আইন পালন করতে মানুষ বাধ্য নয়। অতএব আল্লাহ্র শরীয়তের দলীল ছাড়া যারাই ফতোয়া দেয়, মাসআলা বানায়, রসম ও তরীকার প্রচলন করে, তরাই বিদয়াতের শির্কে নিমজ্জিত হয়।

বিদয়াত পালনে শুধু আল্লাহ্র সাথেই শির্ক করা হয় না, রাসূলে করীম (স)-এর রিসালাতেও শির্ক করা হয়। কেননা আল্লাহ্র নাযিল করা শরীয়ত রাসূলই পেশ করে গেছেন পুরোমাত্রায়— রাসূল পাঠাবার উদ্দেশ্যও তাই। আল্লাহ্ দ্বীন কি, তা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে রাসূল-ই নির্দেশ করে গেছেন।

রাসূলের দ্বারাই আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, সওয়াব-আযাবের সীমা নির্ধারিত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় অপর কেউ যদি রাসূলের পেশ করা শরীয়তের বাইরে কোনো জিনিসকে শরীয়তের জিনিস বলে পেশ করে এবং যে তা মেনে নেয়, সে যুগপৎভাবে আল্লাহ্‌র সাথেও শির্‌ক করে, শরীক বানায় রাসূলের সাথেও। সে তো রাসূলের দায়িত্ব ও মর্যাদা নিজের দখল করে নিতে চায় কিংবা রাসূল ছাড়া এ মর্যাদা অন্য কাউকে দিতে চায়। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দ্বীনে সে নতুন আচার-রীতি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে নিজেই নবীর স্থান দখল করে, যদিও মুখে তারা দাবি করে না। আর রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর আর কেউ নবী হবে না, হতে পারে না, এ কথা তো ইসলামের বুনিয়াদী আকীদারই অন্তর্ভূক্ত।

সহীহ্ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত একটি হাদীসের কথা এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে। হাশরের ময়দানে রাসূলে করীম (স) তাঁর উম্মতকে পেয়ালা ভরে ভরে 'হাওযে কাওসার'-এর পানি পান করাবেন। লোকেরা একদিক থেকে আসতে থাকবে ও পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে অপর দিকে সরে যেতে থাকবে। এ সময় তাঁর উম্মতের একদল লোক হাওযে-কাওসার এর দিকে আসতে থাকবে, তখন (নবী বলেন)ঃ يَحَالُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ

আমার ও তাদের মাঝে এক প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। তারা আমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। আমি আল্লাহ্‌র নিকট দাবি করে বলবো হে আল্লাহ, এরা তো আমার উম্মত, এদের আসতে বাঁধা দেয়া হলো কেন ? তখন আল্লাহ তা'আলা জবাব দেবেন ঃ

إِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ -

এই লোকেরা তোমার মৃত্যুর পর কি কি বিদয়াত উদ্ভাবন করেছে, তা তুমি জানো না।

বলা হবে ঃ إِنَّهُمْ غَيَّرُوْا دِيْنَكَ —এরা তো তোমার পেশ করা দ্বীনকে বদলে দিয়েছে, বিকৃত করেছে।

(এ জন্যে এ বিদয়াতীরা 'হাওযে-কাওসার'-এ কক্ষণই হাযির হতে পারবে না)

নবী করীম (স) বলেন, তখন আমি তাদের লক্ষ্য করে বলবো سُحْقًا سُحْقًا দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও, আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও।

বিদয়াত ও বিদয়াতীদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা এ সহীহ্ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা গেল। এমতাবস্থায় বিদয়াতকে সর্বতোভাবে পরিহার করে চলা

এবং সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে একে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্যে চেষ্টা করা যে ঈমানদার মুসলমানদের কত বড় কর্তব্য তা বলা-ই বাহুল্য। আর এ জন্যে সঠিক কর্মনীতি হচ্ছে এই যে, বিদয়াত মুক্ত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ প্রচার করে জনমত গঠন করতে হবে এবং জনমতের জোরে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। অতঃপর এই ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিকে পুরোপুরি প্রয়োগ করতে হবে জীবনে ও সমাজে অবশিষ্ট বিদয়াতের শেষ চিহ্নকেও মুছে ফেলবার কাজে। এ পন্থায় কাজ করলে বিদয়াতও মিটবে এবং সুন্নাতও হবে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত এই হচ্ছে ইসলামী কর্মনীতি।

সর্বশেষে আমি ইমাম গাযযালীর একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করে এ গ্রন্থের সমাপ্তি ঘোষণা করতে চাই। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْبِدْعُ كُلُّهَا يَنْبَغِىْ اَنْ تُحْسِمَ اَبْوَابَهَا وَ تُنْكِرَ عَلَى الْمُبْتَدِعِيْنَ بِدْعَهُمْ وَ اِنِ اعْتَقَدُوْا اَنَّهَا الْحَقُّ - (احياء علوم الدين ج- ٢، ص- ٢٨٧)

বিদয়াত যতো রকমেরই হোক, সবগুলোরই দ্বার রুদ্ধ করতে হবে, আর বিদয়াতীদের মুখের ওপর নিক্ষেপ করতে হবে তাদের বিদয়াতসমূহ— তারা তাকে যতোই বরহক বলে বিশ্বাস করুক না কেন !

[illegible]র পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (রহ.) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (রহ.) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়েবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের নীতিদর্শন', 'যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামের অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সুদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'সমাজতন্ত্র ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'খেলাফতে রাশেদা', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)', 'আল্লাহর হক বান্দার হক' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন', 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)', ইসলামে হালাল হারামের বিধান', 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাসের ঐতিহাসিক তাফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (রহ.) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গৃহীত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁর রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব' এবং 'ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থ দু'টি সুধীজন কর্তৃক প্রশংসিত এবং বহুল পঠিত।

মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (রহ.) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই যুগস্রষ্টা মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিঊন)

খায়রুন প্রকাশনী